সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' – 'প্রথম আলো' – 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

শ্রেয়সী গোস্বামী

Registration No. Ph/D/Beng (956)/375/R-2017

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মঞ্জুলা বেরা

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

২০২০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' — 'প্রথম আলো' — 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

শ্রেয়সী গোস্বামী

Registration No. Ph/D/Beng (956)/375/R-2017

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মঞ্জুলা বেরা

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

২০২০

ঘোষণা

আমি "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' — 'প্রথম আলো' — 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান" শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোন উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

শ্রেয়সী গোস্বামী

তারিখঃ ১৪.১০.২০২০

(শ্রেয়সী গোস্বামী)

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

সূচক - ৭৩৪০১৩

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE 'A'

ENLIGHTENMENT TO PERFECTION

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

E-mail: dept.bengalinbu@gmail.com
Ph.: 0353-2580189

রাজা রামমোহনপুর, ডাকঘর - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, থানা - মাটিগাড়া, মহকুমা - শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

পত্র সংখ্যা________________ তারিখ.................. ২০........

Certificate

I certify that Smt. Sreyasee Goswami has prepared the thesis entitled **"সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' — 'প্রথম আলো' — 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান"** for the award of Ph.D. degree of the University of North Bengal, under my guidance. She has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Manjula Bera
14/10/2020

Date: 14/10/2020

(Dr. MANJULA BERA)

Professor of Bengali

Department of Bengali

University of North Bengal

DR. MANJULA BERA
Professor of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal

কুম্ভীলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

আমি **শ্রীমতী শ্রেয়সী গোস্বামী**, (Registration No. Ph.D/Beng. (956)/375/R 2017; Date: 17/02/2017) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে **"সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' – 'প্রথম আলো' – 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান"** শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে আমি গবেষণা কর্মে কোনোরূপ কুম্ভীলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিনি।

মঞ্জুলা বেরা
২৪/১০/২০২০

(প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা)

তত্ত্বাবধায়ক ও প্রফেসর

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

সূচক - ৭৩৪০১৩

Dr. MANJULA BERA
Professor of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal

শ্রেয়সী গোস্বামী
২৪/১০/২০২০

(শ্রেয়সী গোস্বামী)

গবেষক, বাংলাবিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

সূচক - ৭৩৪০১৩

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' — 'প্রথম আলো' — 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান

ভূমিকাঃ

মানব সভ্যতা বিবর্তনের পথে প্রতিনিয়ত পৌঁছে যাচ্ছে নিত্য নতুন শিখরে, আবিষ্কার হচ্ছে নিত্য নতুন ভোগ্যপণ্য, অন্য কোথাও, অন্য কোনও খানে পৌঁছে যেতে চাইছে জীবন। কিন্তু এগিয়ে চলার এই পথে আমরা পেছনে ফেলে আসি না আমাদের অতীতকে, অতীতকে নিয়েই আমরা এগিয়ে চলি ভবিষ্যতের পথে। অতীতেই নিহিত থাকে সভ্যতার শিকড়। ভবিষ্যত মুহূর্তেই অতীত তাই অতীতেই শুরু হয় আত্ম অনুসন্ধান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাস ত্রয়ীতে এই শিকড়ের টানেই চালিয়েছেন ইতিহাস সন্ধান। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের রূপকে তিনি তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক ইতিহাসকে সামনে রেখে, এই তিনটে উপন্যাসের সময় সন্ধানের পথে তিনি খুঁজেছেন বাঙালী সমাজ তথা সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে।

১৯৮১ তে প্রকাশিত হয়েছিল সুনীলের প্রথম পিরিয়ড পিস 'সেই সময়', এরপর একে একে এসেছে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিম' ও 'প্রথম আলো'। এই তিনটি উপন্যাস জুড়ে আছে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ থেকে শুরু করে বাঙালীর জাতীয়তাবাদের জাগরণ, বিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ বপন, বাংলা ও বাঙালীর দ্বিখন্ডিকরণ, এবং শেষে ছিন্নমূল বাঙালীর শিকড় সন্ধানের ইতিহাস। আলোচ্য তিনটি উপন্যাসই আমার গবেষণার ক্ষেত্র। এই তিনটি গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের রসদকে গ্রহণ করেও প্রকৃতপক্ষে জীবন অনুসন্ধানই চালিয়েছেন। যুগের

ধর্মকে বজায় রেখেই তিনি বাঙালী সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের যে রূপরেখাকে এনেছেন, তাতে গবেষকের দৃষ্টিতে একদিকে যেমন সত্যানুসন্ধান করেছেন, অন্যদিকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে করেছেন জীবনানুসন্ধান। এই তিন উপন্যাসের সত্যানুসন্ধান ও জীবনানুসন্ধানের স্বরূপ খোঁজার লক্ষ্যেই এগিয়েছে এই গবেষণা প্রকল্প। আমার এই গবেষণা প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিপরিচয় সংক্ষেপ ও সাহিত্যকৃতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার আমগ্রামে ১৯৩৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর। তাঁর পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা মীরা দেবী। ছোটবেলা থেকেই আর্থিক অনটন ও দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হওয়ায় জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রথম থেকেই ছিল তাঁর পরিপূর্ণ। ১৯৫১ তে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রথম তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয় ‘একটি চিঠি’ দেশ পত্রিকায়। জীবিকার তাড়না সাহিত্য চর্চা থেকে তাঁকে বিযুক্ত করতে পারেনি, সারা দিনের খাটাখাটনির মধ্যেও তিনি আড্ডা ও লেখালেখির চর্চাকে রক্ষা করে গেছেন অসীম উদ্দীপনার জোরেই। জীবন ও জীবিকার প্রবল সংগ্রামের দিনেই প্রকাশিত হল সুনীলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একা এবং কয়েকজন’ (১৯৫৮), শুরু হল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের যাত্রাপথ। ১৯৬৩ সালে সুনীলের জীবনে এল এক নতুন পালাবদল। আমেরিকার আইওয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পল এঙ্গেলের আমন্ত্রনে বৃত্তি পেয়ে তিনি যোগ দিলেন আন্তর্জাতিক লেখক কর্মশালায়। আমেরিকায় ফরাসী যুবতি মার্গারিটের সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেলেন। যদিও বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আকর্ষণে আমেরিকার সুখী জীবন, সুন্দরী বান্ধবী, স্থায়ী চাকরি ছেড়ে পকেটে মাত্র দশ টাকা নিয়ে সুনীল ফিরে এলেন ১৯৬৪ র অক্টোবর মাসে। জীবিকার

প্রয়োজনে গদ্যের প্রতি চরম অনাসক্তি সত্ত্বেও জীবিকার প্রয়োজনে নিতে হয় গদ্যে রচনার হাতেখড়ি। এরই মধ্য দিয়ে হয় তাঁর জীবনের পিতৃপক্ষের সূচনা। ১৯৬৬ সালের 'দেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'। এখান থেকেই শুরু হয় সব্যসাচী লেখকের সাহিত্য রথের জয়যাত্রা। গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য থেকে আত্মজীবনী পর্যন্ত সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই শুরু হয় তাঁর অনায়াস গতায়াত। বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর কবিতাগুলো দাঁড়িয়ে রইল অতুলনীয় স্থাপত্য হিসেবে। কথাসাহিত্যেও তিনি অকপট ভাষায় বলে গেলেন সহজ সুরে নির্মোহ নির্মেদ বাস্তবকেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তিন উপন্যাসে ('সেই সময়', 'প্রথম আলো' 'পূর্ব-পশ্চিম') সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের প্রেক্ষাপট

কথাসাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ছোটোগল্পের পাতায় মূলত উঠে এসেছিল সমকালীন জীবনের বহুমুখী চিত্রণ। প্রথম প্রথম তাঁর লেখার মধ্যে জীবনের কথা ছিল, বেশিরভাগ লেখার মধ্যেই ছিলেন তিনি নিজে, তাঁর উপন্যাস ছোটোগল্পের ভূমিতে তিনি নিরীক্ষা করেছিলেন জটিল জীবন সমস্যাকে। পিরিয়ড পিস রচনার দিকে তিনি ঝুঁকেছেন সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছে। দেশের অনতি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তিনি সন্ধান করলেন বাঙালী জাতির বিবর্তনের ইতিহাসকে। 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিরাট প্রেক্ষাপটকে গ্রহণ করলেন সেখানে এনেছেন উনিশ শতকের নবজাগরণ (১৮৪০-১৮৭০), বাঙালীর জাতীয়তা বোধের জাগরণ (১৮৮৩-১৯০৭), দ্বিখণ্ডিত বাঙালীর শিকড় সন্ধানের (পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত) বিরাট ও বিশাল পটভূমিকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসবিদ নন,

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তিনি ভেবেছেন তাঁর জীবনের রসদ হারিয়ে গেছে, প্রকৃত সত্য তা নয়। বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি গবেষকের দৃষ্টিতে যেমন তুলে এনেছেন ইতিহাসের সত্যকে তেমনি কল্পনার রঙে খণ্ডিত সত্যগুলিকে দিয়েছেন পূর্ণ সত্যের রূপ। খুঁজতে চেয়েছেন নিজের শিকড়কে, চালিয়েছেন আত্ম অনুসন্ধান, আর এই আত্ম অনুসন্ধান এগিয়েছে জীবন অনুসন্ধানের পথে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ 'সেই সময়' : উনিশ শতকে বাঙালীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মদর্শনের সময় সন্ধান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসটি ঊনবিংশ শতাব্দীর চালচিত্রে জীবিত মানুষের গদ্য গাথা। ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন এমন একটি বিশেষ কালপর্ব কে যে সময়ে বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোতে মধ্যযুগের নির্মোক ত্যাগ করে উত্তীর্ণ হয়েছিল আধুনিকতার পথে, গবেষকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন উনিশ শতকের নবজাগরনের ধারণাকে। 'সেই সময়' তৎকালীন ঘটমান জীবনের প্রবহমান চিত্র। ঐতিহাসিক সময়কে খোঁজেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে। কিন্তু ঔপন্যাসিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রবাহকে বিচার করেন মনস্তাত্তিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে দঁড়িয়ে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের সময়কে জীবন্ত করতে গিয়ে পাশাপাশি নিয়ে চলেছেন ইতিহাসের পাতার চরিত্র গুলিকে ও কিছু কাল্পনিক চরিত্রকে। উপন্যাসের মূল কাহিনী বৃত্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় নবীন কুমারের জন্মের মধ্য দিয়েই উপন্যাটির সূচনা এবং তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই সুদীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি। নবীন কুমারের নাতিদীর্ঘ জীবনের দীর্ঘ ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়ে লেখক সময়কে ধরার এক বিশাল প্রয়াস করেছেন। এই প্রয়াসের পথেই নবীন কুমার আখ্যানের পাশাপাশি এনেছেন আর ও বহু বৃত্ত। নবীন কুমারের চরিত্রে তিনি

দেখিয়েছেন সেই সময়ের নব্য শিক্ষিত যুব সমাজের টানাপোড়েন ও স্ববিরোধের বাস্তব সত্যকে। একদিকে প্রথম যুগের অন্ধ ইংরেজ সভ্যতার অনুকরন থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, নিজ সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা; বিদেশী সভ্যতার গুণগত দিক গুলিকে গ্রহণ করে যে নতুন বাঙালী জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; সেই বাঙালীর আত্ম প্রতিষ্ঠা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন নবীন কুমারের মধ্যে দিয়ে। সময়কে জীবন্ত করতে ই তিনি নবীন কুমারের আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে ই তিনি জুরে দিয়েছেন সমগ্র বাঙালী জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কে। বাঙালী উনিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশক পেরিয়ে চিনতে পেরেছিল নিজ সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ, খুঁজে পেয়েছিল প্রকৃত সত্যকে, যেই সত্যের ওপর ভর করে তারা নিজের সত্তার সার্বিক প্রতিষ্ঠা ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ 'প্রথম আলো' : আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস সন্ধান

'প্রথম আলো' র বিস্তীর্ণ পরিসরে ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে রেখেছেন, সেই ইতিহাসের পরিসরেই ডানা মেলেছেন কল্পনার সীমায়। এই উপন্যাসটিরও মূল নায়ক সময়। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সময়কালে এই ঘটনা প্রবাহ বিস্তৃত। এই সময়কালে হঠাৎ কিছু মানুষ যেন ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করেছে দেশ নামের একটা ভাবসত্তাকে, অনুভব করেছেন পরাধীনতার গ্লানি। 'প্রথম আলো' উপন্যাসের সময়সীমায় জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষই প্রধান ঘটনা। আসলে শিক্ষা বোধকে জাগ্রত করে, এই জাগ্রত বোধ আলো খুঁজতে চেয়েছে, নতুন আলো সরিয়ে দিয়েছে পুরোনো অন্ধকারকে। 'প্রথম আলো' এই আলোকিত সত্তার সার্বিকভাবে জেগে ওঠার ইতিবৃত্ত। আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়ার লড়াই তাদের এগিয়ে দিয়েছে উদ্বর্তনের পথে।

ঔপন্যাসিক যে সময়কে জীবন্ত করেছেন, বাংলায় তখন এসেছেন একের পর এক মহামানব। ঔপন্যাসিক যুগসূর্য রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে এসেছেন প্রধান বিন্দুতে। তাঁর পাশে দাঁড় করিয়েছেন বিবেকানন্দকে। এই দুই সূর্য কিরণে আলোকিত হয়েছে বাংলার আকাশ। সময়কে ফুটিয়ে তুলতে তিনি এনেছেন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিপ্লববাদ। এই অনুষঙ্গেই এনেছেন মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তাধারা, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের ভূমিকা, কংগ্রেসের প্রবীণ-নবীন বিরোধ, দুর্ভিক্ষ-মহামারি, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও ভারতবাসীর প্রবল বিরোধিতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। কাল্পনিক বৃত্তেও আছে ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকা ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্র। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের পাশে উঠে এসেছে রাজার অবৈধ পুত্র ভরত। ভরত-ভূমিসূতা বৃত্ত উপন্যাসের গতিময়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, চিনিয়েছে সময়ের বিবর্তনকে। ‘প্রথম আলো’ তে উঠে এসেছে উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত, আত্মসচেতন ও সমাজসচেতন বাঙালীর বিশ শতকের প্রথম দশকে জাতীয়তা বোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ‘পূর্ব-পশ্চিম’ : পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে শিকড় সন্ধানের ইতিহাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ‘সেই সময়’ উপন্যাস থেকে বাঙালী সংস্কৃতির প্রবাহ পথকে খোঁজার যে সচেতন প্রয়াস শুরু করেছিলেন, সেই প্রবাহ সমৃদ্ধ হয়েছে ‘পূর্ব-পশ্চিম’ বিস্তীর্ণ পরিসরে। উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী হৃদয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই প্রবল হয়েছিল পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার স্বপ্ন। কিন্তু ১৯৪৭ এর উপন্যাসের দেশভাগ বিদীর্ণ স্বাধীনতা বাঙালীকে দ্বিখন্ডিত করল, বাঙালী হৃদয়ের দীর্ঘ লালিত স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। স্বাধীনতা পরবর্তীতেও দেশনেতাদের আচরণ দেশবাসীর

দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাকে নিয়ে গেল বিনষ্টির পথে। স্বাধীনতাত্তোর পর্বের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসকেই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে। এই বাংলা আর উনিশ বিশ শতকের অখন্ড বাংলা নয়, এই বাংলার মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে উঠে গেছে কাঁটা তারের বেড়া। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা পঞ্চাশের মধ্যভাগে, কাহিনীর যবনিকা পতন আটের দশকের মোহনায় এসে। এই চারটি দশক জুড়ে দুই বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের ওঠা পড়াকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক, বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রবাহের ইতিহাসে খুঁজেছেন নিজের শিকড়কে।

যে সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষী সুনীল নিজে সেই সময়কে চিত্রিত করতে গিয়ে উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে আত্মজৈবনিক উপাদান। দ্বিখন্ডিত বাঙালীর ছিন্নমূলতার বেদনা, দুই বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৬২, নেহেরুর মৃত্যু ১৯৬৪, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকালপ্রয়াণ ও ইন্দিরা গান্ধীর অভ্যুত্থান ১৯৬৪, ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ১৯৬৪, মৌলবাদের প্রাধান্য থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের বাংলা ভাষার জন্য জীবন দান ১৯৫২, মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার বাঙালী যুবকের নির্ভীক সংগ্রাম, পশ্চিম বাংলার বহু তাজা প্রাণের নক্সাল আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া, আশির দশক থেকে বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে ছড়িয়ে পড়া, মূলের থেকে দূরে গিয়েও চরিত্রগুলির শিকড়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণের চিত্র 'পূর্ব-পশ্চিম'এ ছড়িয়ে আছে। 'পূর্ব-পশ্চিম' নামটি উপন্যাসে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রবাহ; পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের বৃহত্তর পটভূমি উপন্যাসে এসেছে। আবার মানুষের জীবনে ও মনে যে পূর্ব ও পশ্চিম, তার প্রবৃত্তি ও সামাজিক সত্তার

যে দ্বন্দ্ব, মন ও মননের দেবতা ও অপদেবতার একত্র সহাবস্থানই মানুষের মনুষ্যত্ব, এই দুইয়ের যে দ্বন্দ্ব তাও উঠে এসেছে এই উপন্যাসে।

উপসংহারঃ

'সেই সময়' 'প্রথম আলো' 'পূর্ব পশ্চিম' এই তিন উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শিকড়ের টানে তাকিয়েছেন বাঙালীর অনতি ইতিহাসের দিকে। উনিশ শতকের নবজাগরণ থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালীর জীবন চেতনার যে বিবর্তন ঘটেছে, সেই বিবর্তনের রূপরেখা এই তিনটি উপন্যাস। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে খুঁজেছেন, নিজের সত্তার স্বরূপকে। ধর্মের কারণে দ্বিখন্ডিত বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন গবেষকের দৃষ্টিতে আবার ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে ঘটিয়েছেন তথ্যের সমন্বয়। বাংলা উপন্যাসের ভূমিতে এই তিন উপন্যাস দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের মতো। বাংলা ও বাঙালীত্বকে নিয়ে সুনীলের প্রয়াস অভিনব ও বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। ঔপন্যাসিকের ইতিহাস সন্ধান তথা সময় সন্ধান তথা আত্ম অনুসন্ধান তথা শিকড় সন্ধান পাঠককেও পরিচিত করিয়েছেন নিজের শিকড়ের সঙ্গে।

প্রাক্‌কথন

খুব শৈশবেই মায়ের হাত ধরে আমার সাহিত্য দীক্ষা। মায়ের সঙ্গে খুব ছোটেবেলা থেকেই কথাসাহিত্যের অলিগলিতে ঘুরে বেড়িয়েছি, ভালো বেসেছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে। গবেষণার প্রাঙ্গনে প্রবেশ মহূর্তেই তাই প্রথমেই মনে পড়েছে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রকেই। শৈশব থেকেই বড় হওয়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে পড়তে পড়তে, তাই তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী তিন উপন্যাসকেই বেছে নিয়েছি আমার কর্ষণ যোগ্য ভূমি হিসেবে। আমার এই গবেষণার শিরোনাম "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' — 'প্রথম আলো' — 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান" এই গবেষণা কর্মে আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গী করে বাঙালীর বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে সন্ধান করেছি। সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান এগিয়েছে শিকড় সন্ধানের পথে। খুঁজেছি নিজ সত্তার স্বরূপকেও।

ছাত্রী হিসেবে স্নাতকস্তরে প্রবেশ মুহূর্ত থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তথা পথপ্রদর্শক ড. প্রণব কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

স্নাতকোত্তর স্তরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া, সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচিত করিয়েছেন, গবেষণার কাজে আগ্রহী করে তুলেছেন, প্রবল স্নেহে ও শাসনে ভরিয়ে রেখেছেন, চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম, তাঁর নিরন্তর প্রেরণা আমার পাথেয়। তাঁর নিরন্তর প্রেরণা ব্যতীত এই গবেষণা কর্ম হয়ত অসমাপ্তই রয়ে যেত।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মাননীয় ড. অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়, ড. নিখিলেশ রায় মহাশয়, ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়, ড. তপন মণ্ডল মহাশয়, ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়, ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়, স্বর্গীয় ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয় প্রমুখ আমার সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কাছে পেয়েছি প্রবল প্রশ্রয় ও উদ্দীপনা এগিয়ে চলার। আমার শিক্ষক মহাশয়দের চিন্তা, চেতনা, মন ও মনন আমার চেতনার ভূমিকে সার ও জল জুগিয়েছে অনবরত। তাদের চরণে আমার বিনম্র প্রণাম।

আমার ভাবনার জগতের প্রথম ও প্রধান আলো আমার মা শ্রীমতি কৃষ্ণা গোস্বামী, এই অবসরে মা'কে জানাই আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

এই গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ করতে আমি প্রধানত ব্যবহার করেছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। সেখানকার কর্মীদের আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি তাঁদের জানাই প্রণাম। এছাড়াও শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার, কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি- শিলিগুড়ি থেকেও পেয়েছি নিরন্তর সাহায্য, তাঁদেরও জানাই ধন্যবাদ।

গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ করতে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন, ও সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার বাবা শ্রী অশোক গোস্বামী, বাবাকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার জীবনসঙ্গী সায়ন্তনের সাহায্য ব্যতীত এই কাজ সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই এই অবসরে সায়ন্তনকেও জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

শিলিগুড়ি
২০২০

শ্রেয়সী গোস্বামী
গবেষক

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১-৭

প্রথম অধ্যায়ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিপরিচয় সংক্ষেপ ও সাহিত্যকৃতি ৮-২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ত্রয়ী উপন্যাসে ('সেই সময়'-'প্রথম আলো'-'পূর্ব-পশ্চিম') সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের প্রেক্ষাপট ২৬-৩৭

তৃতীয় অধ্যায়ঃ 'সেই সময়': উনিশ শতকে বাঙালীর আত্মদর্শন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সময় সন্ধান ৩৮-৯৩

চতুর্থ অধ্যায়ঃ 'প্রথম আলো': আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস সন্ধান ৯৪-১৬৭

পঞ্চম অধ্যায়ঃ 'পূর্ব-পশ্চিম': পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে শিকড় সন্ধানের ইতিহাস ১৬৮-২১২

উপসংহার ২১৩-২১৪

গ্রন্থপঞ্জী ২১৫-২২৪

নির্ঘণ্ট ২২৫-২২৯

ভূমিকা

বিশ শতক বিশ্বের দরবারে একে একে যে সব চিন্তার জগত নিয়ে হাজির হয়েছিল তাতে বদলে গিয়েছিল ভাবনাচিন্তার পরিধি বা এতদিন ধরে আঁকড়ে থাকা ভাবনা। বলতে থাকা কথা, লিখতে থাকা ভাষা, বুঝতে থাকা শব্দ বা গড়তে থাকা বিশ্বাসই কী সব, নাকি সেই সত্য ভেঙে ভেঙে, বদলে বদলে তৈরী হতে পারে নতুন সত্য, কিংবা সেগুলোও আসলে সত্য নয় তার ভেতরেও আছে নতুন তল বা অন্য এক নতুন সত্য। আসলে এই আধুনিক সময় বদলে দিয়েছে মননশীল সমাজের প্রেক্ষণবিন্দু। শিল্প, সাহিত্য, জীবন, মনন, ভাষা, কথা, শব্দ ইত্যাদি যা কিছু পার্থিব তার সবেরই বেরিয়ে পড়েছে নতুন তল (dimension)। বহুকালের জীবন চর্যা নিজের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নতুন মাত্রা নিয়ে। সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে তুলে এনেছে এক নতুন মাত্রা, এক নতুন অভিমুখ। সব কিছুকে দেখতে শিখেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, বুঝতে শিখেছে নতুন মনন নিয়ে, ভেসে উঠেছে নতুন মুখ, চিনে নিয়েছে নতুন দেহ। তাই এই সময় প্রকট করেছে অস্তিত্বের সংকটকে। সমাজ, জীবন তথা সাহিত্য এগিয়েছে এক নতুন পথে।

মানব সভ্যতা বিবর্তনের পথে প্রতিনিয়ত পৌঁছে যাচ্ছে নিত্য নতুন শিখরে, আবিষ্কার হচ্ছে নিত্য নতুন ভোগ্যপণ্য, অন্য কোথাও, অন্য কোনও খানে পৌঁছে যেতে চাইছে জীবন। আসলে এগিয়ে চলার এই পথে আমরা পেছনে ফেলে আসি না আমাদের অতীতকে, অতীতকে নিয়েই আমরা এগিয়ে চলি ভবিষ্যতের পথে। অতীতেই নিহিত থাকে সভ্যতার শিকড়। ভবিষ্যৎ মুহূর্তেই অতীত তাই অতীতেই শুরু হয় আত্ম অনুসন্ধান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’, ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাস ত্রয়ীতে এই শিকড়ের টানেই চালিয়েছেন ইতিহাস সন্ধান। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের রূপকে তিনি তুলে ধরেছেন

রাজনৈতিক ইতিহাসকে সামনে রেখে, এই তিনটে উপন্যাসের সময় সন্ধানের পথে তিনি খুঁজেছেন বাঙালী সমাজ তথা সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, জীবনের দর্পণ। সমাজ এগিয়ে চলে যে প্রবাহে, সাহিত্যও এগিয়ে চলে সেই একই প্রবাহে, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। এদেশে মধ্যযুগীয় পরিমন্ডলে আধ্যাত্মিকতা নির্ভর দেববাদ ছিল সাহিত্যের প্রধান সুর, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ইউরোপে চার শতাব্দী ধরে ঘটে চলা নবজাগরণের ঢেউ এসে লাগতে থাকল ভারতীয় উপমহাদেশের কূলে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান চেতনা এদেশের মানুষকে পরিচিত করালো ইউরোপীয় যন্ত্র নির্ভর আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে। প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদের গায়ে আছড়ে পড়ল পাশ্চাত্য জড়বাদের ঢেউ। আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে ঐহিকতার প্রতি সচেতন হতে শুরু করল ভারতবাসী। সমাজ থেকে বড় হয়ে উঠল ব্যক্তি, দেবতার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা পেল মানুষ। বাস্তবতার প্রতি আকর্ষণে মানুষ হারিয়ে ফেলতে শুরু করল বহুকালের ঐতিহ্য, সংস্কার, বিশ্বাসের প্রতি আস্থা। বিদেশি সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারে সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই কাব্যের দীর্ঘ প্রবাহের ধারা পেরিয়ে বাংলা গদ্য ভাষার জয়যাত্রা শুরু হল। বাস্তব জীবনকে নিয়ে শুরু হল নিরন্তর নিরীক্ষার পর্ব।

বাংলা সাহিত্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই এগোলো বাস্তবতা ভিত্তিক গদ্য সাহিত্যের দিকে, উপন্যাস রচনার দিকে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস'; হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'; প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হতোম প্যাঁচার নকসা' প্রভৃতি রচনার পথ পেরিয়ে ১৮৬৫ তে প্রথম সার্থক উপন্যাস এল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশ নন্দিনী' র হাত ধরে।

উপন্যাস রচনার প্রথম যুগ থেকেই উপন্যাস এগোলো ব্যক্তি হৃদয় ও ব্যক্তি চরিত্রের সার্বিক রূপায়ণের পথে। উপন্যাসের বিশাল ব্যাপ্তি হয়ে উঠল জীবন নিরীক্ষার একটা বৃহত্তম ভূমি। জীবন নিরীক্ষার এই প্রবাহ বয়ে চলল দুটো ধারায় একদিকে উপন্যাসে উঠে আসতে শুরু করল ইতিহাসের ঘটনা, অন্যদিকে রচিত হতে থাকল সমসাময়িক সময় নির্ভর সামাজিক ও পারিবারিক বৃত্ত। তবে উপন্যাসের মূল উপাদান বাস্তবতা এই দুই বৃত্তেরই প্রধান ও প্রবল সুর।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় মানুষের জীবনচর্যা, জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টি। সাহিত্যেরও দিক পরিবর্তন ঘটে জীবনের এই পরিবর্তনের পথেই। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে জীবন-নিরীক্ষার যে ধারা উঠে এল, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তা নতুন দিগন্ত লাভ করল। বঙ্কিম উপন্যাসের ভূমিতে একদিকে নিয়ে এলেন ইতিহাসকে, অন্যদিকে তিনি আনলেন সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বৃত্তকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমের অনুসরণে ইতিহাসকেই আশ্রয় করলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি হাঁটলেন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথে। ১৯০৩ সালে ‘চোখের বালি’ তে তিনি তুলে আনলেন ‘আঁতের কথা’। কিন্তু বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রযুগ পেরিয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল আরও জটিল আবর্তের মধ্যে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল Sigmund Freud -এর ‘The Interpretation of Dreams’-র ইংরেজি অনুবাদ, Freud -এর ভাবনা সারা বিশ্বের মানুষের আজন্ম লালিত চিন্তা-চেতনার মূলে আঘাত হানল। মানব মনের গভীর, জটিল, সর্পিল রহস্য সম্পর্কে সচেতন হল প্রগতিশীল সমাজ। ১৯২৩ থেকে ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হল বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ক্লাসিক আখ্যা দিয়ে শুরু হল তাঁর আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল প্রয়াস। ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল একটি নব্য লেখক গোষ্ঠী, সাহিত্যের মানদন্ড হিসাবে

বহুদিনের চর্চিত সত্য-শিব-সুন্দরের ধারণাকে তাঁরা ভেঙে চুরমার করে দিলেন। সাহিত্য আর সমাজের উঁচু তলার মানুষের কুক্ষিগত হয়ে রইল না, অন্ত্যজ প্রান্তিক মানুষেরা ঠাঁই পেতে শুরু করল সাহিত্যের আঙিনায়। কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা তাঁদের মূলধন হিসাবে গ্রহণ করলেন দারিদ্র্য ও যৌবন সম্ভোগের উল্লাসকে। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখরা সচেষ্ট হলেন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

তিরিশের দশকের সাহিত্যিকেদের মধ্যে এল জীবন সম্পর্কে তির্যকদৃষ্টি; তাঁরা বুঝলেন রোমান্টিক যৌবন-স্বপ্ন নয়, আধুনিকতা আসে সংশয় ও অবিশ্বাসের পথে। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশংকর; ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নিয়ে এলেন নতুন সুর। কিন্তু প্রবহমান সাহিত্যের ধারা কোথাও থেমে যায়নি। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে (১৯১৮-১৯৩৯) বাংলা সাহিত্যে যে পরিবর্তন চেতনার বিকাশ হয়েছিল চল্লিশের দশকের কথাকারদের মধ্যে তা নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। চল্লিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে এল এক উত্তাল কালপর্ব। এই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বিষবাষ্প মানুষকে পৌঁছে দিয়েছিল একটা অনিশ্চিতের ঘেরাটোপে। এ সময়ে সাহিত্যিকদের প্রতি সমাজের দাবি ছিল, সাহিত্যিক আজ শূন্যচারী স্বপ্ন বিহঙ্গ হয়ে থাকবেন না, মাটির পৃথিবীতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সৈনিক ব্রত গ্রহণ করবেন। গল্প লেখকেরা যুগের এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরা জগৎ জীবন সম্পর্কে সচেতন না হয়ে পারেননি, রাজনীতি সচেতনতাও সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছিল আরও ব্যপক মাত্রায়। সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সতীনাথ ভাদুড়ী , আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখরা এই সময়ের

লেখক। এরপর ১৯৪৭-এর দেশভাগ বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিককে দিল এক প্রবল বাঁক। পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলার সাহিত্যিক সমাজ তথা সাহিত্য ভাগ হয়ে গেল রাজনৈতিক কাঁটাতারের বেড়ায়। দুই বাংলার সাহিত্যে উঠে আসতে শুরু করল দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও ছিন্নমূলের বেদনা। ষাটের দশক থেকে সমরেশ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, বিমল কর প্রমুখরা শুরু করলেন নতুন নিরীক্ষা। এই দশকেই কথাসাহিত্যের আকাশে আবির্ভূত হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রথম যে ভাষা মনে আসে সে ভাষা কবিতার, যে ছবি চোখে ভেসে ওঠে সে ছবি 'নীরার'। কবিত্বই তাঁর হৃদয়ের প্রবল ও প্রধান সুর। গদ্যের প্রতি ছিল তাঁর চরম অনাসক্তি। তা সত্ত্বেও জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে নিতে হয়েছিল গদ্যে হাতেখড়ি। ১৯৬৬ তে শারদ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'। এরই মধ্য দিয়ে হয় তাঁর জীবনের পিতৃপক্ষের সূচনা। এখান থেকেই শুরু হয় সব্যসাচী লেখকের সাহিত্য রথের জয়যাত্রা। গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য থেকে আত্মজীবনী পর্যন্ত সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই শুরু হয় তাঁর অনায়াস গতায়াত। নীরাকে নিয়ে আজীবন তিনি যে ভাঙাগড়া চালিয়ে গেলেন, নীরার যে রূপ তিনি নির্মাণ করলেন, বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় সেই কবিতাগুলো দাঁড়িয়ে রইল অতুলনীয় স্থাপত্য হিসেবে। কথাসাহিত্যেও তিনি অকপট ভাষায় বলে গেলেন সহজ সুরে নিজের মনের কথা। বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেরিয়ে এসেছিলেন তিরিশ চল্লিশের দশকের ঔপন্যাসিক পরিসর থেকে। নিজের অভিজ্ঞতাকে কোনরকম নিষেধের তোয়াক্কা না করে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন; নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন প্রকৃত সত্যকে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'সরল সত্য', 'একা এবং কয়েক জন' প্রভৃতি উপন্যাসের পথে চলেছিল তাঁর জীবন নিরীক্ষা। এপ্রিল ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম পিরিয়ড

পিস 'সেই সময়' প্রথম খন্ড। দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হল ১৯৮২ তে। সময়ের গন্ডি পেরিয়ে তিনি প্রথম পাড়ি দিলেন ইতিহাসের পাতায়। এরপর এল অপর পিরিয়ড পিস 'পূর্ব-পশ্চিম', প্রথম খন্ড প্রকাশিত হল ১ লা বৈশাখ ১৩৯৫, দ্বিতীয় খন্ড জানুয়ারি ১৯৮৯। 'সেই সময়', 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাস দুটির সাংস্কৃতিক প্রবাহের সুরকে তিনি একটি খাতে প্রবাহিত করে দিলেন পরবর্তী উপন্যাস 'প্রথম আলো' (প্রথম খন্ড জানুয়ারি ১৯৯৬, দ্বিতীয় খন্ড জুলাই ১৯৯৭) তে। ঔপন্যাসিক সুনীল তাঁর এই তিন উপন্যাসের পরিসরে বাঙালীর বিবর্তনের ইতিবৃত্তকে তুলে ধরেছেন, করেছেন সময়ের সন্ধান। 'সেই সময়' — 'প্রথম আলো' — 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাস ত্রয়ী বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের একটা বৃহত্তর ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

আমার এই গবেষণা কর্মে আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই তিন উপন্যাসকে কেন্দ্র করে যে সময় সন্ধান, সেই সময় সন্ধানের স্বরূপ খুঁজেছি। উপন্যাস ও ইতিহাসকে সমান্তরাল ভাবে সন্ধান করে খুঁজে নিতে চেয়েছি বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিবর্তনের রূপরেখাকে। ঠিক কোন্ পথে বাঙালী জাতি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্য কোন্ পথে খুঁজে পেয়েছিল নিজের পরিচয়, বাঙালী নারী সমাজ ঠিক কোন্ পথে খুঁজে নিতে পেরেছিল মুক্ত আকাশ, দেশের আপামর সাধারণ মানুষ কোন্ প্রেরণার অভিঘাতে হয়েছিল রাজনীতি সচেতন, কোন্ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন হয়েছিল, দেশভাগের অভিঘাত কীভাবে বহু মানুষের জীবনকে করেছিল ছিন্নভিন্ন, কোন্ প্রেরণার অভিঘাতে শিক্ষিত যুবসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নক্সাল আন্দোলনের আগুনে, ধর্মের কারণে বিভক্ত হওয়া পাকিস্তান কোন্ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ধরে রাখতে পারেনি নিজেদের ঐক্য, আমার গবেষণার পরিসরে এই ইতিহাসের সন্ধান করেছি, ধরতে চেয়েছি বাঙালীর বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে।

প্রথম অধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তি পরিচয় সংক্ষেপ ও সাহিত্যকৃতি

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, অবিভক্ত বাংলার অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার আমগ্রামে। ‘অর্ধেক জীবন’ গ্রন্থে ঔপন্যাসিক লিখেছেন, “সেই উনিশশো চৌত্রিশ সালে সারা পৃথিবীতে কিংবা সারা দেশে, কিংবা কলকাতা শহরে, এমনকী কাছাকাছি ঢাকা শহরেও কীসব ঘটনা ঘটছে তার কোনো রেশই আমগ্রাম বা মাইজপাড়ার মত গ্রামে পৌঁছোয় না। ইংরেজিতে যাকে বলে ব্যাক অফ বিয়ন্ড, এইসব গ্রামগুলির সেই অবস্থা।”[১] পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, মা মীরা দেবীর প্রথম সন্তান তিনি। পৈতৃক বাড়ি মাইজপাড়া গ্রাম। তাঁর অন্যান্য ভাই বোন অনিল, অশোক এবং কণিকা। ১৯৩৮ সালে শুরু

হয়েছিল তাঁদের উত্তর কলকাতার জীবনের সূত্রপাত। গ্রে স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। বাবা ছিলেন কলকাতার টাউন স্কুলের শিক্ষক। হতদরিদ্র জীবন যাপন ও আর্থিক অনটনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রথম থেকেই তাঁর ছিল পরিপূর্ণ।

শৈশব জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে সুনীল লিখেছেন, "পয়সার বড় টানাটানি। আমার দরিদ্র স্কুল শিক্ষক বাবা প্রাণপণে, অতি পরিশ্রমে আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতেন ঠিকই, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু করার প্রশ্নই ছিল না। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করে দু-চার পয়সা আদায় করতাম। তখন লোকে কথায় কথায় বলত কলকাতা শহরে পথে পথে পয়সা ছড়ানো থাকে। এটা আংশিকভাবে আক্ষরিক সত্য ছিল। ধনী পরিবারে কেউ মারা গেলে তার শবযাত্রায় যেমন একদল লোক পেছনে পেছনে হরি বোল ধ্বনি দিত, তেমনই সেই দলের একজন ধামা থেকে মুঠো মুঠো খই ছড়িয়ে যেত, তার মধ্যে খুচরো পয়সা। যত বেশি বড়লোক, তত পয়সাও বেশি। সেই পয়সা কুড়োবার জন্যে হন্যে হয়ে থাকত একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ফুটপাতের যারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের বলে কাঙালি, বস্তির বাচ্চারা তাদের চেয়ে একটু উঁচুতে, এই দু দলেরই অধিকার ছিল পয়সা কুড়োবার। আমরা তো ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে আমাদের ওসব করতে নেই। লোভ যে হত না তা নয়, রাস্তা দিয়ে সে রকম কোনও শবযাত্রার মিছিল যাচ্ছে, গড়ানো পয়সাগুলোর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থেকেছি, অন্য ছেলেরা এসে টপাটপ কুড়িয়ে নিয়েছে। কোনও কাঙালি ছেলের হাতে এক মুঠো পয়সা দেখে কী ঈর্ষা যে হত! কিন্তু জ্ঞান উন্মেষের পর থেকেই জানতাম, কাঙালি বা বস্তির ছেলেদের চেয়ে আমরা আলাদা, আমাদের দুবেলা খাওয়া জুটুক বা না জুটুক, পরিস্কার জামা পরে রাস্তায় বেরোতে হবে। কাঙালিদের মতন শবযাত্রায় পয়সা কুড়োলে, চেনাশোনা কেউ দেখলে বাড়িতে বলে দেবেই, তারপর গুরুজনদের কেউ মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবে। ... একদিন গ্রে

স্ট্রিট এ হরি ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, খুব বড় একটা শব মিছিল যাচ্ছে,... শব-মিছিলটি চলে গেলে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে, হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, রাস্তার পাশের ময়লা জলে চকচক করছে সাদা মতন কী যেন, একটা সিকি? কাঙালিরা ওটা দেখতে পায়নি।... এক সিকিতে অন্তত আটখানা ঘুড়ি, ষোলোখানা বেগুনি, চারখানা আইসক্রিম, অন্তত পাঁচটা বুড়ির মাথার পাকা চুল, পাঁচটা খাতা আরও কত কী। এদিক ওদিক তাকিয়ে টপ করে তুলে নিলাম সিকিটা। যতদূর মনে পড়ে আমার জীবনে সেটাই প্রথম স্বাধীন উপার্জন।"[২] এই বিবৃতি সুনীলের জীবনের বাস্তব সত্যকে চিনিয়ে দেয়। শৈশবের বহু না পাওয়াই তাঁকে চিনিয়েছিল লড়াই করে বড় হওয়ার পথ, গড়ে তুলেছিল পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে, যেকারণেই তিনি তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর ভূমিকে।

ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে জন্ম হওয়ায় শৈশবেই সুনীলকে পোহাতে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশভাগের মত বিপর্যয়। জীবনের এ সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে ওঠার আতুড়ঘর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের ওপর বড়সড় আঘাত হেনেছিল। একে একে বন্ধ হয়েছিল বহু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। পরিস্থিতির বিপাকে চাকরি হারাতে হয়েছিল সুনীলের পিতাকে। অসহায় অবস্থায় নিতান্ত বাধ্য হয়েই তিনি পাঠিয়ে দেন স্ত্রী ও সন্তানদের তাঁর পিতৃভূমি মাইজপাড়া গ্রামে। এখানেই সুনীলের প্রথম নিবিড় পরিচয় পল্লীবাংলার সঙ্গে। সুনীল জানিয়েছেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম শিকার আমার বাবা। স্কুল কলেজ-বন্ধ হয়ে গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য, বে-সরকারি স্কুলে ছাত্রদের মাইনে থেকেই শিক্ষকদের বেতন হয়। স্কুল বন্ধ, বাবা বেকার হয়ে গেলেন, তখন আর সংসার চালাবেন কী করে, আমাদের পাঠিয়ে দিলেন গ্রামের বাড়িতে। সেবারে আমি মাইজপাড়া

গ্রামের বীরমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হই।"[৩] সে সময়ে কালোবাজারিদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে চাল অগ্নিমূল্য হলে, দুমুঠো ভাতের সংস্থানও হয়নি এই পরিবারের, শুধু আলুসেদ্ধ খেয়েই কাটাতে হয়েছিল বহুদিন। "গ্রামে যুদ্ধের কোনও রেশ নেই, কামান বন্দুকের শব্দ দূরে থাক, এখানকার আকাশ দিয়ে কোনও বিমানও উড়ে যায় না। তবু যুদ্ধের ধাক্কা লাগে এই নিস্তরঙ্গ গ্রামগুলিতে। প্রথম আঘাত হানে রান্নাঘরে। ... ক্রমে চাল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।"[৪] প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার অপর্ণা সেনকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে সুনীল জানিয়েছেন, এই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতেই তাঁর একটানা অনেকগুলো দিন গ্রামে থাকার সুযোগ হয়েছিল, বলেছেন, "সেই সময়েই সাঁতার শিখি, গ্রামের গাছগুলো গ্রামের মানুষদের চিনতে শিখি।"[৫] আসলে খাদ্যশস্যের প্রকৃত অভাবকে বলে দুর্ভিক্ষ। পরবর্তীকালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন যে সেই তেতাল্লিশ সালে খাদ্যশস্য ছিল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সরকার ও কালোবাজারিরা তার অনেকখানিই সরিয়ে রেখেছিল, সেই জন্যেই খোলা বাজারের চালের এমন আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, তা চলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। দেশে চাল আছে, তবু দেশের মানুষ অনাহারে ধুঁকছে। সুনীল লিখেছেন, "দিনের পর দিন এই রকম, এক এক রাতে আমরা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের স্বপ্ন দেখি। মনে হয় যেন এ জীবনে আর ভাত খাওয়া হবে না। সহপাঠীদের মধ্যে যে দু'চারজনের বাড়িতে ভাত রান্না হয়, তাদের মুখে আমরা ভাতের গল্প শুনি। হেডমাস্টারের ছেলেটি সেইরকম একজন সৌভাগ্যবান, সে অবজ্ঞার সঙ্গে একদিন বলল, তার একথালা ভাতের ওপর একটা আরশোলা এসে পড়েছিল বলে সে পুরো ভাতটা বাড়ির কুকুরকে খাইয়ে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ সেই কুকুরটির প্রতি আমাদের ঈর্ষা হয়। এ কাহিনী শোনাবার সময় সেই লস্কর-নন্দন জামার পকেট থেকে একটি মূল্যবান লাঠি লজেন্স বার করে দেখিয়ে দেখিয়ে চোষে।"[৬] এসব বিবৃতি থেকে চিনে নেওয়া

যায় সময়ের স্বরূপ তথা সাহিত্যিক সুনীলের গড়ে ওঠার কালপর্বকে। আসলে চল্লিশের দশক বাংলায় মৃত্যুর দশক। বহু মৃত্যু, বহু হানাহানির দশক। যাঁরা সেই মৃত্যুর দশক পার হয়ে বেঁচেছিলেন, তাঁরা বেঁচেছিলেন বহু হত্যার পটভূমিকায়। এহেন জটিল জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই সুনীল শৈশব থেকেই সম্যক পরিচিত হয়েছিলেন জীবনের বহুমাত্রিক রূপের সঙ্গে, প্রতিনিয়ত জগৎ ও জীবনকে চেনার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ভিত্তিভূমি।

খুব কম বয়স থেকেই মায়ের কাছ থেকে সুনীল পেয়েছিলেন বই পড়ার দুরন্ত অভ্যাস। 'বঙ্কিম রচনাবলী' পড়েছিলেন দশ এগারো বছর বয়সে, 'শেষের কবিতা' ক্লাস সেভেনে, প্রথম ইংরাজি উপন্যাস পড়েছিলেন অস্কার অয়াল্ডের 'Picture of Dorian Gray'। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মল্লিকা সেনগুপ্তকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আমি বই যেখানে পেতাম পড়তাম, মামাবাড়িতে একটা লাইব্রেরি ছিল। সেখান থেকে বই নিয়ে পড়তাম।... মায়ের ছিল ভীষণ পড়ার নেশা। লাইব্রেরি থেকে তাঁর জন্য বই আনতে হত। বয়েজ ওন লাইব্রেরি নামে উত্তর কলকাতায় একটা বিখ্যাত লাইব্রেরি আছে। সেখান থেকে বই আনতাম রোজ দুখানা। মা দুটোই একদিনে শেষ করে ফেলতেন। আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে বইগুলো পড়তে শুরু করলাম।"[৭]

১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত তাঁদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে। দেশভাগের মুহূর্তেই পূর্ববঙ্গের বিশাল পরিবার এসে পড়েছিল তাঁর পিতার ওপর। সুনীল লিখেছেন, "দেশ স্বাধীন হল, আমরা দেশ হারালাম।... দেশবিভাগ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে, আমি আর সে জঞ্জাল বাড়াতে চাই না। তবে সেই প্রসঙ্গ উঠলে এখনও ক্রোধবহ্নি জ্বলে ওঠে, সেই দুষ্কর্মের হোতাদের ক্ষমা করতে পারি না। সেই সময় যে-

সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও অসূয়া তৈরি হয়েছিল, তাতে ভারত বিভাগ হয়ত অবধারিত ছিল। কিন্তু যাতে কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যত জীবনের দিশা বদলে যাবে, সেই কাজ কি অত দ্রুততার সঙ্গে করা যায়?"[৮] শুরু হয়েছিল চরম অনটন ও দারিদ্র। বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার সামান্য উপার্জনে তাঁর বাবা নিজের সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যেতেন, তার ওপর এত সব দায়িত্বের বোঝা এসে পড়ায় তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন, উপার্জন বাড়াবার জন্যে পাগলের মতন টিউশানি করতেন। তবে সুনীল জানিয়েছেন, সেই দারিদ্রের কোনও তিক্ত স্মৃতি তাঁর ছিল না। দেশের এই স্বাধীনতা কিশোর জীবনেই তাঁদের দিয়েছিল স্বাধীনতার স্বাদ, দিয়েছিল বাড়ির বাইরে একা একা ঘুরে বেড়াবার সুযোগ। বাবা রাত সাড়ে দশটার আগে বাড়ি ফিরতেন না, মা অতিথি ও ছোটো ভাই-বোনেদের নিয়ে ব্যস্ত, সুতরাং শাসন করার মতো কেউ ছিল না। সেই বয়েসেই সন্ধ্যেবেলা পড়ায় ফাঁকি দিয়ে শহরের অলিগলি ঘুরে বাড়িয়ে ফেলেছিলেন নিজের চেনা জগতের পরিধি।

স্কুল জীবনেই সুনীল গড়ে ছিলেন 'মণিমেলা' নামে একটি দল। সেসময়ে আনন্দবাজারের প্রধান প্রতিযোগী ছিল 'দৈনিক যুগান্তর'। সেই পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠা ছোটোদের জন্যে বরাদ্দ ছিল। তার সম্পাদক অখিল নিয়োগী ওরফে স্বপন বুড়ো, তাঁর নেতৃত্বে 'সব পেয়েছির আসর' নামে একটি দল গড়ে উঠেছিল, তারও অনেক শাখা ছিল। সুনীলদের 'মণিমেলা' ছিল এরই শাখা। নিছক স্কুল কলেজের গণ্ডির বাইরে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অল্প বয়সি ছেলে মেয়েদের পক্ষে বেশ উপকারী ছিল। স্কুল জীবনে সুনীল বয়েজ স্কাউটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুরুজনদের সঙ্গ ছাড়া ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও দারিদ্র কোনোদিনই পিছু ছাড়েনি তাঁদের। স্কুল জীবনের শেষপ্রান্তে চোদ্দো বছর বয়েসে টিউশনি

শুরু করতে হয়েছিল তাঁকে। শৈশব কৈশোরে পাওয়া এই টুকরো টুকরো স্বাধীনতাগুলোই তাঁকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

১৯৫০ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর তিনি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন, ১৯৫১ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ছেড়ে দমদমের মতিঝিল কলেজে আই. এস. সি তে ভর্তি হন। এই বছরেই তাঁর প্রথম কবিতা একটি চিঠি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই কবিতা রচনার ইতিহাস সত্যিই খুব মধুর। 'অর্ধেক জীবন'-এ তিনি লিখেছেন, "বয়েসে আমার থেকে মাত্র এক বছরের ছোটো, অপর্ণা সেই বয়েসেই পাগলের মতন কবিতা পড়ে। মাঝে মাঝেই সে এমন সব কবিতার লাইন বলত, যা আমার অজানা। কখনও রবীন্দ্রনাথ থেকে দু'পঙক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে জিজ্ঞেস করত, এর পরে কী বলো তো? আমি হেরে যেতাম প্রায়ই। অপর্ণা যদি খেলোয়াড়দের ভক্ত হত, আমি নিশ্চিত খেলায় মন দিতাম, যদি গায়কদের পছন্দ করত, আমি গলা সাধতাম, তাকে খুশি করার একমাত্র উপায় নতুন কোনও কবিতা মুখস্ত বলা, তাই আমার কবিতা পাঠ শুরু হল নতুন উদ্যমে।... একদিন লিখে ফেললাম একখানা প্রেমের কবিতার মতন কিছু একটা, কোনও নারীর প্রতি স্বগতোক্তি বা চিঠি। অবশ্যই অপর্ণা নাম্নী সেই কিশোরীর উদ্দেশ্যে।... ওদের বাড়িতে 'দেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখেছি। সেই পত্রিকায় গদ্য রচনাগুলির তলায় মাপ মতন পদ্য ছাপা হয়, অপর্ণা সেগুলিও পড়ে।... পত্রিকাটির ঠিকানা দেখে একদিন খামে ভরে পাঠিয়ে দিলাম আমার সেই কবিতাটি, নাম দিলাম 'একটি চিঠি'।"[৯]

১৯৫২ সালে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন সিটি কলেজে। ১৯৫৩ সালে রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'ইদানীং' পত্রিকায় 'বাঘ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গল্পটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবনের দ্বিতীয় কবিতা 'অগ্রণী' পত্রিকায় এবং তৃতীয় কবিতা 'শতভিষা' পত্রিকায় প্রকাশিত হল। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় চতুর্থ কবিতা 'তুমি'

প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্য চর্চা নতুন মোড় নেয়। এই কবিতাটি আবু সয়ীদ আইয়ুব সংকলিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' সংকলনে স্থান পায়। এই সময়ে সংসারের দায় নিতে তাঁকে মুদির দোকানে হিসেব রাখার কাজ নিতে হয়েছিল। প্রথমে দীপক মজুমদারের সঙ্গে একসঙ্গে কবিতার বই করতে চেয়েছিলেন। সিগনেট প্রেস থেকে এই কবিতার বই প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সাক্ষাৎ করেছিলেন ডি. কে. গুপ্তের সঙ্গে। 'অর্ধেক জীবন'-এ সুনীল লিখেছেন, "দীপক আমাদের দ্বৈত কাব্যগ্রন্থ ছাপার প্রস্তাব জানিয়ে, সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে মলাট আঁকতে প্রায় রাজি করে ফেলেছে, তা উল্লেখ করতেও দ্বিধা করল না। ডি কে এ-প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিলেন না। তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন না, বরং প্রশ্ন করতে লাগলেন,... আলোচনার মধ্যপথে ডি কে বললেন, আপনারা কবিতার বই ছাপবেন তার এত ব্যস্ততা কীসের? তার চেয়ে একটা কাজ করুন না, আপনাদের বন্ধুবান্ধব, সমসাময়িক কবিদের অনেকের লেখা একসঙ্গে ছাপুন,... বাংলা কবিতার তারুণ্যের ধারাটি অনুধাবন করার আর কী উপায় আছে? অর্থাৎ নতুন একটি কবিতার পত্রিকা, যাতে শুধু তরুণ বয়স্কদের রচনা মুদ্রিত হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি, কিছু আলোচনার পর নামও ঠিক হয়ে গেল, 'কৃত্তিবাস'। ডি কে বললেন, বাংলা কবিতার আদি কবিদের মধ্যে প্রধান, কৃত্তিবাস, তাঁর নামের পত্রিকায় থাকবে অতি সাম্প্রতিক কবিতা, অর্থাৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হবে আধুনিকতা। তিনিই প্রেস ঠিক করে দিলেন, পরদিন থেকেই আমরা মেতে উঠলাম রচনা সংগ্রহের কাজে।"[১০] 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬০। এই ডি কে গুপ্তের প্রস্তাবেই শুরু করা হয়েছিল 'হরবোলা' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৪ সালে তিনি অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। এই বছরেই ইউনেস্কোর অ্যাডাল্ট এডুকেশন স্কিমে হাবড়াতে চাকরি পান তিনি। এই কাজের সূত্রে গ্রাম জীবনের সঙ্গে, নিরক্ষর মানুষদের সাহচর্যে তাঁর এক নতুন উপলব্ধির জগৎ উন্মোচিত হয়েছিল। তিনমাস

পরে চাকরি ত্যাগ করেন ও নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানিতে অফিসার্স ট্রেনি হিসেবে চাকরি পান। সতেরো দিন বেহালায় দুঃসহ প্রশিক্ষণের চাপে আবার চাকরি ত্যাগ করেন। আবার ফিরে যেতে হয় টিউশনির জীবনে। বি এ পরীক্ষা দেবার পর, সাড়ে তিন মাস বাদ দিয়ে, টানা পাঁচ বছর বেকার ছিলেন তিনি। এই দীর্ঘ বেকারত্ব, টিউশনি নির্ভরতা জীবনের বহুমুখীতার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে করণিকের চাকরি পান তিনি। আর্থিক অনটন সামলাতে সন্ধ্যায় 'জনসেবক' পত্রিকায় পার্ট টাইমও নিতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কবিতার বই, 'একা এবং কয়েকজন'। ১৯৬১ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়।

১৯৬৩ সালে আমেরিকার আইওয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পল এঙ্গেলের আমন্ত্রণে এবং বৃত্তি পেয়ে আন্তর্জাতিক লেখক কর্মশালায় যোগদান করার সুযোগ পান, তাঁর জীবনের একটা নতুন দিগন্ত খুলে যায়। মার্গারিট নামে এক ফরাসি যুবতীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই সম্পর্ক পরিণতি না পেলেও সুনীল জানিয়েছেন, "জীবনে যে কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আমাকে কিছু না কিছু দিয়ে গেছে। মার্গারিটও তাদেরই একজন। সে আমাকে প্রথমবার অয়াপোনিয়ার-এর কবিতা পড়িয়েছিল। আমি পড়ে ভাবলাম 'এ কী? এমন কবিতাও লেখা হয়েছে?' সেই প্রভাব আমার ভিতরে থেকেই গেছিল।"[১১] ১৯৬৪ সালে আমেরিকা থেকে ফেরার পথে ইংল্যান্ড ভ্রমণের সুযোগ পান। টি. এস. এলিয়ট এবং স্টিফেন স্পেনডারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। এই সময়েই সুইজারল্যান্ড, প্যারিস ভ্রমণ করেন, নিজের শখে রোম, কায়েরোতে থামতে থামতে ফিরলেন কলকাতায় এই বছরেই পকেটে দশ টাকা নিয়ে। বিশিষ্ট চলচিত্রকার অপর্ণা সেনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, "তখনকার দিনে 'রাউন্ড

দ্য ওয়ার্ল্ড’ বলে একটা এয়ার টিকিট পাওয়া যেত। সেটা কাটলে তুমি যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই নিয়ে যাবে।”[১২] কলকাতায় ফিরে আবার বেকারত্ব, আবার শুরু হল কঠিন জীবন সংগ্রাম।

এই সময়েই জীবিকার প্রয়োজনে নীললোহিত, নীল উপাধ্যায় ছদ্মনামে ‘দেশ’ ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনায় তিনি হাত দিলেন, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গদ্যসাহিত্যে তাঁর হয়ে গেল হাতেখড়ি। ১৯৬৬ সালে ‘দেশ’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’। এই বছরেই সনাতন পাঠক ছদ্মনামে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনার সূচনা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর উপন্যাস ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’, যা সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশনায় চলচিত্র রূপ পেয়েছিল ১৯৬৯ সালে। ১৯৬৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অপর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’। পরের বছর সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশনায় মুক্তি পায় ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, সালটা ১৯৭০।

১৯৭০ সালেই তিনি ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় পান সাব এডিটরের চাকরি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে খুব নাড়িয়ে দিয়েছিল। ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও তিনি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যেতেন সীমান্ত পেরিয়ে। দুই বাংলার মিলনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। দুই জার্মানির এক হওয়ার দিনে বার্লিন প্রাচীর ধ্বংসের (৯ নভেম্বর ১৯৮৯) সাক্ষী তিনি ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন বাদল বসু। ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম বারের জন্য ‘আনন্দ পুরস্কার’ পান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখা ও প্রকাশিত হয়, সেগুলি হল ‘একা এবং কয়েক জন’, ‘জীবন যে রকম’, ‘অর্জুন’। এই সময় পর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল দুটি কাব্যগ্রন্থ, ‘বন্দী, জেগে আছো’ এবং ‘আমার স্বপ্ন’। ‘সেই সময়’ উপন্যাসের আরম্ভ করেছিলেন এই সময়েই। ১৯৮১ তে তিনি দীর্ঘ সতেরো বছর পর বিভিন্ন বিদেশী সংগঠনের আমন্ত্রণে আইওয়া, কানাডা,

ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁদের সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘বুধসন্ধ্যা’। এই বছর ইউনিনারি ট্র্যাক্টে ক্যানসার ধরা পড়েছিল। কাউকে কিছু না জানিয়ে শুধুমাত্র দুজন বন্ধুর সাহায্যে সুস্থ হওয়ার পথে হেঁটেছিলেন। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ‘সেই সময়’ উপন্যাসের জন্য প্রদান করলেন বঙ্কিম পুরস্কার। এই বছর একটি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া।

১৯৮৪ সালে সুইডিশ সরকারের আমন্ত্রণে সুইডেন ভ্রমণের সুযোগ পান। ফেরার পথে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং কেনিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৮৫ সালে ‘সেই সময়’ উপন্যাসের জন্য ‘সাহিত্য আকাদেমি’ পুরস্কার পান। এই বছরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা ‘কৃত্তিবাস’ বন্ধ করে দেন। ১৯৮৬ সালে ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি কনফারেন্স-এর আমন্ত্রণে যুগোস্লাভিয়া ভ্রমণ ও ভারত উৎসবে যোগ দিতে আমেরিকার আটটি শহরে কবিতা পাঠ করেছিলেন সুনীল। তাঁর কবিতার ইংরাজি অনুবাদ পড়েন অ্যালেন গিনসবার্গ। অনুষ্ঠানগুলি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট, লস অ্যাঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফে, কোলোরাডোর বোল্ডার শহরে, শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, কলম্বাসের ওহায়ো ও বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়। অক্টোবর মাসে ফ্রাঙ্কফুর্টে ওয়ার্ড বুক ফেয়ারে যোগদান করেন। ১৯৮৭ থেকে শুরু করেন ‘পূর্ব-পশ্চিম’ লেখার কাজ, এই বছরেই বেলজিয়ান কবি ভ্যারনার ল্যামবারসি ফরাসি ভাষায় ‘জ্বলন্ত জিরাফ’ অনুবাদ করেন। ১৯৮৮ সালে ভারত উৎসবে যোগ দিতে সরকারি আমন্ত্রণে চেকোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া ভ্রমণ করেন। ফেরার পথে তুরস্ক ঘুরে ফেরেন। ১৮৮৯ সালে তিনি ‘আনন্দ পুরস্কার’ পান। এই বছরেই একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি সস্ত্রীক বাংলাদেশ যান। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পতন,

এই বছর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সম্পাদক হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি সফর করেন তিনি, আই. সি. সি. আর এর আমন্ত্রণে চিন ভ্রমণও করার সুযোগ পান। ১৯৯২ সালে তিনি যশোর সাহিত্য সম্মেলনের আমন্ত্রণে যশোর ভ্রমণ করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন শামসুর রহমান, রফিক আজাদ ও সৌমিত্র মিত্র। যশোরে সংবর্ধনা লাভ করেন। এই বছরেই সস্ত্রীক কানাডা ভ্রমণ করেন ফেরার পথে আমেরিকা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড হয়ে ফেরেন। ফ্রান্সে যান সত্যজিৎ রায় উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে। এই বছর তাঁর ‘অর্জুন’ উপন্যাস ডাচ ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৯৩ সালে তিনি বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী সমিতির আমন্ত্রণে জাপান ভ্রমণ করেন। এই বছরেই ‘প্রথম আলো’ উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। ১৯৯৪ সালে তিনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবণে বক্তৃতা, সাহিত্য আকাদেমির আমন্ত্রণে দিল্লিতে ‘মিট দ্য অথর’ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা। ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কোর সম্মেলনে অবজারভার হিসেবে মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন। এই বছরে তিনি দ্বিতীয়বার চিন ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের নির্বাচনে সার্ক দেশগুলোর পর্যবেক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন দশজন ভারতীয় প্রতিনিধির অন্যতম হিসেবে শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে। এই বছরেই তিনবার বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৯৭ সালে জাতীয় কবিতা উৎসব উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এই বছরেই ‘সেই সময়’ উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ ‘দোজ ডেজ’ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক অরুণা চক্রবর্তী। এই বছরেই ‘প্রথম আলো’ও উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এপ্রিল মাসে আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স ভ্রমণ করেন, নভেম্বর মাসে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি সাহিত্য একাডেমির বাংলা

বিভাগের মুখ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জুন মাসে নেহেরু সেন্টারে সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পান তিনি। প্যারিস ও সুইজারল্যন্ড ভ্রমণ করেছিলেন এই বছরেই। এই বছরেই বাল্যবন্ধু ভাস্কর দত্তের সঙ্গে নবপর্যায়ে ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা প্রকাশ ও কৃত্তিবাস পুরস্কার পুনঃপ্রবর্তন করেন। ১৯৯৯ সালে ট্রেনে হিমাচল প্রদেশ যাত্রা। ১৯শে মে ভারতীয় জাদুঘরে ভাষা শহীদ স্মারক সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে ‘ক্যালক্যাটা’র পরিবর্তে ‘কলকাতা’ করার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। এই বছর তিনি ‘আনন্দ পুরস্কার’ পান। ২০০০ সালে কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনে যোগদান করেন। কবিতা উৎসবে যোগ দিতে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এই বছরের জুলাই মাসে বঙ্গসম্মেলনে যোগদান করেন। দেশে ফিরে আবার ৪ অক্টোবর শিকাগো যাত্রা করেন। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও রচনাপাঠ করেন। ১৫ অক্টোবর স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ -এর আমন্ত্রণে লন্ডন গিয়েছিলেন তিনি। ২০০১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া রাজ্যে একটি আর্ন্তজাতিক কবি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পান তিনি। সেখানে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে বারো দিন বিভিন্ন শহরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাবার পথে নিউ ইয়র্ক এবং লসএঞ্জেলস -এর দুটি বইমেলা উদ্বোধন করেন। ২০০২ সালে তিনি জার্মানির মিউনিখ শহর থেকে আন্তর্জাতিক পুস্তক সপ্তাহ পালন উপলক্ষে আমন্ত্রণ পান। এই বছরেই নভেম্বর মাসে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কানাডা যাত্রা ও টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্বোধন। কানাডার দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। ২০০৩ সালে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. পান। এই বছরেরই মার্চ মাসে ‘সাহিত্য একাডেমি’র সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এপ্রিল মাসে তিনি বাংলাদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে নিজের জন্মস্থান দেখতে গিয়েছিলেন। চির যুবক সুনীল জীবনের প্রান্তভাগে শারীরিক সমস্যার কারণে কিছুটা গৃহমুখী হয়ে পড়েছিলেন।

২০০৯ সাল নাগাদ তাঁর দ্বিতীয়বার ক্যান্সার ধরা পড়ে, এবং ২০১২ সালের ২৩ শে অক্টোবর এই চিরযুবকের লোকান্তর ঘটে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস, ছোটোগল্প, কাব্য কবিতার সঙ্গে ভ্রমনকাহিনী, কিশোর সাহিত্য রচনা করে গেছেন। পাশাপাশি নীললোহিত ছদ্মনামে বেশ কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই বহুল সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে ইতিহাসের পটভূমিকে সামনে রেখে রচিত ত্রয়ী উপন্যাস ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’, ‘পূর্ব-পশ্চিম’-কে কেন্দ্র করে বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান আমার গবেষণার বিষয়। এর বাইরে তাঁর রচিত সাহিত্য সম্ভারের পরিচয় সংক্ষেপ এখানে দেওয়া হল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে অন্যতম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ‘একা এবং কয়েকজন’ (প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৬৪), ‘আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি’ (চৈত্র ১৩৭২), ‘বন্দী, জেগে আছো’ (প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৭৫), কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে ‘যুগলবন্দী’ (প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৭৯), ‘জাগরণ হেমবর্ণ’ (২৫ শে বৈশাখ ১৩৮১), ‘মন ভালো নেই’ (প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৮৩), ‘এসেছি দৈব পিকনিকে’ (শ্রাবণ ১৩৮৪), ‘হঠাৎ নীরার জন্য’ (জুলাই ১৯৭৮), ‘দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়’ (জৈষ্ঠ ১৩৮৬), ‘স্মৃতির শহর’ (কলকাতা বইমেলা ১৯৮৩), ‘প্রেমের কবিতা’ (অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৯২), ‘নীরা, হারিয়ে যেও না’ (বইমেলা ১৯৮৯), ‘রাত্রির রঁদেভু’ (জানুয়ারি ১৯৯৫), ‘কেউ কথা রাখেনি’ (২১শে বইমেলা ১৯৯৫), ‘সেই মুহূর্তে নীরা’ (জানুয়ারি ১৯৯৭), ‘নীরা এবং নীরা’ (বইমেলা ২০০০) ইত্যাদি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল, ‘আত্মপ্রকাশ’ (কার্তিক ১৩৭৩), ‘যুবক যুবতীরা’ (চৈত্র ১৩৭৩), ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ (জানুয়ারি

১৯৬৮), ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ (শ্রাবণ ১৩৭৬), ‘সরল সত্য’ (নভেম্বর ১৯৬৯), ‘উত্তরাধিকার’ (ভাদ্র ১৩৭৭), ‘গভীর গোপন’ (ফেব্রুয়ারি ১৯৭১), ‘জীবন যে রকম’ (মার্চ ১৯৭১), ‘কালো রাস্তা সাদা বাড়ি’ (মে ১৯৭১) ‘অর্জুন’ (অক্টোবর ১৯৭১), ‘অচেনা মানুষ’ (মাঘ ১৩৭৮), ‘একা এবং কয়েকজন’ (১ বৈশাখ ১৩৮১), ‘সত্যের আড়ালে’ (জন্মাষ্টমী ১৩৮১), ‘সংসারে এক সন্ন্যাসী’ (১ বৈশাখ ১৩৮২), ‘পায়ের তলার মাটি’ (মে ১৯৭৮), ‘সেই দিন সেই রাত্রি’ (ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৮৫), ‘জল জঙ্গলের কাব্য’ (দোলপূর্ণিমা ১৩৮৭), ‘সেই সময়’ (১ম খণ্ড) (১ বৈশাখ ১৩৮৮), ‘সেই সময়’ (২য় খণ্ড) (১ বৈশাখ ১৩৮৯), ‘অমৃতের পুত্র-কন্যা’ (নভেম্বর ১৯৮৩), ‘পূর্ব –পশ্চিম’ (১ম খণ্ড) (১ বৈশাখ) ‘পূর্ব -পশ্চিম’ (২য় খণ্ড) (জানুয়ারি ১৯৮৯), ‘জোছনাকুমারী’ (১ বৈশাখ ১৩৬৯), ‘ধূলিবসন’ (জানুয়ারি ১৯৯০), ‘প্রথম আলো’ (প্রথম পর্ব) (জানুয়ারি ১৯৯৬), ‘প্রথম আলো’ (দ্বিতীয় পর্ব) (জুলাই ১৯৯৭), ‘রাণু ও ভানু’ (জানুয়ারি ২০০১), ‘নিঃসঙ্গ সম্রাট’ (এপ্রিল ২০০৫) ইত্যাদি।

নীললোহিত হিসেবেও তিনি সৃষ্টি করেছেন বহু অবিস্মরণীয় গদ্য সম্ভার। ‘নীললোহিতের চোখের সামনে’ (আষাঢ় ১৩৭৭), ‘নীললোহিতের অন্তরঙ্গ’ (মার্চ ১৯৭১), ‘নীললোহিতের চেনা অচেনা’ (জৈষ্ঠ ১৩৭৯), ‘দৃষ্টিকোণ’ (জৈষ্ঠ ১৩৮০), ‘মায়াকাননের ফুল’ (অগ্রহায়ণ ১৩৮২), ‘সুদূর ঝর্ণার জলে’ (আগস্ট ১৯৭৬), ‘হঠাৎ দেখা’ (নভেম্বর ১৯৭৬), ‘স্বর্গের খুব কাছে’ (অক্টোবর ১৯৭৭), ‘পাঁচ রকম ভূমিকায়’ (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩), ‘নিরুদ্দেশের দেশে’ (বইমেলা ১৯৮৬), ‘নীললোহিত অমনিবাস’ (১ বৈশাখ ১৩৯৬), ‘অর্ধেক মানবী’ (পৌষ ১৩৯৬), ‘কৈশোর’ (জানুয়ারি ১৯৮৯), ‘ফুলমনি–উপাখ্যান’ (মাঘ ১৩৯৮), ‘নীললোহিতের আয়না’ (জানুয়ারি ১৯৯৪), ‘নিয়তির মুচকি হাসি’ (নভেম্বর ১৯৯৫) ইত্যাদি।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গল্পগ্রন্থ গুলি হল, ‘গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প’ (মে ১৯৭৮), ‘কোকিল ও লরিওয়ালা’ (এপ্রিল ১৯৭৯), ‘পোষ্টমর্টেম’ (শ্রাবণ ১৩৮৫), ‘দরজায় আড়ালে’ (মার্চ ১৯৮০), ‘প্রতিশোধের একদিক’ (অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৮৭), ‘শাজাহান ও নিজস্ব বাহিনী’ (বইমেলা ১৯৮৩), ‘সপ্তকন্যার কাহিনী’ (২২ সেপ্টেম্বর), ‘প্রেমিক ও স্বামী’ (১৪ এপ্রিল ১৯৯৩), ‘দময়ন্তীর মুখ’ (জানুয়ারি ১৯৯৭) ইত্যাদি।

ভ্রমণকাহিনীর জগতেও তাঁর অবাধ বিচরণ। ‘স্বর্গ নয়’ (মাঘ ১৩৭৭), ‘মানস ভ্রমণ’ (কলকাতা বইমেলা ১৯৮০), ‘রাশিয়া ভ্রমণ’ (বৈশাখ ১৩৯১), ‘পায়ের তলায় সরষে’ (নববর্ষ ১৩৯৩), ‘ছবির দেশে কবিতার দেশে’ (জানুয়ারি ১৯৯১) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু-কিশোর সাহিত্যেও তিনি নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন অনায়াসেই। কাকাবাবুকে কেন্দ্রকরে লেখা রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি জনপ্রিয়তায় ফেলুদাকে টেক্কা দিয়েছিল। ‘ভয়ংকর সুন্দর’ (ফেব্রুয়ারী ১৯৭২), ‘সবুজ দ্বীপের রাজা’ (মে ১৯৭৮), ‘ভয়ংকর প্রতিশোধ’ (জুলাই ১৯৭৯), ‘জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ’ (অক্টোবর ১৯৭৯), ‘হাতিচোর’ (অক্টোবর ১৯৮০), ‘পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক’ (মার্চ ১৯৮১), ‘জলদস্যু’ (বৈশাখ ১৩৮৯), ‘ভূপাল রহস্য’ (১ বৈশাখ ১৩৯০), ‘জলের তলায় রাজপুরী’ (নভেম্বর ১৯৮৩), ‘নীল মানুষের কাহিনী’ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্রঃ

১। পৃ ১৫, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২। পৃ ২৩, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩। পৃ ২৭, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৪। পৃ ২৮,২৯, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৫। পৃ ৬৬, অপর্ণার আড্ডায়, পরমা, সম্পাদক অপর্ণা সেন, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, ১৫ নভেম্বর ২০১২

৬। পৃ ৩১, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৭। পৃ ১২, মল্লিকার সঙ্গে একান্তে ৫৯ মিনিট, আরম্ভ, সম্পাদক লালন বাহার, বর্ষ ১, সংখ্যা ৮, নভেম্বর ২০১২,

৮। পৃ ৮৩, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৯। পৃ ১১০, ১১১, ১১২, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১০। পৃ ১৪০, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১১। পৃ ৬৯, অপর্ণার আড্ডায়, পরমা, সম্পাদক অপর্ণা সেন, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, ১৫ নভেম্বর ২০১২

১২। পৃ ৭০, অপর্ণার আড্ডায়, পরমা, সম্পাদক অপর্ণা সেন, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, ১৫ নভেম্বর ২০১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রয়ী উপন্যাসে ('সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম') সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের প্রেক্ষাপট

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম' বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তুলনাহীন সৃষ্টি। কথা সাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই সুনীল বাংলা সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যের জগতকে দিয়েছিলেন এক নতুন দিগন্তের সন্ধান। তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতার পাতায় উঠে এসেছিল সমকালীন জীবনের বহুমুখী চিত্রণ। 'আত্মপ্রকাশ' (১৯৬৬), 'যুবক যুবতীরা' (১৯৬৬), 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৬৮), 'সরল সত্য' (১৯৬৯), 'মেঘ বৃষ্টি আলো' (১৯৭১) 'অর্জুন' (১৯৭১) প্রভৃতি উপন্যাস; 'একা এবং এবং কয়েক জন' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' (১৩৭৪), 'হঠাৎ নীরার জন্য' (১৯৭৮) প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ; 'বৃত্তের বাইরে' (১৩৭৭), 'ব্যক্তিগত' (১৯৭২), 'সমুদ্রের সামনে' (১৩৭৯), 'সোনালী দিন' (১৯৭৭) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের বৃহত্তর ভূমিতে তিনি নিরীক্ষা করেছেন জটিল জীবন সমস্যাকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মল্লিকা সেনগুপ্তের সঙ্গে একটি একান্ত আলাপচারিতায় নিজের লেখা সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "প্রথম প্রথম লেখার মধ্যে

জীবনের কথা ছিল, কবিতাও তাই ছিল, বেশিরভাগ কবিতার লক্ষ্যই আমি, মানে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীকে যেভাবে দেখেছি।"[১]

পিরিয়ড পিস রচনার দিকে সুনীল ঝুঁকেছেন সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছে। এই ধরণের বৃহত্তর পরিকল্পনার কারণও তিনি জানিয়েছেন; বলেছেন, "পরের দিকে যে বড়ো বড়ো উপন্যাসগুলো লিখলাম, সেগুলো অনেকটা ইতিহাস নির্ভর। কারণ, জীবনের রসদ ফুরিয়ে যাচ্ছিল। তাই পড়াশুনা করে, বিষয়বস্তু ভেবে লিখলাম।"[২] 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম', এই তিনটি উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিশাল প্রেক্ষাপটকে তিনি গ্রহণ করেছেন, সেখানে এনেছেন উনিশ শতকের নবজাগরণ (১৮৪০-১৮৬০), বাঙালীর জাতীয়তা বোধের জাগরণ (১৮৮৩-১৯০৭), দ্বিখন্ডিত বাঙালীর শিকড় সন্ধানের (পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ) বিরাট ও বিশাল ইতিহাসকে। কিন্তু এই ইতিহাস দেশের অনতি অতীত, সুদূর ইতিহাস নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসবিদ নন, ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তাঁর যতই মনে হোক জীবনের রসদ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, প্রকৃত সত্য কিন্তু তা নয়। বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি গবেষকের দৃষ্টিতে যেমন তুলে এনেছেন ইতিহাসের সত্যকে, তেমনি কল্পনার রঙে খণ্ডিত সত্য গুলিকে দিয়েছেন পূর্ণ সত্যের রূপ। খুঁজতে চেয়েছেন নিজের শিকড়কে, চালিয়েছেন নিজের আত্ম অনুসন্ধান; আর এই আত্ম অনুসন্ধান এগিয়েছে জীবন অনুসন্ধানেরই পথে।

'সেই সময়' 'প্রথম আলো' 'পূর্ব-পশ্চিম' এই তিনটি উপন্যাসের গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট সন্ধান করতে হলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারগুলোর সুলুক সন্ধান করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গুলিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারগুলির সন্ধান করলে তাঁর ভাবনার অলিগলিতে পৌঁছে যাওয়া কিছুটা হলেও সম্ভব। সঙ্গে নিতে হবে তাঁর আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন'। 'অর্ধেক জীবন'এ সুনীল লিখেছেন,

কলেজ পাশ করার পর দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি বেকার ছিলেন, সেই সময়ে, ‘‘ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাগারে আমি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পড়ি, তখন বইটি দুর্লভ ছিল। রামমোহন রায়ের জীবনী, রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী, কেশবচন্দ্র সেনের রচনাবলী পড়তে পড়তে আমি যেন ফিরে যাই ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় দিনগুলিতে, ওই সব মানুষদের দেখতে পাই স্বচক্ষে, একা একা রোমাঞ্চিত হই, সেই নির্জন লাইব্রেরিঘরে শুনতে পাই ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কন্ঠস্বর।’’[৩] প্রথম যৌবনের এই উপলব্ধি তাঁর ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’ রচনার ভিত্তিভূমি।

উপন্যাস সময়ের পটভূমিকায় জীবিত মানুষের গদ্য গাথা। এই তিন উপন্যাসে তিনি বহু ঐতিহাসিক চরিত্রকে উপন্যাসের চরিত্র বানিয়ে তুলেছেন। সময় সন্ধানের পথে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির করেছেন ব্যবচ্ছেদ। আমাদের দেশ মুর্তি পূজা ও ব্যক্তি পূজার দেশ। ফলত ইতিহাসের চরিত্রগুলির মন্ত্রশুদ্ধ বা চরম মন্দ রূপকে চিনতেই পাঠক সমাজ অভ্যস্ত, সুনীল তুলে এনেছেন ইতিহাসে চরিত্রগুলিকে ভালো মন্দে মিশ্রিত সাধারণ মানুষ হিসেবে, দেখিয়েছেন বহু ভুল ঠিকের ভূমি পেরিয়েই তাঁরা খুঁজে পেয়েছিল নিজেদের সত্তার প্রকৃত স্বরূপকে। কিছু কাল্পনিক চরিত্রও বা কিছু আধা ঐতিহাসিক চরিত্রকে তিনি কাল্পনিক করে দিয়েছেন।

‘সেই সময়’ উপন্যাসে নবীনকুমারকে কালীপ্রসন্ন সিংহের আদলে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু কালীপ্রসন্নের জীবন সম্পর্কে এতই কম জানা যায় যে বিদ্যাসাগরের যেমন প্রচুর জীবনী আছে, মাইকেলের যেমন প্রচুর জীবনী আছে কালীপ্রসন্ন-এর তেমন কিছু নেই, আছে একটা ছোট্ট একটা জীবনী। তাতে মেটেরিয়াল কিছুই নেই। খালি কী কী করেছেন – এইটুকুই। ফলে বানিয়ে বানিয়ে তাঁকে একটা মানুষের মতন করেছেন

সুনীল আর সেইজন্যে তিনি নামটাও পালটে দিয়েছেন। কিন্তু যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে লিখেছেন তখন তিনি তথ্য ভিত্তিক থাকার চেষ্টা করেছেন।

এই পিরিয়ড পিসগুলো লেখার ক্ষেত্রে সুনীল হয়ত খুব পরিকল্পিত ভাবে এগোননি, যদি পরপর ভাবতেন তবে 'প্রথম আলো' লিখতেন, কিন্তু 'সেই সময়'এর পর তিনি লিখলেন 'পূর্ব-পশ্চিম'। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে যে সময় সীমাকে তিনি ধরেছেন তা অনেক পরবর্তীকালের। 'স্বাধীনতা পরবর্তী একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বাঙালীর দ্বিখণ্ডিত সত্তা তাঁর কাছে মূল্যহীন সে কারণেই তিনি পাশাপাশি রেখেছেন পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, এবং পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে ছড়িয়ে থাকা বাঙালী জীবনকে।

'প্রথম আলো' রচনার সময় মাথায় রেখেছন উনশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকের শুভ সূচনার সময়কালকে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক চেতনার আগে ধর্মীয়-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার নিয়ে কাজ হচ্ছিল কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা অর্থাৎ দেশটাকে যে স্বাধীন করা দরকার এই চেতনা এসেছে অনেক পরে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই ওই চেতনা আসে। তখন লোকেরা প্রথমবারের মতো সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামে। সারা ভারতবর্ষে সেসময়েই হয়েছিল প্রথম সরকার বিরোধী মিছিল। সুনীল ঠিক করেছিলেন ওই সময়টা নিয়ে লিখবেন। লিখতে গিয়ে ত্রিপুরার রাজবাড়ির প্রসঙ্গও চলে এসেছে এবং আস্তে আস্তে রূপ পালটে গেছে তবে আগে থেকেই সময়টা তিনি ভেবেচিন্তে লিখেছেন।

নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত সমাজ বাঙালীর অনতি ইতিহাস নিয়ে খুব বেশী সচেতন নয়, সুতরাং একটা বিশাল ক্ষেত্র ছিল বাঙালীকে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্যে, সেই ক্ষেত্রে বাঙালীকে প্রবেশ করিয়েছেন সুনীল। অর্থ্যাৎ এই তিন উপন্যাসের গড়ে ওঠার প্রক্ষাপটে রয়েছে সুনীলের সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত ভাবনা। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর

পিরিয়ড পিস রচনার কারণ খুব হাল্‌কাভাবে বলেছেন, "কারণটা কিন্তু খুব মজার এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, মাইকেল আর বিদ্যাসাগরের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হচ্ছে। বিদ্যাসাগর ধার দেওয়া টাকা শোধ চাইছেন মাইকেল কিছুতেই দেবেন না… ঘুম ভেঙে মনে হল, এই মানুষগুলোকে নিয়ে লিখলে কেমন হয়? এঁরাই যদি হন আমার উপন্যাসের চরিত্র আর এঁদের সময়টাই যদি হয় পটভূমি, তা হলে কেমন হবে? সেই শুরু।"[৪] অতলান্তিক আমেরিকা ১৯৮৩ সালে প্রদীপ চৌধুরীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুনীল বলেছেন, "আমার মতে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঠিক সময়কাল হল ১৮৪০ থেকে ১৮৭০। যদিও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন নবজাগরণের সূত্রপাত ১৮২৬। বাংলার রেনেসাঁস-এর অন্যতম প্রতীক হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর ৩০ বছরের জীবনে ভাষা-সাহিত্য এবং সমাজ জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এই ৩০ বছর হল, ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত। এ উপন্যাসে ('সেই সময়') নবীনকুমার হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।... গদ্য লেখককে বেশ কিছু পড়াশোনা করতে হয়। সমাজকে চোখে দেখে যেমন জানা যায়, তেমনি সমাজের পটভূমি বা ইতিহাস জানতে হলে পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে। সমাজকে দেখার চোখ এবং ইতিহাস জানা থাকলে তবে কোনো লেখক তাঁর লেখার মাধ্যমে সে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। তবে যে List আপনারা দেখেছেন তার সবকটা বই যে এ উপন্যাস লেখার সময়েই পড়েছি, তা নয়। অনেক বছর ধরেই ও বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি যে কোনো বিষয়েই পড়াশোনা করতে ভালোবাসি। পড়বার চেষ্টা করি। আবার 'সেই সময়' লেখার সময় তালিকাটির অনেক বই পড়েছি, এমনকী একাধিকবার পড়েছি। আপনি যে লেখককে শ্রমিক বলেছেন, সেটা আমি মানি। লেখকরা সৃজনশীল বুদ্ধিজীবী তো বটেই, তাঁর সাথে তাঁদের যথেষ্ট শ্রম করতে হয়।... ঠিক 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আখ্যা হয়ত দেওয়া যাবে না। তবে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস বলা যেতে পারে।"[৫]

‘কলেজ স্ট্রিট’ ১৯৮৯ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেছেন, “ইতিহাস আমার খুব প্রিয়। সবচেয়ে প্রিয় ভারতের ইতিহাস...। দেখুন কালীপ্রসন্ন সিংহ নামটি কোথাও ব্যবহার করিনি।... আমি বেঙ্গল রেনেসাঁসকে নিয়ে লিখতে চেয়েছি। এমন একজনকে নিতে চেয়েছি যে কোনো দলে ছিল না। তাই কালীপ্রসন্ন চরিত্রকে বেছে নিলাম। কালীপ্রসন্ন এক মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিনিধি। যে ইংরেজি শিখেছে কিন্তু নিজেদের ঐতিহ্য ছাড়েনি। বিদ্যাসাগরকে তিনি সমর্থন করেছেন।”[৬] আসলে সুনীল তাঁর এই তিন উপন্যাসের ভূমিতে ইতিহাসকে পুনঃনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। একটি সুনির্দিষ্ট সময়কালকে ধরে সেই সময়ের ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাসের তথ্যকে জুড়ে বানিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের সত্য। আর্যনীল মুখোপাধ্যায় ও পারমিতা দাস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, ১৯৯৮ ‘পরবার’ পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ এ তিনি বলেছেন, “ ‘প্রথম আলো’ লেখার সময় আমি ইংল্যন্ডে গিয়েছিলাম। সেখানে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি আছে। সেখানে এমন কিছু তথ্য আছে যা দেশে নেই। যেমন ‘কার্জন পেপারস’ ওখানে রয়ে গেছে। তারপর যেমন ধরো ঢাকায় গিয়ে পড়তে হয়। এই পড়ার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে। তবে তথ্য সংগ্রহ করতে করতে একসময় তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, তখন নিজেকেই ঠিক করতে হয়, কোনটা দেব কোনটা দেব না। না হলে লেখার রস নষ্ট হয়ে যায়।”[৭] বহু তথ্য সংগ্রহ করে কল্পনার সাহায্যে এই তথ্যগুলো জুড়ে তিনি এই তিন উপন্যাসের ভূমিতে করেছেন সময়ের পুনঃনির্মাণ। ইতিহাসের তথ্য বিকৃত করার উদ্দেশ্যে এই সময়ের পুনঃনির্মাণ তিনি করেননি, তিনি এই তিন উপন্যাস গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে খুঁজতে চেয়েছেন সময়ের বিবর্তনের স্বরূপকে।

‘অন্যদিন’ পত্রিকায় (বাংলাদেশ, ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত) একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, “‘পূর্ব-পশ্চিম’ এর পরে এই যে এখন আমি লিখছি ‘প্রথম আলো’ বলে একটি উপন্যাস। ধারাবাহিকভাবে ‘দেশ’

পত্রিকাতে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খন্ডটি বই আকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি এখনও আমি লিখছি। এটা বেশ বড়ো। হয়ত 'পূর্ব পশ্চিম' এর থেকেও বড় হবে। এবং এটি একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এবং একই সঙ্গে বলা যায় আমার 'সেই সময়' উপন্যাসের পরবর্তী ইতিহাস। মানে গত শতাব্দী শেষ হচ্ছে এবং এই শতাব্দী শুরু হচ্ছে। এরকম সময়ে বাংলা এবং অবিভক্ত ভারতের অনেক জায়গার রাজনৈতিক উত্থানের কথা এর মধ্যে আছে এবং এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"[৮] ১৯৯৭ সালে 'সানন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছিলেন, "turn of the century-র ইতিহাস সংক্রান্ত যা পাই পড়ি।"[৯] সুবো আচার্য ও সুশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ১৯৯৮ সালে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর ধারণা জানিয়েছেন, "অন্য লোকের তুলনায় ওঁর চেতনা ওঁর বুদ্ধির সূক্ষ্মতা অনেক বেশি ছিল, তবে আধ্যাত্মিক দিকটা টানেনি। ওঁর সমস্ত লেখা পড়ে, ওঁর সম্পর্কিত অন্যদের লেখা পড়ে convincing মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছিল, বললে কেউ হয়ত মারবে, সামান্য বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন। এ ধরণের লোক থাকে মানে যাদের মধ্যে একটু পাগলামি Stick থাকে তাঁরা অনেক সময় বড়ো কবি হন, বড়ো শিল্পী হন। রামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে, আমি ঠিক জানি না... যদি অন্য দিকে যেতেন, তবে খুব বড়ো কবি বা শিল্পী হতে পারতেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার যে রাস্তা উনি বলেছেন, তার মধ্যে একটা মত খুব সুন্দর – 'যত মত তত পথ।' – যেটা অন্য লোকেরা আজকাল কেউ বলে না। কিন্তু কালীকে দেখলাম... প্রেরণা দিচ্ছে, কেউ ছুঁইয়ে দিচ্ছে... বদলে যাচ্ছে, এগুলো চমক ছাড়া কিছু না। বিবেকানন্দকে ভালো লাগে অন্য কারণে। তখনকার দিনে অমন তেজী, দীপ্ত মানুষের খুবই প্রয়োজন ছিল। খুব আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। মানে সেইসব মানুষদের আমার ভালো লাগে যারা অন্যদের মতো নয়। তবে একটা অভিযোগ আছে, যেটা করতে পারতেন, না করে অন্যদিকে ঘুরে গেছেন। এই 'যত মত তত পথ'-টা আরও বেশি

ছড়াতে পারতেন এবং হিন্দু ধর্মকে অনেকটাই সংস্কার করতে পারতেন। এই জাতপাত ভেদের কথা 'দরিদ্র, মুচি, চন্ডাল আমার ভাই...' কিন্তু এর সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এই মতটাকে আরও ছড়াতে পারতেন, তাঁর শক্তির ব্যবহার করতেন তবে জাতিভেদ এতটা হত না। দেশের আরও উপকার হত। বেলুড়মঠ স্থাপন করে সেখানে কিছু ছেলেকে বেদ পড়ানোর জন্য অনেক লোক ছিল। শেষ জীবনে দু তিন বছর কেন জানি না নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কী বলব, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন।"[১০] এই ভাবনারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হয়েছে 'প্রথম আলো' উপন্যাসে। এই সাক্ষাৎকারেই সুনীল আরও জানিয়েছেন, "একটা বেঙ্গল রেনেসাঁ হয়েছিল, সত্যি কি হয়েছিল বা হলে তার কতটা impact পড়েছিল – এটা জানা দরকার। তা লেখার সময় অবশ্য ভাবলাম যে শুধু ওদের নিয়ে গল্প লিখলে হবে না, একটা প্রশ্নও তুলতে হবে। তা আমি একটা time frame ঠিক করলাম যে ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ ওই সময় আমাদের অনেকগুলো আন্দোলন হয় আর এরাই ছিলেন প্রধান পুরুষ। এদের কৃতিত্ব কতখানি বা ব্যর্থতা কতখানি, এটা লেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য মানে সময়টাকে তুলে ধরাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সেইজন্য আমি 'সেই সময়' নাম দিয়েছি।... আর যদি নায়ক কাউকে বলতে হয় তো সময়, সময় হচ্ছে নায়ক। তা ওটা লেখার পর আমি কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় লিখিনি। আমি তারপর 'পূর্ব-পশ্চিম' লিখলাম, সেটা অনেক পরের ঘটনা। স্বাধীনতার আগেরকার পরেরকার ঘটনা। দেশভাগটাই হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। দেশভাগের যে যন্ত্রণা, দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ পরিবার যে দুর্যোগের মধ্যে পড়েছিল – আমার ব্যক্তিগত জীবনে সেরকম ঘটনা ঘটেছে, আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও দেখেছি। তার সঙ্গে বাংলাদেশের যুদ্ধ বাংলা ভাষার দাবিতে যে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এসব তো বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা।... কিছুদিন বাদে আবার মনে হল সেটাও বলতে পারো যেটা ইংরেজিতে বলে যাকে vicarious pleasure, পাবার জন্য আনন্দ – যে 'প্রথম আলো' লিখি। 'প্রথম আলো' লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে – ১৯০৫

সালে একবার বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। তা ১৯৪৭ সালে যে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল সেই বঙ্গ আবার জোড়া লাগবে কিনা আমরা জানি না। অদূর ভবিষ্যতে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' আবার জোড়া লেগেছিল। তা আমি বাঙালীদের খালি এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই যে একসময় কিন্তু এই ভাঙাবঙ্গ আবার জোড়া লেগেছিল।"[১১]

জহরলাল নেহেরু তাঁর, 'The discovery of India' গ্রন্থে লিখেছেন, "No people, no races remain unchanged. Continually they are mixing with others and slowly changing; they may appear to die almost and then raise again as a new people or just a variation of the old. There may be a definite break between the old people and the new, or vital links of the thought and ideas may join them."[১২] এই ভাবনার প্রকাশই রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই তিন উপন্যাসের সময় সন্ধানের প্রেক্ষাপটে। বাঙালীর বহমান জীবনের পরিবর্তনশীলতার পথে যে উদ্বর্তন, তার প্রেক্ষাপট সন্ধান করতেই এই ত্রয়ী উপন্যাসকে গড়ে তোলার কথা তিনি ভেবেছেন। আসলে, "ইতিহাস হল একটা নির্দিষ্ট সময়ের দলিল, সময় হলো কতগুলো ঘটনার পরম্পরা, যা একদিনে নির্মিত হয় না।"[১৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাস চেতনা, সময় চেতনা সর্বোপরি তাঁর মন ও মননে গড়ে ওঠা সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের যে রূপকল্প তথা Hypothesis তাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন এই তিনটি উপন্যাসের ভূমিতে। সুনীলের মননশীলতা, চিন্তাশীলতা ও বহুপাঠ এই তিন উপন্যাসের গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছে।

পরবর্তী তিনটে অধ্যায়ে তিনটি উপন্যাস 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম'-কে পৃথকভাবে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালী

সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান করে তার স্বরূপ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১। পৃ ১৭, মল্লিকার সঙ্গে একান্তে ৫৯ মিনিট, আরম্ভ, নভেম্বর ২০১২, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৮, সম্পাদক লালন বাহার

২। পৃ ১৭, মল্লিকার সঙ্গে একান্তে ৫৯ মিনিট, আরম্ভ, নভেম্বর ২০১২, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৮, সম্পাদক লালন বাহার

৩। পৃ ১৭০, অর্ধেক জীবন, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৪। পৃ ৭৫, অপর্ণার আড্ডায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পরমা, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, নভেম্বর ২০১২, সম্পাদক অপর্ণা সেন

৫। পৃ ২২, কথা বলেছেন প্রদীপ চৌধুরী, অতলান্তিক আমেরিকা ১৯৮৩, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৬। পৃ ২৮, কথা বলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'কলেজ স্ট্রিট' ১৯৮৯, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৭। পৃ ৪৫, কথা বলেছেন আর্যনীল মুখোপাধ্যায় ও পারমিতা দাস 'পরবাস' ইন্টারনেট সংস্করণ, ১৯৯৮, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৮। পৃ ৮৩, অন্যদিন বাংলাদেশ ১৯৯৬, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৯। পৃ ৮৯, কথা বলেছেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য 'সানন্দা' ১৯৯৭, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

১০। পৃ ১০৯, কথা বলেছেন সুবো আচার্য ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়, কবিতাযাপন ১৯৯৮, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

১১। পৃ ১৫০, কথা বলেছেন সুবো আচার্য ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়, কবিতাযাপন ১৯৯৮, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

১২। Page 47, The Discovery of India, Jawaharlal Neheru, Published in Penguin Books 2004

১৩। ভূমিকা অংশ, আওয়ামী লীগঃ যুদ্ধ দিনের কথা ১৯৭১, মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪১৪, প্রথমা প্রকাশন

তৃতীয় অধ্যায়

‘সেই সময়’: উনিশ শতকে বাঙালীর আত্মদর্শন আত্মপ্রতিষ্ঠার সময় সন্ধান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’ উপন্যাসটি উনিশ শতকের চালচিত্রে জীবিত মানুষের গদ্যগাথা। ‘সেই সময়’ উপন্যাসের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল উপন্যাসটির দ্বিতীয় খন্ড। উপন্যাসটি ১৯৮৩ সালে ‘বঙ্কিম পুরস্কার’ এবং ১৯৮৫ সালে ‘আকাদেমি পুরস্কার’-এ সম্মানিত হয়েছে। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন এমন একটি বিশেষ সময়কে যখন বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে মধ্যযুগের নির্মোক ত্যাগ করে পৌঁছেছিল আধুনিকতার পথে। ‘লেখকের কথা’ অংশে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন, “আমার কাহিনীর পটভূমিকা ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ। এবং এই কাহিনীর মূল নায়কের নাম সময়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, ‘১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ সবদিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল’। তিনি যাকে ‘নবযুগ’ বলেছেন পরে তারই নাম হয় ‘বেঙ্গল রেনেসাঁস’ এবং সে বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। গত শতাব্দীর এই রেনেসাঁসের ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য। অনেক দিন ধরেই শাস্ত্রী মহাশয়ের এই বক্তব্য সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা আছে। তিনি যে বিংশতি বর্ষের কথা বলেছেন, আমার ধারণা গত শতাব্দীর মূল ঘটনা কেন্দ্রটি তার কিছু পরে। তাছাড়া নবযুগ বা নবজাগরণ সত্যিই কি সারাদেশে এসেছিল, না তা শুধু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল

এবং তা নিয়ে ঢক্কানিনাদ হয়েছে, এই প্রশ্ন আমি নানা কাহিনী সূত্রে উত্থাপন করেছি বার বার।”[১]

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক গবেষকের দৃষ্টিতে সন্ধান করেছেন উনিশ শতকের নবজাগরণের ধারণাকে। বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের যুগবিভাগ করতে গিয়ে সুধী সমাজ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মধ্যযুগের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং ১৮০০ সাল থেকে তাঁরা ধরেন আধুনিক যুগের সূচনাকাল। ১৭৫৭ র পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার কয়েক দশকের মধ্যেই আধুনিক যুগের সূচনা হওয়া নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা নয়। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই এদেশে বাণিজ্য দখল করতে এসেছিল বিদেশী বণিক জাতি, তাদের সঙ্গে এসেছিল পাশ্চাত্য নবজাগরণের ঢেউ, শিল্প বিপ্লবের প্রবাহ, স্বাধীন চেতনা, বিজ্ঞান চেতনার জগৎ। উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবাহে বাঙালীর স্থবির জীবনে এসেছিল নতুন গতি। বাঙালীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবন এমন কি বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও তার চিরায়ত প্রবাহ ত্যাগ করে নিয়েছিল নতুন বাঁক, অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়কে ভেঙে আত্মপ্রকাশ করেছিল নবযুগের প্রথম আলোকময় প্রভাত।

উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ জীবনে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল পরস্পর বিপরীত দুটি স্রোতধারা। একদিকে বেশ্যাবিলাস, মদ্যাসক্তি, বাল্যবিবাহ, নারীর বৈধব্য যাতনা, বাবু কালচারের পুরোনো প্রথা সংস্কার যেমন ছিল সমাজে বহমান, সঙ্গে এসেছিল নতুন স্রোতধারা। পাশ্চাত্য চেতনার আলোকে ঘুমন্ত ভারতবাসী জেগে উঠেছিল নতুন প্রভাতে। সকালের ঘুমলাগা চোখে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করার আবেগে ভেসে গিয়েছিল তৎকালীন নব্যশিক্ষিত যুবসমাজ, তাদের কাছে ইংরেজ আগমন ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। ইংরেজ আগমনে এদেশে এসেছিল বহুকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও শৃঙ্খলার শাসন, আপাত ন্যায়ের শাসন। তাই উনিশ

শতকের প্রথম ভাগেই এদেশের নব্যশিক্ষিত যুবসমাজ চায়নি ইংরেজ শাসনের অবসান। সভ্য জাতির আলোকে তারা আলোকিত করে তুলতে চেয়েছিল নিজের দেশ ও জাতিকে। ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত যে সময়টিকে তিনি ব্যবহার করেছেন, ‘সেই সময়’ বাঙালীর সামগ্রিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।

‘সেই সময়’ উপন্যাসটি তৎকালীন ঘটমান জীবনের প্রবহমান চিত্র। ঐতিহাসিক সময়কে খোঁজেন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে। কিন্তু ঔপন্যাসিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রবাহকে বিচার করেন কোন বিশেষ জাতির মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে। ‘সেই সময়’-এর মূল উপজীব্য তৎকালীন সময়ের সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সময়কে জীবন্ত করতে গিয়ে পাশাপাশি নিয়ে চলেছেন কিছু কাল্পনিক চরিত্রকে। ইতিহাসের চরিত্রগুলির জীবনের খুঁটিনাটি তথ্যকে বহু গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করে শৈল্পিক নৈপুণ্যে তাঁদের রক্তমাংসের দেহদান করেছেন। কাল্পনিক বৃত্তের মধ্যেও তিনি যুগজীবন, যুগমানসকে নিয়ে এসেছেন ঐতিহাসিক বাস্তবতায়, চিত্রিত করেছেন শৈল্পিক নিপুণতায়। চরিত্রগুলিকে তিনি এগিয়েছেন সেই সময়ের সমাজ সংস্কারকে মাথায় রেখে। সমাজের সার্বিক প্রবাহের বিশাল পটপরিবর্তনের ধারাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। উনিশ শতকের (১৮০০ থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম দশক থেকেই এই যে পরিবর্তনের প্রবাহ শুরু হইয়েছিল, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সেই পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করেছিল; বাংলা ভাষা, সাহিত্য, বাঙালী মানস পৌঁছেছিল সাবালকত্বের আঙিনায়। উপন্যাসে গৃহীত সময় সেই দীর্ঘ তিন চার দশকের প্রস্তুতির পর বাঙালীর সার্বিক ভাবে জেগে ওঠার সময়, মধ্যযুগীয় পরিমন্ডলে সুপ্ত

বাঙালীর আত্মসচেতন হওয়ার সময়, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে উত্তরণের সময়।

'সেই সময়' উপন্যাসের মূল কাহিনীবৃত্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় নবীন কুমারের জন্মের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির সূচনা ও তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই সুদীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি। নবীনকুমারের জীবনের ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক সময়কে অর্থাৎ বাঙালীর নবজাগরণকে ধরার এক বিশাল প্রয়াস করেছেন। এই প্রয়াসের পথেই নবীনকুমার আখ্যানের পাশাপাশি এসেছে আরও বহু বৃত্ত। উপন্যাসে অন্যান্য ঘটনা বা চরিত্রকে এনেছেন স্বনামে তাদের ব্যক্তি পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করে, কিন্তু নবীনকুমারের চরিত্রে একটি ঐতিহাসিক সূত্র থাকলেও তার ক্রমবিবর্তন ঔপন্যাসিকের পরিকল্পিত, 'লেখকের কথা' অংশে তিনি জানিয়েছেন, "সময়কে রক্তমাংসে জীবন্ত করতে হলে অন্তত একটি প্রতীক চরিত্র গ্রহণ করতে হয়, নবীনকুমার সেই সময়ের প্রতীক। তার জন্মকাহিনী থেকে তাঁর জীবনের নানা ঘটনার বৈপরীত্য, শেষদিকে এক অচেনা যুবতীর মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন এবং অদ্ভুত ধরনের মৃত্যু সবই এই প্রতীকের ধারাবাহিকতা, আশা করি আর বিশদভাবে এখানে বলার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনীয় কথা শুধু এই যে নবীনকুমার চরিত্রে এক অকালমৃত ঐতিহাসিক যুবকের কিছুটা আদল আছে। অন্য কোনও প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম আমি বদল করিনি, কিন্তু যাঁকে অবলম্বন করে নবীনকুমারকে আঁকা হয়েছে তাঁর কয়েকটি কীর্তি চিহ্ন ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। এতদিন পরে আর জানবার উপায়ও নেই। সুতরাং দুই চরিত্রের মধ্যে সাজুয্য না খুঁজে নবীনকুমারকে সেই সময়ের প্রতীক হিসাবে গণ্য করাই সঙ্গত হবে। নবীনকুমার চরিত্রে আমি স্বকল্পিত বহু উপাদান সংযোজন করেছি...।"[২] নবীনকুমার প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক এক অকাল মৃত ঐতিহাসিক যুবকের প্রসঙ্গ এনেছেন, কিন্তু কোনো নাম তিনি উল্লেখ করেননি, কিন্তু পাঠক যখন লক্ষ্য করেন

নবীনকুমার ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’র প্রতিষ্ঠাতা, মহাভারত অনুবাদক, কথ্য ভাষায় নকশা লেখক, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিত্রের ঐতিহাসিক সূত্র যে এই চরিত্রে আছে তা সহজবোধ্য হয়ে যায়। তাছাড়াও যখন দেখি কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনকালকেই উপন্যাসের সময় হিসাবে ব্যবহার করেছেন তখন নবীনকুমারের ঐতিহাসিক সূত্রকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। তিনি নিজেও পরবর্তী সময়ে নবীনকুমার যে কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই কথা জানিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। বলেছেন, “বাংলার রেনেশাঁস-এর অন্যতম প্রতীক চরিত্র হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর ৩০ বছরের জীবনে ভাষা-সাহিত্যে এবং সমাজ জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এই ৩০ বছর হল ১৮৪০-৭০ পর্যন্ত। এ উপন্যাসের নবীনকুমার হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।”[৩]

কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবন মাত্র ত্রিশ বছরের, ১৮৪০ সালের প্রারম্ভে জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম, মাত্র ছয় বছর বয়েসে তিনি পিতৃহীন হন। প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৎচরিত্র ও শিক্ষানুরাগের সুনাম ছিল, বালক কালীপ্রসন্ন পিতৃহীন হলে এই হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁর অভিভাবকত্ব পান। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৭ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তা ছাড়াও তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে পৃথক ভাবে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ মাত্র তেরো বছর বয়সে। ১৮৫৪ সালে বিবাহ হয় ও কয়েক বছর পর প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হলে চন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শরৎকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। ১৮৫৫ সালে তিনি ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’ র সম্পাদক হন, ১৮৫৬ সালে ‘বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ’ -এর সূচনা হয় ‘বিক্রমোবর্শী’ নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এই বছরেই প্রকাশিত হয় ‘সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’ মাসিক পত্র, ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকাও কিছুকালের জন্য তিনি সম্পাদনা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ শিক্ষাপ্রসারে, সাহিত্যচর্চায়, পত্রিকা প্রকাশে, দুর্ভিক্ষ নিবারণে,

জনকল্যাণে, বিধবা-বিবাহকারীকে নগদ পুরস্কার প্রদানে ছিলেন অকৃপণ, লঙ সাহেব 'নীলদর্পণ' অনুবাদের অপরাধে শাস্তি পেলে জরিমানার টাকাও শোধ করেছিলেন তিনি। ১৮৬৩ সালে তিনি লাভ করেন 'অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট' ও 'জাস্টিস অব পিস' পদ। ১৮৫৮-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পন্ডিতদের সাহায্যে মহাভারত অনুবাদ করেন ও বিনামূল্যে তা বিতরণ করেন। 'বাবু নাটক' (১৮৫৪), 'বিক্রমোবর্শী নাটক' (১৮৫৫), 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬৬) ইত্যাদি তাঁর অমর সৃষ্টি। 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'র অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি ঋণগ্রস্থ হয়ে অনেক সম্পত্তি হারান। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সেই সময়' উপন্যাসে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনীসূত্র প্রায় পুরোটাই গ্রহণ করেছেন, ইতিহাসের সামান্য তথ্যের উপর কল্পনার জাল বুনে উপন্যাসের নবীনকুমার চরিত্রটিকে তিনি রক্তমাংসের রূপ দিয়েছেন। নবীনকুমার চরিত্রে তিনি দেখিয়েছেন সমকালীন নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের টানাপোড়েন ও স্ববিরোধের বাস্তব সত্যকে। নবীনকুমারের আত্ম অনুসন্ধানের পথেই তিনি করেছেন সময়ের সন্ধান, দেখিয়েছেন বাঙালী সমাজের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে। সেই সময়ের সমাজ-মানস নিত্যনতুন পথে পুরোনো নতুনের সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়েছে, নিজেকে খুঁজেছে, খুঁজেছে নিজের সার্বিক পরিচয়। নবীনকুমারও প্রতিনিয়ত লড়েছে নিজের সঙ্গে, নিজেকে চিনতে চেয়েছে, নিত্য নতুন পথে খুঁজেছে নিজের সত্তার প্রকৃত স্বরূপকে। নবীনকুমারের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে বাঙালী সমাজ, বাঙালী মানস এবং বাঙালী জীবনও এই আত্ম অনুসন্ধানের পথেই হয়েছে বিবর্তিত। নবীনকুমারে একদিকে পুরোনো বংশগত ঐতিহ্যের মদ্যাসক্তি, বারবধূ বিলাস, নতুন আগত ইংরেজ সমাজ, সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আসক্তি ও অন্ধ অনুকরণ; অন্যদিকে এর থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও নিজ

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা; বিদেশের গুণগত দিকগুলি গ্রহণ করে সুস্থ উন্নত নতুন বাঙালী জাতি গড়ে ওঠার যে নতুন আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল, ঔপন্যাসিক সেই বিশ্বাস, সেই আলোকেই জেগে উঠতে দেখেছেন বাঙালী জাতির মধ্যে, উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে এবং সর্বোপরি নবীনকুমারের মধ্যে। উপন্যাসের শেষে এই আলো, নবীনকুমারের "কত আলোকোজ্জ্বল, কত আনন্দময়, অনাগত যুগ"[৪] দেখার স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়েছে কিশোর প্রাণগোপালের মধ্যে।

উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সন্ধান করেছেন বাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে। খুঁজেছেন সেই শিকড়কে যে শিকড় আজও রসদ জুগিয়ে চলেছে বাঙালী সমাজের প্রবহমানতাকে। বাঙালী সমাজের বিবর্তন, উদ্বর্তনের রূপরেখাকে খুঁজতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের তথ্যকে বানিয়ে তুলেছেন সাহিত্যের সত্য। উনিশ শতক -কে বহপাঠ ও প্রবল অধ্যাবসায়ের গুণে নিজের মন ও মননে সার্বিক ভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছেন বলেই উপন্যাসের প্রথম পর্ব থেকেই তিনি পাঠককে প্রবেশ করিয়েছেন 'সেই সময়'এর ভূমিতে। তুলে এনেছেন সেই সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সার্বিক রূপরেখাকে। এনেছেন নব্যবঙ্গের তিন দীক্ষাগুরু রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ও ডেভিড হেয়ার প্রবর্তিত নবচেতনার জোয়ারকে; দেখিয়েছেন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ডেভিড হেয়ার ও নারী শিক্ষায় বীটন সাহেবের ভূমিকাকে; 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭) ও 'সংস্কৃত কলেজ' (১৮২৪) এর ইতিহাসকে; দেখিয়েছেন ইয়ংবেঙ্গল দলের রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার প্রমুখদের প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনাকে; এনেছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর সফলতার ইতিবৃত্ত, ব্রাহ্মসমাজ থেকে ব্রাহ্মধর্মের উত্তরণ এবং দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের ভূমিকাকে; এনেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে নিয়ে; এনেছেন সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ,

মহারাণীর ভারতগ্রহণ পর্বকে; এনেছেন মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে; হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়কে। ঔপন্যাসিক সেই সমস্ত ঐতিহাসিক সত্যকে এনেছেন, যে ঘটনাগুলি মধ্যযুগের প্রথা সংস্কার বিশ্বাসকে ঘুচিয়ে, বাঙালীকে জাগিয়ে তুলেছিল, আত্মসচেতন করেছিল, মধ্যযুগীয় নির্মোক কাটিয়ে বাঙালীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়েছিল সেই সমগ্র সত্যকেই তুলে এনেছেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রথম স্পর্শে বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সার্বিক ভাবে গ্রহণ করার আবেগে মেতেছিল, অন্ধ অনুকরণের নেশায় ভেঙে ফেলেছিল আমাদের সমস্ত ভালোকে, সমস্ত সুন্দরকে। মদ্যপান, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের প্রবণতা, ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রবল আসক্তিতে তারা ভেঙে ফেলেছিল আমাদের সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহকে। কিন্তু শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে বাঙালীও উনিশ শতকের প্রথম কটি দশক পেরিয়ে চিনতে পেরেছিল নিজ সংস্কৃতির স্বরূপকে। খুঁজে পেয়েছিল সেই সত্যকে যে সত্যের ওপর ভর করে বাঙালীর নিজ সত্তার সার্বিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল।

উপন্যাসে সময়কে ধরতে গিয়ে ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে যেমন রেখেছেন তেমনি বহু কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়েছেন কাল্পনিক বৃত্ত। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ধনী বাবু রামকমল সিংহ মহানদীর বুকে বজরায় পরিভ্রমণে রত রক্ষিতা কমলাসুন্দরীকে নিয়ে। এই সিংহ পরিবারের সূত্রেই উপন্যাসে এসেছে বহু চরিত্র ও ঘটনাবৃত্ত। ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক দুই কাহিনীবৃত্তই যুক্ত হয়েছে এই সিংহ পরিবারের সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রে। উপন্যাসে সময় এসেছে ঘটনার প্রধান চরিত্র হিসাবে। ঔপন্যাসিক তুলে ধরতে চেয়েছেন কালের প্রবহমানতার চিত্রকে, যে প্রবহমানতা বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নিয়ে গিয়েছিল নতুনতর পথের দিশায়।

উপন্যাসে নবীনকুমারের জন্ম মুহূর্তে বাবু রামকমল সিংহ ওড়িষ্যার মহাল পরিদর্শনে গেছেন কমলাসুন্দরীকে নিয়ে। সন্তানসম্ভবা বিম্ববতীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দ্রুত কলকাতায় ফিরে তিনি পেয়েছেন পুত্র নবীনকুমারের জন্ম সংবাদ। নবীনকুমারকে ঔপন্যাসিক শৈশব থেকেই গড়ে তুলেছেন অত্যন্ত মেধাবী এবং সম্ভাবনাময় করে। নবীনকুমারের মেধাকে প্রকাশ করতে তিনি বলেছেন, "শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের সাপ্তাহিক পত্রিকা সমাচার দর্পণে ছাপাও হয়েছিল এই শিশুর খবর। যুগল সেতু নিবাসী বাবু রামকলম সিংহের বহু সুকৃতির ফলে পরিপক্ক বয়েসে এক পুত্র সন্তান লাভ হইয়াছে।... বালকের বয়ঃক্রম এক বৎসর দুই মাস মাত্র।"[৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মার্শম্যান সাহেবের 'সমাচার দর্পণ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সালের ২৩শে মে থেকে। প্রথমে এটি শনিবার করে প্রকাশিত হত, পরে ১৮৩২ থেকে এটি সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৪ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত এটি সাপ্তাহিক আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ১৮৪২ -এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৪৩ -এর জানুয়ারি অবধি প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় পত্রিকাটি প্রকাশ করেন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা মে শনিবার। নবপর্যায় 'সমাচার দর্পন' দেড় বছর চলে চিরতরে লুপ্ত হয়। নবীনকুমারের এক বছর দুই মাসে তার কীর্তি প্রকাশিত হয়েছে 'সমাচার দর্পণ' এ, অর্থাৎ ১৮৪১ সালের কোন একটি সংখ্যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

উপন্যাসে বাবু রামকমল সিংহের সাতচল্লিশ বছর বয়সের সন্তান নবীন কুমার। দীর্ঘ যৌবনে তিনি বহু নারীসঙ্গ করলেও কোন নারীই তাকে উপহার দিতে পারেনি একটিও সন্তান। রামকমল সিংহের মনে একটা সচেতনতা ছিল যে তিনি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। নিজ বংশের একটি অনাথ বালককে তিনি গ্রহণ করেছিলেন দত্তক পুত্র হিসাবে। দত্তক পুত্র গঙ্গানারায়ণকে কেন্দ্র করেই তিনি উজাড় করেছিলেন তার পিতৃস্নেহ।

যৌবনের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে স্ত্রী বিম্ববতীর সন্তান সম্ভাবনাকেও তিনি ভালো ভাবে নিতে পারেননি। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করতে অপারগ হয়েই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন নবীনকুমারকে নিজ সন্তান বলে, কিন্তু অবিশ্বাসের দোলাচল থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। মৃত্যু শয্যায় তিনি বন্ধু বিধুশেখরের কাছে জানতে চেয়েছেন নবীনের পিতৃপরিচয়, বিধুশেখরের আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। মৃত্যুর মুহূর্তে বিম্ববতীকে অবহেলা করার জন্য তিনি অপরাধবোধেও ভুগেছেন। যদিও নবীনকুমার বিধুশেখরের ঔরস জাত সন্তান। উপন্যাসে সন্তান কামনায় বিম্ববতী বিধুশেখরের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন। ব্রাহ্মণ বিধুশেখর প্রতিষ্ঠিত উকিল, পরিবার ও সম্পত্তি থেকে উদাসীন রামকমল সিংহের পরিবারের সমস্ত দায় তার হাতে। বিচক্ষণ পুরুষ বিধুশেখর একদিকে যেমন নিজের ওকালতি ব্যবসাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি বন্ধু রামকমল সিংহের বিপুল সম্পত্তিও রক্ষা হয়েছে তারই বিচক্ষণতায়।

নবীনকুমারের এই জন্মবৃত্তান্ত সংযোজন উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। নবীনকুমার এই বৃত্তান্ত জানতে পারেনি, এবং এই কারণে তার কোন রকম হৃদয় চাঞ্চল্যও ঘটেনি। ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মবৃত্তান্তকে কালিমালিপ্ত করতে এই আখ্যানকে উপন্যাসে যুক্ত করেননি। আসলে উনিশ শতকের বাঙালী নানারকম সামাজিক আচার সংস্কারের বন্ধনে ছিল সম্পূর্ণ বদ্ধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জাঁতাকল সমাজকে বেঁধেছিল কঠিন বন্ধনে। কিন্তু সমাজের এই নীতির জালেও ছিল প্রচুর ছিদ্রপথ, যে পথে অপুত্রক নারী পর পুরুষের সংসর্গে সন্তান লাভে সক্ষম হয়েছে। ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন বাঙালী সমাজের এই সমস্ত পরস্পর বিরোধিতা কে, যে সমাজের চরম বিধিনিষেধের ভয়ে বিধুশেখর তার বালবিধবা কন্যা বিন্দুবাসিনীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেন, গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতার কারণে তাকে কাশীতে একা ফেলে

চলে আসেন, রামকমল সিংহের সমস্ত সম্পত্তি থেকে তিনি গঙ্গানারায়ণকে বঞ্চিত পর্যন্ত করেন, বন্ধুপত্নীর সঙ্গে ব্যভিচারে তাঁর কোন পাপবোধ জাগে না। নিজের ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়ে তিনি নিজেকে ও বিম্ববতীকে প্রবোধ দেন, ব্রাহ্মণ নিয়োগে কায়স্থের সন্তান উৎপাদন শাস্ত্র ও লোকাচার সম্মত। ঔপন্যাসিক তুলে আনতে চেয়েছেন সেই সময়ের প্রথা, সংস্কারগুলির অন্তঃসার শূন্যতাকে।

'সেই সময়' প্রথম পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে গঙ্গানারায়ণ। উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজ ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠান এদেশের তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। ১৮২৮ সালে এই কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ডিরোজিও। তিনি যুবকদের মধ্যে প্রবাহিত করলেন নতুন উদ্দীপনা, বাঙালী যুবসমাজে সঞ্চার করলেন নবচেতনার জোয়ার। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, "ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দু কলেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যে তিনি ছাত্রদের মধ্যে এমন কিছু রোপন করে দিলেন যাহা তাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল।"[৬] ডিরোজিওকে কেন্দ্র করেই হিন্দু কলেজের কেরানী উৎপাদনের যন্ত্র কিছু দিনের জন্য মানুষ উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। তিনিই প্রথম শিক্ষক যিনি বাঙালী ছাত্রদের মনের কপাট গুলোকে খুলে, তাদের আত্মসচেতন করেছিলেন। উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণকে কেন্দ্র করেও ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে। গঙ্গানারায়ণ যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন ১৮৪০-৪১ সাল; ডিরোজিও কলেজ ত্যাগ করেছেন ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে। হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আমরণ হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জানতেন হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে খ্রীস্টধর্মের প্রচার হিন্দু কলেজের উন্নতির পথকে রুদ্ধ করতে পারে, কঠোর হাতে তিনি খ্রিস্টান প্রভাব থেকে দূরে রেখেছিলেন

হিন্দু কলেজকে। উপন্যাসে এই ঘটনার সূত্র আছে, “গঙ্গানারায়ণের সহপাঠী বঙ্কু দত্তকে... চাবুক মেরেছিলেন হেয়ার সাহেব।... সে মীর্জাপুর মিশনে সেন্ডিস সাহেবের কাছে বাইবেল শোনার জন্য যাতায়াত শুরু করেছিল।... মেরে বঙ্কুর পিঠে রক্ত বার করে দেওয়ার পর হেয়ার সাহেব নিজেই কাঁদতে শুরু করেছিলেন,... ডিরোজিও সাহেব বরখাস্ত হওয়ার পর থেকে হেয়ার সাহেব সাবধান হয়ে গেছেন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে খ্রীস্টানি প্রভাব ছড়াতে দেখলেই অভিভাবকরা ক্ষেপে উঠবেন আবার। ইতিমধ্যেই কিছু ভালো পরিবারের ছেলে গৌর আঢ্যির ইস্কুল ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হচ্ছে।”[৭]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে।

উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে ১৮৪০-৪১ -এর পরবর্তী হিন্দু কলেজ। মধুসূদন দত্ত ১৮৩৭ থেকে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাঁর সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র, গৌরদাস বসাক প্রমুখরাও উপন্যাসে এসেছেন গঙ্গানারায়ণের সহপাঠী হিসাবে। ১৮৪১ সালে মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। উপন্যাসে মধুকে যেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে মধু মদ্যাসক্ত, গণিত শিক্ষার প্রতি বিরাগ ভাবাপন্ন হতে শুরু করেছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত’ গ্রন্থে বলেছেন, “কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রও তত পাঠ করেন কিনা সন্দেহ।... সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি গণিত চর্চায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।”[৮] উপন্যাসে মধুকে প্রথম দর্শনেই দেখা গেছে মদ্যপ এবং রিজ সাহেবের গণিত ক্লাসে যেতে অনিচ্ছুক হিসাবে। এই সময়ে হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সাহেব। মধুসূদনের জীবনে রিচার্ডসন সাহেবের প্রভাব ছিল অসীম। যোগীন্দ্রনাথ বসু এই বিশিষ্ট

শিক্ষাবিদ সম্বন্ধে লিখেছেন, “১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য্য করিবার সময় হইতে তিনি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।... তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদ ও অর্থগ্রহণ করিতে তাহার ন্যায় সুনিপুণ অধ্যাপক এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। সে সময়কার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য তিনি ‘ব্রিটেনীয় কবিগণের সারসংগ্রহ’ ‘Selections from the British Poets’ নামক যে পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাহার গুণগ্রাহিতার ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।... তাঁহার অধ্যাপনা প্রণালীও অতি চমৎকার ছিল।... ডিরোজিও ছাত্রদিগের বিচার শক্তির উন্নতি সাধনেরই অধিক চেষ্টা করিতেন, আর রিচার্ডসন ছাত্রদিগের ভাবগ্রাহিতা ও রসজ্ঞতার পরিবর্ধনের জন্য অধিক প্রয়াস পেতেন।”[৯]

এই রিচার্ডসন সাহেবের ব্যক্তি জীবন তাঁর শিক্ষক জীবনের মত নির্মল ছিল না, নারী ও মদ্যপানে তাঁর প্রবল আসক্তি ছিল। মধুসূদন বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে অপরিসীম প্রশ্রয়ের অধিকারী ছিলেন, দুহাতে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ ও অপরিমিত মদ্যপানে প্রশ্রয় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে অনিশ্চিতের পথে এগিয়ে ছিল। মধুসূদন রিচার্ডসন সাহেবের মতো লেখক হওয়ার বাসনায় তাঁর গুণগুলির সঙ্গে তাঁর দোষগুলিও আয়ত্ব করেছিলেন। উপন্যাসেও মধুকে গৌর দিনের বেলা মদ্যপান নিষেধ করলে সে জানিয়েছে, “বেশ করিচি। কেন খাবো না? রিচার্ডসন মদ খান না? তিনি মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করেন না? সেইজন্যই তো তিনি পোয়েট্রি এত ভালোবাসতে পারেন। সেই জন্যই তার কাছে পৃথিবী এত সুন্দর।... গৌর, কবিতা ছাড়া আমার আর কিছুই ভালো লাগেনা।... বায়রণ, বায়রণের সমান, তোরা তখন আমার জীবনী লিখবি”[১০] সময়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন সেই সময়কে যেখানে নব্য শিক্ষিত যুবক সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছে নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে।

মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রথম যৌবনে সভ্য ইংরেজ জাতির সমকক্ষ হতে নিজের বাবা মায়ের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেননি। হিন্দু সমাজের নিয়ম অনুযায়ী একটি অশিক্ষিত বালিকাকে বিবাহ করতেও রাজী হননি। মহান কবি পোপের বাণী উদ্ধৃত করে বন্ধুদের জানিয়েছেন, "টু ফলো পোয়েট্রি, ওয়ান মাস্ট লিভ বোথ ফাদার অ্যান্ড মাদার।"[১১] গঙ্গানারায়ণ মদ ছুঁতে, গরুর মাংস খেতে অস্বীকার করায় মধু বলেছেন, "এই জন্যই তোদের কিচ্ছু হবে না! তোদের হিন্দু ধর্মের ওপর এই জন্য আমার ঘেন্না ধরে যায়। বিফ অ্যান্ড ওয়াইন স্ট্রং পিপলদের সব সময় দরকার। দ্যাক ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, যবন সবাই গোমাংস খায়, সবাই ড্রিঙ্ক করে... এই জন্যই দে আর মাইটি, দে আর কঙ্করার্স, ওরা ভালো কবিতাও লেখে! শুধু হিন্দুরাই মিনমিনে, নিরামিষ খায় আর নেড়ামুণ্ডি হয়ে বসে থাকে, সেই জন্যই অন্য জাত যখন তখন হিন্দুদের গালে থাপ্পড় মেরে যায়।"[১২] শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মের প্রতিই তাঁর বিরাগ ছিল এমন নয়, বাংলা ভাষাকেও তিনি প্রথম জীবনে চাকর-বাকরদের ল্যাঙ্গোয়েজ বলে মনে করেছিলেন। উপন্যাসে মধুকে বলতে শোনা গেছে, সংস্কৃতে বামুন বামুন গন্ধ আর বাঙলায় চাকর-বাকরের গন্ধ। হেয়ার সাহেব বাংলা পড়া বাধ্যতামূলক করলেও মধু মানেননি, নমস্য হেয়ারের উদ্দেশ্যেও ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করেছেন। নিজের বাঙালীত্বকে ঝেড়ে ফেলতে মধু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী। তাঁর মনে হয়েছিল রাজধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়েই তিনি রাজার জাতিতে উঠতে পারবেন। ইংরেজ প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাই হয়ত তাঁর মনে নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন রকম শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে পারেনি; ইংরেজ জাতিকে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা মনে করে তার ভালো-মন্দ সবটাকেই আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। উপন্যাসে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সংবাদ পাওয়া গেছে গঙ্গানারায়ণের বিবাহ বাসরে। গঙ্গানারায়ণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিধুশেখরের আদেশে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে, কিন্তু মধুসূদন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে না করতেই ত্যাগ

করেছেন নিজের ধর্ম ও পিতামাতাকে। গঙ্গানারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবেছে এখানেই মধুর জয়। সে নিজে কিছুতেই পারলো না, বিবাহে তার তীব্র অসম্মতি ছিল তবু মেনে নিতে হল তাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র পুলক অনুভব করেনি, বরং বিরক্ত স্তুপীকৃত হয়েছে। নববধূর দিকে তার পূর্ণদৃষ্টি মেলে চাইতেও ইচ্ছে করেনি।

মধুসূদন যখন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষায় মত্ত সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের প্রকৃত সমন্বয় সাধনের পথে চলেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি পোষাক পরিচ্ছদ বা আচার-বিচারে ইংরেজকে গ্রহণ করেননি, গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার মুক্ত মন ও মুক্ত চিন্তাকে, গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্যের কর্মক্ষমতাকে। কোনও সংকীর্ণ ধারণার বশে তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে যেমন নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেননি তেমনি যা কিছু প্রাচ্য তাকেই ত্যাগ করে সভ্য হবার প্রচেষ্টায় মাতেননি। একদিকে হ্যামিল্টনের দোকান থেকে তিনি বিদেশি কালি ও কলম কিনে এনেছেন, অপর দিকে তিনি সর্বসাধারণের পাঠ্য বাংলা গদ্য রচনায় সচেষ্ট হয়েছেন। বাংলা লেখালেখিতে কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করে তিনি বাংলা গদ্যকে সাবলীল করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। তৎকালীন বাঙালী সমাজ বাংলা ভাষাকে সাহিত্যপদবাচ্য হিসাবে গ্রহণ করেনি। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে সহজবোধ্য ভাষায় রচিত ‘বাসুদেব চরিত’ শোনালে মদনমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের মতো একজন বিদগ্ধ মানুষের কাছ থেকে এমন মেয়েলি ভাষা আশা করেননি বলে জানান, তাঁর মত বাংলা ভাষায় সাহিত্য হয় না। বন্ধুর এই ধারণা ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রবল আঘাত দিয়েছিল।

যে সময়ে দাঁড়িয়ে হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে নব্য শিক্ষিত যুবসমাজ নতুন সভ্যতার স্পর্শে আলোড়িত হয়েছে, বেজে উঠেছে নবজাগরণের দামামা, সেই সময়ে কিন্তু এদেশের আপামর জনসাধারণ থেকেছে এই নতুন স্রোতের থেকে অনেক দূরে। তাদের মধ্যে প্রবাহিত

হয়েছে পুরোনো প্রথা, সংস্কার, ঐতিহ্যের ঢেউ। দেশের পরিবার, বিবাহপ্রথা, নারীমহলও ছিল এই নতুন স্রোতের থেকে বহুদূরে। আসলে বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতির গায়ে লেগে থাকা এই চিরায়ত সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি নারীরা, আর পর্দানশীন বাঙালী নারী দীর্ঘলালিত গৃহজীবনে বজায় রেখে এসেছিল সংসারের সমস্ত নিয়ম নীতি ও ঐতিহ্য। উপন্যাসে যে সময়ে একদিকে বাঙালী সমাজের পরিবর্তনের ঢেউকে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক, অন্যদিকে নিয়ে এসেছেন সমস্ত প্রথা, সংস্কারের জাঁতাকলে পিষ্ট নারীজাতির অসহায় ক্রন্দনকে।

উপন্যাসে বিধুশেখরের পরিবারকে ঔপন্যাসিক করে তুলেছেন বৈদিক কুলীন। উপন্যাসের পংক্তি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়, "বৈদিক কুলীন বলে ঐ পরিবারের মেয়েদের বিবাহ হয় কুলসম্বন্ধ করে। কন্যাসন্তান জন্মাবার দু-এক মাসের মধ্যেই স্বজাতের মধ্যে কোনো পাত্র নির্বাচন করে তার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে রাখতে হয়। তারপর যথা সময়ে সেই নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গেই বিবাহ।"[১৩] বিধুশেখরের তৃতীয় কন্যা বিন্দুবাসিনীর ছেলেবেলায় যে ছেলের সঙ্গে 'কুলসম্বন্ধ' ঠিক করে রাখা ছিল, বয়স সাত না পার হতেই ছেলেটি মারা যায়। ফলে বিন্দুবাসিনী 'অন্যপূর্বা' হয়ে যায়। কোন কুলীন ঘরে আর তার বিবাহ সম্ভব না হলে এক মৌলিক ঘরের পাত্র স্থির হল তার জন্য। কিন্তু বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তাকে বিধবা হয়ে ফিরে আসতে হল মাত্র সাড়ে নয় বছর বয়সে। মাত্র সাড়ে নয় বছরের বালিকার ঠাকুর ঘরে মন বসেনি, দুবেলা নমো নমো করে কোনোমতে পুজো সেরে সে পড়াশুনাতে মন দিয়েছিল। শিবরাম আচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীরামপুর মিশনে চাকরি করতেন; সপ্তাহে দুদিন বিধুশেখরের বাড়িতে থেকে তিনি বিন্দু ও গঙ্গাকে সংস্কৃত শেখাতেন। একদিন বিধুশেখরের নির্দেশে তিনি আর বিন্দুকে পড়াতে চাইলেন না, বললেন, "যাহা শিখিয়াছ তাহা যথেষ্ট। আর প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোকের পক্ষে যতখানি শিক্ষা করা উচিত, তুমি তাহা অপেক্ষা

বেশিই পড়িয়াছ।... স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দিবার অধিকার আমাদের নাই। ইহা লোকাচার সম্মত নহে। বিন্দু যাহা শিখিয়াছে, তাহাতেই সে ধর্মগ্রন্থাদি যথেষ্ট পড়িতে পারিবে।... তোমার পিতামহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, কন্যার পাঠ যথেষ্ট হইল। আর অধিক কী! সে এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া হইয়াছে।"[১৪] বালবিধবা বিন্দু নয় বছর বয়স থেকে শুধু লেখাপড়াকে আশ্রয় করেই বেঁচেছে। আকস্মিক আঘাতে তার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন তছনছ হয়ে গেছে। শিবরাম আচার্য আর গঙ্গানারায়ণকে পড়াতে চাননি, তিনি বলেছেন, "তুমি হিন্দু কলেজে পড়িতেছ, তোমার চিন্তা কী! সংস্কৃতের যুগ ফুরাইয়াছে। আমি আর কিছুদিন থাকিলে তোমার নিকট হইতে দুইচারি ইংরাজি শব্দ শিক্ষা করিতাম।"[১৫] গঙ্গানারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবনে শিক্ষক শিবরাম আচার্যের অভাব খুব বেশি অনুভব করেনি, কিন্তু বিন্দুর জীবন হারিয়ে গেছে নিঃসীম শূন্যতায়। এই বালিকার গায়ে এসে লাগল না সাগরপারের দেশ থেকে আগত নতুন সভ্যতার ঢেউ। দীর্ঘ বৈধব্যের একাকীত্বের জীবনে তার থাকল না আঁকড়ে ধরার মত আশ্রয়। হেয়ার সাহেবরা যখন নারী শিক্ষার প্রসারের কথা ভাবছেন, তখন গঙ্গানারায়ণের মনে হয়েছে বিন্দুর কথা, কিন্তু বিধবাদের শিক্ষাদানের কথা তখন অলীক কল্পনাতেও ভাবা যেত না। উপন্যাসে হেয়ার সাহেব গঙ্গানারায়ণকে বলেছেন, "প্রিয় বৎস, দেখিয়া লইয়ো, ক্রমে ক্রমে বিধবা বালারাও বিদ্যালয়ে আসিবে। যদি আমি আর দশ বৎসর বাঁচি, তবে সকল শ্রেণীর বালিকাদের জন্যই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যাব। এই আমার শেষ ইচ্ছা"[১৬] গঙ্গানারায়ণের শরীর রোমাঞ্চিত হলেও সে বুঝেছে বিন্দুর জীবনে পরিবর্তন আসা সম্ভব নয়। আর দশ বছর পরে বিন্দুর আর স্কুলে যাবার বয়স থাকবে না। হেয়ার সাহেবের এই ইচ্ছা পূরণ হয় না। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে জানা যায়

ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪২ সালে কলকাতায় কলেরা আক্রান্ত হয়ে।

ঔপন্যাসিক 'সময়'কে সন্ধান করতে গিয়ে তুলে এনেছেন সেই যুগের সমস্ত ইতিবৃত্তকে। রাইমোহন, গুপী স্যাকরার বৃত্তের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে এনেছেন সময়ের সমস্ত অন্তঃসারশূণ্যতা, সমস্ত ভন্ডামির স্বরূপকে। এনেছেন সেই সমস্ত মানুষদের, যাদের বাইরে ভদ্রতার মুখোশ থাকলেও ভেতরে বহমান ছিল প্রবল নারী লোলুপতা। ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ প্রবাহ পথে, পুরুষের কাছে নারী ছিল ভোগের বস্তু। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও প্রগতিশীলতার পথে এগোনো সমাজ সার্বিক ভাবে বেরিয়ে আসতে পারেনি এই দীর্ঘলালিত ভাবনাকে ভেঙে। তৎকালীন কলকাতার প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক এনেছেন পূর্ববঙ্গের বাবু পূর্ণচন্দ্রের ইতিবৃত্তকে। মদ এবং মেয়েমানুষের জোয়ারে কীভাবে সে সময়ের উচ্চবিত্ত মানুষেরা নিজেদের সর্বস্ব হারাত তার চিত্রও এঁকেছেন। উপন্যাসে রামকমল সিংহ সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি, কিন্তু তিনি গণিকা কমলাসুন্দরীর সঙ্গে সম্পর্কে কোনভাবেই লজ্জিত নন। গুপী স্যাকরার মত মানুষেরা নিজেদের সমাজে উঁচু স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে ভাড়া করা রমণী রাখেন। জগমোহন সরকারের মত মানুষ যিনি সমাজে গণ্যমান্য, মেয়েদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা যার ব্রত, তিনিও রাতের অন্ধকারে চুপিসারে বারবণিতাদের কাছে যান। বাঙালীর নবজাগরণের স্বরূপকে যাচাই করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, এক পা এগিয়ে আবার দশ পা পেছনোর মধ্যদিয়েই তৈরী হয়েছিল বাঙালীর বিবর্তনের পথ, বা নবজাগরণের প্রভাতে প্রকৃত অর্থে জেগে ওঠার পথ।

সিংহ পরিবারের ভৃত্যমহলের চিত্রতেও উঠে এসেছে সেই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ। কলকাতা শহরে একদিকে যখন নতুন প্রভাতের সূর্যোদয় হচ্ছে, তখন অন্যদিকে এই পরিবারের ভৃত্যমহলে গেঁথে বসেছিল আদিম প্রবৃত্তির সর্পিল আবহ। সোহাগবালার রাজত্বে পুরুষের ভোগের সামগ্রী

নারী। বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ভোগ করে পুরুষেরা; কিন্তু নারীরা যদি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে তাহলে সমস্ত দায় এড়িয়ে যায় পুরুষেরা অনায়াসে। পুরুষের কোন অত্যাচারের প্রতিবাদ নারীরা করতে পারে না। থাকোমণির মত গ্রামের মেয়েরা এই ভৃত্যমহলে এসে কিছুদিন নিজের সতীত্ব বজায় রাখলেও একদিন নিজের সতীত্বকে বর্জন করে তাদের ব্যক্তিত্ব বা নারীত্ব অর্জন করতে হয়। সোহাগবালা নিজের স্বামীকে বেঁধে রাখতে প্রতিদিন নিত্যনতুন দাসীকে জুগিয়ে চলে। পুরুষ মানুষের ভোগ লালসা অত্যন্ত স্বাভাবিক; তা নিয়ে কোনরকম লজ্জাবোধ প্রশ্নাতীত। সমাজের নৈতিক চরিত্রের এহেন দুর্দশার দিনেই নারীর অধিকার নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের মত প্রগতিশীল মানুষেরা, অর্থাৎ রাতের অন্ধকার ভেদ করে নতুন সকালের নতুন সূর্যোদয়ের পথ হয়েছিল প্রশস্ত।

উনিশ শতকের বাংলাকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এনেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে(১৭৭৪-১৮৪৬)। সেই সূত্রে তুলে ধরেছেন ঠাকুর পরিবারের সমস্ত প্রাচীন সূত্রকেও। দ্বারকানাথ প্রথম বাঙালী যিনি ইংরেজ জাতির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে নেমেছিলেন। দ্বারকানাথের যৌবনে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়নি। জোড়াসাঁকোতেই ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে তিনি ইংরেজি শিক্ষা করেছিলেন। আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হলেই তিনি স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। পালক পিতার কাছ থেকে জমিদারি সম্পত্তি পেলেও তিনি বুঝলেন আসলে বাণিজ্যতেই লক্ষ্মীর আনাগোনা। ব্যাংকিং, ইন্সওরেন্স, রেশম, নীল, কয়লা এবং জাহাজ চলাচল প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসাতেই তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন। 'কার টেগোর কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠার পর মহামান্য বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তাঁকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন। সেই সময় রুস্তমজী কাওয়াসজী নামে অপর এক ভারতীয় জাহাজের ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রামমোহন রায় ও তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজরা শাসক এবং রাজার জাত, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ইংল্যান্ডে একটি ছোট শ্রেণী মাত্র, একটা প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক কর্মচারি। এমন অনেক ইংরেজ আছে যারা মুক্তমনা, উদার, একতরফা শোষণের প্রতিবাদকারী। তারা এ দেশের ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে, শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ দেখায়, সংবাদপত্রে সরকারী নীতির সমালোচনা করেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন এই শ্রেণির ইংরেজদের সাহায্য ছাড়া ভারতবাসী নিজেদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হবে না। দ্বারকানাথ ইংল্যান্ড যাবার সময় এদেশ থেকে নানা উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড থেকে ভারতীয়দের জন্য নিয়ে এলেন একজন মানুষ, নাম টমসন। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু দ্বারকানাথ বেশিদিন এই দেশে থাকলেন না। নিজের অর্জিত ধন ভোগ করার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে পাড়ি দিলেন, সেখানে তিনি প্রবল সম্মান ও প্রতিপত্তির মধ্যে দিন কাটিয়েছিলেন, নেটিভ হয়ে যে সম্মান ও আদর তিনি ইংল্যান্ডে পেয়েছিলেন তা বিরল দৃষ্টান্ত। প্রথম জীবনে দ্বারকানাথ যেভাবে সাহেবদের নানা বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, শিল্পে, বাণিজ্যে ব্যবহার করা নানা অভিনব পন্থাগুলিকে এদেশের উন্নতিকল্পে ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করতেন পরবর্তীকালে তিনি সেই সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েন। এদেশের প্রতি তাঁর আগ্রহ ধীরে ধীরে কমতে থাকে, পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ না প্রকাশ করায় তিনি আরও মর্মাহত হলেন; প্রচুর অর্থ নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের পথে। ইউরোপের উচ্চবিত্ত মহলের সঙ্গে মিশে তিনি প্রচুর সম্মান ও আধিপত্যের সঙ্গে কাটালেন শেষ জীবন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি বিদেশিদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি, রুচি, আচার ব্যবহারের নজির।

দ্বারকানাথের এই ভোগবিলাসের ঐতিহ্যকে বহমান রাখেননি তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অত্যন্ত কম বয়স থেকেই তিনি চলে গিয়েছিলেন অধ্যাত্মমার্গের দিকে। উপণিষদের শ্লোক - ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। / তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধং।। - তাঁর হাতে এসে পড়ল। এই শ্লোকের ভাবনা, ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগতকে আচ্ছাদন কর, তিনি যাহা দান করেছেন তাই উপভোগ করো, তাঁকে স্তম্ভিত করল। তিনি প্রথম বয়েসে দেবমূর্তি ও শালগ্রামশিলাকেই দেবতা বলে গণ্য করতেন, ভয় ও ভক্তিতে তাদের প্রণাম করতেন। ক্রমাগত তিনি বুঝতে পারেন এই কাঠ বা পাথরের মূর্তি ঈশ্বর হতে পারে না। তিনি খুঁজতে শুরু করেন ঈশ্বরের স্বরূপ। সংসারের সমস্ত কিছু থেকে তাঁর মন সরে যেতে শুরু করে। সহপাঠীদের মতো তিনি লক হিউমের দর্শনে আস্থা রাখতে পারলেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ণ করেও যখন তিনি তৃপ্ত হলেন না, তখন পেলেন এই উপণিষদের শ্লোক। স্তম্ভিত হয়ে তিনি ভাবলেন, এর থেকে বেশী মানুষের কী চাওয়ার থাকতে পারে, তাঁর মনে পড়ে গেল সেই দিনটির কথা, যেদিন বিলাত যাত্রার কিছুক্ষণ আগে রামমোহন এসেছিলেন দ্বারকানাথের কাছে বিদায় নিতে। সেই সময়ে তিনি দেবেন্দ্রকে ডেকে তার হাত চেপে ধরেছিলেন। দেবেন্দ্রের মনে হল, হয়ত সেই দিন রামমোহন রায় তাঁকে নিজের কার্যভার সঁপে গিয়েছিলেন। তাঁর ঠাকুরমাও মৃত্যুর সময় ঈশ্বর ও পরকালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁকে কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। উপনিষদের এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা শোনার পরে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে এতদিন যিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন যিনি, সেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নিজের গুরু হিসাবে বরণ করলেন। এরপর প্রতিষ্ঠা করলেন ‘তত্ত্বরঙ্গিনী সভা’। দুই বছর পরে এই সভার নাম হল ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’। দেবেন্দ্র বিষয় রক্ষার বদলে এই ব্রহ্ম উপাসনায় মাতলে দ্বারকানাথ ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু দেবেন্দ্র কোন বাধাই মানলেন না। তিনি বুঝলেন তাঁর পিতার মত পার্থিব জগতে সকলের ঊর্ধ্বে যাওয়াই

জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের প্রতিষ্ঠা। তিনি ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ তাঁর কুড়িজন বন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মসমাজ রূপ নিল ব্রাহ্মধর্মের। তিনি চাইলেন শিক্ষিত হিন্দু যুবসমাজ যেভাবে হিন্দুধর্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে, শিক্ষিত মানুষের জন্য প্রয়োজন এই নতুন ধর্মের প্রবর্তন। ইংল্যন্ডে পিতার মৃত্যুর পরও দেবেন্দ্রনাথ প্রচলিত হিন্দু নিয়মে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করলেন না। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের জন্য গড়ে তুললেন নতুন ধর্ম যেখানে চিরায়ত হিন্দু ধর্মের সমস্ত সংস্কারকে বাদ দিয়ে গড়ে তোলা হল একটা নব্য হিন্দু ধর্ম তথা ব্রাহ্মধর্ম। বাঙালী এগোলো আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর মনে করেছিলেন, বর্বর হিন্দুধর্ম ছেড়ে সুসভ্য খ্রিস্টানদের তিনি সমকক্ষ হয়েছেন। তাই পিতা রাজনারায়ণ দত্তের শত চেষ্টা বা মায়ের শত অশ্রু তাঁকে ফেরাতে পারেনি। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর তাঁর আর হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না। প্রথমদিকে তিনি বহু পাদ্রীদের বাড়িতে থেকে তাদের থেকে পাঠ নিতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ করে তারাই তাঁকে বিশপস কলেজে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই কলেজে আবাসিক ছাত্র হতে গেলে মাসে ষাট টাকা করে লাগে। রাজনারায়ণ বসু মধুকে এত কিছুর পরেও পাদ্রীদের ভিক্ষাজীবী হতে দিতে চাননি। তিনি স্ত্রীর হাত দিয়ে মধুর জন্য মাসিক একশ টাকা বরাদ্দ করে দিলেন। বিশপস কলেজে সেই সময়ের ছাত্র ছিল খাঁটি ইউরোপীয়ানরা ও কিছু দেশীয় খ্রিস্টান, এদের মধ্যে মধুই ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাত্র। কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম দিনেই তিনি দেখলেন দেশীয় এবং ইউরোপীয় ছাত্রদের জন্য দুরকম পোষাক। মধু এর বিরোধিতা করায় তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ইউরোপিয়ানদের মত ‘ক্যাসক’

পরার। নানা জায়গায় তিনি প্রতিদিন অনুভব করতে পারলেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও পুরোপুরি ইউরোপীয় হওয়া যায় না। শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হতেই তিনি সগর্বে পদদলিত করেছিলেন নিজের ধর্ম, ভাষা ও সমাজকে। বাঙালীত্বের খোলস ত্যাগ করে ইউরোপীয় হতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন খোলস ত্যাগ করলেই পরিচয় বদলে ফেলা যায় না, নিজ সত্তাকে পরিবর্তিত করে ফেলা যায় না, কিন্তু নিজের পরিবর্তিত সত্তাকেও তিনি ঝেড়ে ফেলতেও চাননি।

উপন্যাসে মধুসূদন যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী কবি, হেনরিয়েটার সঙ্গে দাম্পত্য সুখে যখন তিনি দিন কাটাচ্ছেন, সে সময়ে একদিন পথ দিয়ে চলছিল মহরমের সাড়ম্বর বর্ণাঢ্য মিছিল, শিশুকন্যা শর্মিষ্ঠা ও হেনরিয়েটাকে শোনাচ্ছিলেন হাসান-হোসেনের বিষাদ কাহিনী। সেই কাহিনী শোনাতে গিয়ে তিনি হেনরিয়েটাকে বললেন, "জানো আরিয়েৎ, মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি হাসান-হোসেনের মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে কাব্য রচনা করে, তা হলে সে মহাকবির স্বীকৃতি পাবে। এই বিষয়বস্তু নিয়ে সে সমগ্র মুসলমান জাতির মর্মবেদনা ফুটিয়ে তুলতে পারবে। আমাদের ধর্মে এমন তীব্র শোকের বিষয়বস্তু নেই।"[১৭] মধুসূদন হিন্দুধর্মের কথা বলতে গিয়ে বললেন 'আমাদের ধর্মে'। এই অসঙ্গতি আরিয়েৎ ধরিয়ে দিলে তিনি বলেছেন, "মুখের কতায় ওরকম এসে যায়! হোয়াট আই মেন্ট, হিন্দুদের ধর্মে! ব্রজঙ্গনা লেখার পর অনেকে আমাকে বোষ্টম বলতে শুরু করেছে! কিন্তু আমি খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান।"[১৮] ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে জাতি, বা যে ধর্মের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ত্যাগ করে তিনি রূপান্তরিত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাড়ীর যোগ তিনি ছিন্ন করতে পারেননি, নিজের শেকড়কে করতে পারেননি অগ্রাহ্য।

১৮৪১ সালে মাত্র একুশ বছর বয়েসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যোগ দিয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। পাঁচ বছর পরে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার হঠাৎ পরলোক গমন করায় সংস্কৃত কলেজে

সেক্রেটারির পদ খালি হলে, সাহেবরা বুঝেছিলেন আর কোন বৃদ্ধ পণ্ডিত বা টুলো বামুন দিয়ে কলেজ চালানো যাবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের নাম প্রথমেই উঠে এসেছিল। দুই কলেজেই বেতন পঞ্চাশ টাকা কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁকে পড়াতে হয় বিদেশি সিভিলিয়ান দের, তারা সংস্কৃত শেখে চাকরি রক্ষার জন্য। সংস্কৃত কলেজ প্রকৃত অর্থে জ্ঞানচর্চার স্থান। বিদ্যাসাগর যোগ দিলেন সংস্কৃত কলেজে। এই কলেজে যোগ দিয়েই তিনি কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালেন। সপ্তাহে একদিন রবিবার তিনি ছুটির দিন নির্দিষ্ট করলেন। শিক্ষকদের ক্লাসে ঘুমানো, অকারণে দেরি করে আসা ইত্যাদি কঠোর হাতে বন্ধ করলেন। না জানিয়ে কোন ছাত্র বা শিক্ষক দিনের পর দিন কলেজ বাদ দিতে পারবে না এমন নিয়ম চালু হল। তাঁর সৎ প্রচেষ্টা সেক্রেটারি রসময় দত্ত ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। কলেজটিকে আমূলভাবে ঢেলে সাজানোর একটা পরিকল্পনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। রসময় দত্ত কিছুতেই সেই পরিকল্পনাটি সাহেবদের কাছে পাঠাতে রাজী হলেন না। বিরক্ত হয়ে মাত্র একবছর তিন মাসের মধ্যে ইস্তফা দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

এই সময় থেকেই বাঙালী সমাজের নানা নিয়ম নীতির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে ধীরে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন। তাঁর বাল্য শিক্ষক যাঁকে তিনি চরম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন সেই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভগ্নকুলীন। বহুবিবাহতে তাই তার আলস্য নেই। ঈশ্বরচন্দ্র খুব অবাক হয়েছিলেন এই দেখে বৃদ্ধ বয়েসে শুধুমাত্র টাকার জন্য তিনি একটা বালিকাকে বিয়ে করতে চলেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর মৃত্যু হলে একটা অসহায় নিরপরাধ বালিকা বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করবে চিরকাল। তা সত্ত্বেও বৃদ্ধকে নিবৃত্ত করা যায় নি। ঈশ্বরচন্দ্র ভেবেছেন যাঁরা নমস্য, যাঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁরাও এই প্রকার অন্যায় করে, তবে সাধারণ অশিক্ষিত কুশিক্ষিত ব্যক্তিরা তো এমন

করবেই। অথচ এর প্রতিবিধান করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। যে সময়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মনে পুরুষের বহুবিবাহ, নারীদের বৈধব্য যন্ত্রণা নিয়ে সচেতনতা তৈরি হতে শুরু করেছিল ঠিক একই সময় থেকে বাংলার নব্য শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও এই ভাবনার প্রবাহ ঘটেছিল।

উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই গঙ্গানারায়ণ কৈশোরে পা রাখতেই তার বাল্যসঙ্গী বিন্দুবাসিনীকে বন্দী করে দেওয়া হল ঘরের চার দেওয়ালে। বালবিধবা বিন্দুর সামনে পড়ে থাকল দীর্ঘ একাকীত্বের যন্ত্রণাময় জীবন। বয়স অল্প হলেও গঙ্গানারায়ণ বিন্দুবাসিনীর এই বেদনাকে বুঝতে পেরেছিলেন, সেই কারণেই হেয়ার সাহেবকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিধবাদের শিক্ষাদানের বিষয়ে। বিধুশেখরের নির্দেশে নিজের অমতেই গঙ্গাকে বিবাহ করতে হয়েছিল বাগবাজারের অষ্টমবর্ষীয়া লীলাবতীকে। কিছুদিনের মধ্যেই গঙ্গানারায়ণ অনুভব করেছেন, বিন্দুবাসিনীর প্রতি তার মনে জেগে উঠেছে প্রবল প্রেমবোধ। অপরদিকে বালবিধবা বিন্দুবাসিনীও তার বাল্যসখা গঙ্গার প্রতি খুব স্বাভাবিক নিয়মেই অনুরক্ত। তাদের দুই পরিবার পারিবারিক বন্ধু হলেও বিধুশেখররা ব্রাহ্মণ তাই এই দুই বালক বালিকার বিবাহ দিয়ে নিজেদের সম্পর্কের বন্ধনে বেঁধে ফেলার চিন্তা দুই পরিবারের মনে ঠাঁই পায়নি কোনোদিনই। দুটি মন নিজেদের অজান্তেই একে অপরকে গ্রহণ করে ফেলেছে। বিন্দু নিজে মনকে প্রকাশ করতে চায়নি, কিন্তু গঙ্গা বিন্দুর কাছে নিজেকে গোপন করেনি, বিন্দুকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছে অন্যকোন দূর দেশে যেখানে তাদের কেউ চিনতে পারবে না। বিন্দু পারেনি, চিরায়ত সংস্কারকে মেনে বিধবার ভালোবাসাকে পাপ হিসাবে দেখেছে, ভেবেছে সমাজের থেকে পালালেও নিজের মনের থেকে সে পালাতে পারবেনা। নিজের ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে সে গঙ্গাকে পরজন্মে পেতে চেয়েছে, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সে গঙ্গাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। গঙ্গা কিছুতেই পারেনি বিন্দুকে ছেড়ে থাকতে। আগুনের দিকে পতঙ্গ যেমন মৃত্যু অনিবার্য

জেনেও আকৃষ্ট হয়, ঠিক তেমনই গঙ্গাও সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধের কথা জেনেও ছুটে গেছে বারে বারে বিন্দুর কাছে, একদিন বাড়ির সকলের কাছে তাদের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়ে গেছে, বিধুশেখর আর কিছু না ভেবে একা বিন্দুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কাশীতে। গঙ্গা কিছুতেই কাউকে বোঝাতে পারেনি বিন্দুবাসিনী ছাড়া আর কোন রমণী তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। বিন্দু তার জীবনে শুধু নারীর প্রয়োজন মেটাবে না, বিন্দু তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু।

তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত যুবসমাজ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে নারীকে শুধু শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে নয়, পেতে হবে কর্মসঙ্গিনী হিসাবে। তাদের মধ্যে তৈরি হতে শুরু করেছে প্রথাগত ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণ বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করলেও দেখেছে অশিক্ষিত একটি নারী শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে কিন্তু জীবনসঙ্গিনী নয়। সাংসারিক জীবনে আর স্থিত হতে পারেননি গঙ্গানারায়ণ। মায়ের সম্পত্তি পরিদর্শনে ইব্রাহিমপুর গেলে সেখানে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের স্বরূপ দেখে আহত হয়েছে, ইব্রাহিমপুরে তাদের প্রজাদের উপরে নীলকর সাহেব ম্যাকগ্রেগরের অত্যাচার বেড়েই চলেছে, গঙ্গানারায়ণ সেখানে পৌঁছে জড়িয়ে পড়েছে গরিব প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে। কিন্তু তাঁর ছন্নছাড়া মন তখনই পারেনি এদের রক্ষা করতে। রাতের অন্ধকারে একটা ঘোরের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ যাত্রা করেছে নিরুদ্দেশের পথে, একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সে পৌঁছে গেছে বারাণসীতে। সেখানে গিয়ে নিজের মানসিক ক্লৈব থেকে মুক্তি পেয়ে গঙ্গা খুঁজতে শুরু করেছে বিন্দুকে। বহু খোঁজার পর সে জানতে পেরেছে, বিন্দুকে দুর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে গেছে এবং তার পরিবারের সম্মান রক্ষা করতে বিন্দুর মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেই সময়ের ভয়াবহ বাস্তব সত্যকে, যেখানে একদিকে বালবিধবাকে অকলঙ্ক রাখতে তাকে বারাণসীতে প্রবাসে পাঠানো হয়, কিন্তু সেই মেয়ে দুর্বৃত্তদের হাতে

পড়ে পতিত হয় নরকে, শারীরিক মানসিক অত্যাচারের যন্ত্রণায় তার দেহ মন হয় প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত। অন্যদিকে পিতা তার নিষ্কলঙ্ক মৃত্যু সংবাদে নিজের কুলমর্যাদা রক্ষার শান্তি পায়। বিধুশেখরের পরিবার পতিত হবে এই ভয়ে যে শেঠজী বিন্দুর দেখভাল করতেন তিনি বিধুশেখরকে প্রকৃত সংবাদ জানাননি, আবার বিধবা মেয়ে সমস্ত কলঙ্কের ভয় ঘুচিয়ে মারা গেছে এই স্বস্তির সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টাও বিধুশেখর করেননি। গঙ্গানারায়ণ কাশীতে গিয়ে জানতে পেরেছেন বিন্দুর মৃত্যু সংবাদ, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি, বিন্দুকে খুঁজে বেড়িয়েছে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। এরপর একদিন খোঁজ পেয়েছে বিন্দুর, জানতে পেরেছে তাকে দস্যুরা লুন্ঠন করে নিয়ে গেছে, চরম আঘাতে তার মন ভেঙে জর্জরিত হয়ে গেছে। দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়ে বিন্দুর কাছে পৌঁছে তিনি শুনেছেন বিন্দু মা হয়েছিল এবং তার ছেলেকেও ওরা কেড়ে নিয়েছে। সমাজের নিষ্ঠুর কষাঘাতে একটি নিষ্পাপ বালিকা পরিণত হয়েছে কাশীর রেন্ডিতে। যে মেয়েটি একসময় পড়াশোনার মধ্যে ডুবিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, সেই মেয়েটির শরীর-মন ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে একদল দেহ পিপাসী নোংরা মানুষ। গঙ্গানারায়ণ নিজের মনের সবটুকু উজাড় করে ভালোবেসেছিল বিন্দুকে, তাকে কেন্দ্র করে নিজের জগৎ পূর্ণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি বিন্দুকে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেই সময়ের ভয়াবহ বাস্তব সত্যকে, যেখানে বালবিধবাকে অকলঙ্ক রাখতে বারাণসীতে প্রবাসে পাঠানো হয়, সেই মেয়ে দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে পতিত হয় নরকে, শারীরিক মানসিক অত্যাচারের যন্ত্রণায় তার দেহ মন হয় প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত। অন্যদিকে পিতা তার নিষ্কলঙ্ক মৃত্যু সংবাদে নিজের কুলমর্যাদা রক্ষার শান্তি পায়।

উপন্যাসে নব্যচেতনায় জেগে ওঠা যুবকের জীবন ভেঙে গেছে প্রথা সংস্কারের জাঁতাকলে। পিতা রামকমল সিংহের মৃত্যুর পরে বিধুশেখর বিন্দুকে ভালোবাসার শাস্তি স্বরূপ রামকমল সিংহের সমস্ত সম্পত্তি থেকে

বঞ্চিত করলেন গঙ্গানারায়ণকে। নিজ ঔরসজাত পুত্র নবীনকুমারকে রামকমল সিংহের সমস্ত সম্পত্তির অংশীদার করে দিলেন। বিধুশেখর সেই ব্যক্তি যিনি বন্ধুপত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছেন, মৃত্যু শয্যায় বন্ধুকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন, সেই মানুষটিই গঙ্গানারায়ণের প্রতি নিজের সমস্ত স্নেহ তুলে নিলেন বিন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। ঔপন্যাসিক দেখাতে চাইছেন তৎকালীন সমাজের এই পরস্পর বিরোধের সত্যকে। নিজ বালবিধবা কন্যা বিন্দু ও কিশোর গঙ্গার নিষ্পাপ ভালোবাসা তার কাছে পাপ, কিন্তু বিম্ববতীকে তিনি জানিয়েছেন, "সন্তানহীনা বলে তোমার মনে দুঃখ ছেল, সেই দুঃখ জুড়োবার জন্য আমি তোমায় একটি পুত্র সন্তান দিয়েছি। ...আমি ব্রাহ্মণ, কুলীনশ্রেষ্ঠ, বিবাহিতা রমণীর ব্রাহ্মণ নিয়োগে সন্তান উৎপাদন দেশাচারসম্মত। তাই তোমায় বলচি, কোনো পাপ হয়নি মনে পাপ রেকো না...।"[১৯] গঙ্গানারায়ণের মনকে তিনি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চেয়েছেন, বিন্দুবাসিনীকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেননি, তার মনে হয়েছে অপরাধের তুলনায় তিনি তো বিন্দুকে অতি মৃদু শাস্তিই দিয়েছেন। মতিচ্ছন্ন হয়ে সেই মেয়ে এই ঠাকুরঘর অপবিত্র করেছিল। গঙ্গানারায়ণ তাকে পাপ মনে দেখেছিল। পাপ মনে তাকে স্পর্শ করতে এসেছিল, তার আগে বিন্দু বিষ পান করেনি কেন? বিন্দু তেমন ভাবে মরলে কন্যার জন্য গর্বিত হতেন বিধুশেখর, কন্যার নামে কালীঘাটে একটি পাথর বাঁধিয়ে দিতেন। সংযমই বিধবার তো অলংকার। যে বিধবা এ জন্মে প্রতিটি বিধান মেনে কঠোরভাবে আত্মসংযম পালন করে, পরজন্মে তার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হয়। একথা তিনি কতবার বুঝিয়েছেন বিন্দুকে। তা সে শুনল না, জীবনে তিনি তার মুখদর্শন করবেন না। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেই সময়ের এমন সব সত্যকে যেগুলি সেই সময়কে সার্বিকভাবে চিনিয়ে দেয়। বিধুশেখরের কারণে যখন গঙ্গানারায়ণকে বিন্দুকে হারাতে হয়, রামকমল সিংহের সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তখন মা বিম্ববতীর মন রক্ষার্থে তাকে মায়ের

সম্পত্তির অছি হতে হয়। এই দায়িত্ব পাবার পর গঙ্গা প্রতি মুহূর্তে সন্ধান করতে থাকে তাদের পরিবারে বিধুশেখরের প্রতিপত্তি খর্ব করার উপায়। এই সময় মনের অশান্তি মেটাতে সে ব্রাহ্মদের সভা সমিতিতে যোগ দিতে থাকে। বন্ধু রাজনারায়ণের অনুরোধ ও নিজের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে পারে না এই ধর্ম। গঙ্গানারায়ণ যদি বারাঙ্গনা বিলাসে মত্ত হয় মা বিম্ববতী মেনে নেবেন, এই বিষয়ে এস্টেট থেকে অর্থ ব্যয় করলেও কোন বাধা দেবেন না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। যারা ঠাকুর দেবতা মানেন না, তাদের মুখ দেখাও বিম্ববতীর কাছে পাপ, কিন্তু স্বামী পুত্রের বারবধূ গমন তার কাছে কিছুই নয়। ঔপন্যাসিক সুন্দর ভাবে তুলে ধরলেন উনিশ শতকের সমাজ মানসকে, চিনিয়ে দিলেন সময়ের স্বরূপকে।

ঔপন্যাসিক যে সময়কে তুলে ধরেছেন সেই সময়টি বাঙালীর সার্বিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সময়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় ‘ইয়ংবেঙ্গল’ হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন, যাঁরা বাঙালী সমাজের সমস্ত রকম প্রথা সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন, নিজ মাতৃভাষাকে ঘৃণায় অবজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরাই মধ্যবয়েসে পৌঁছে বুঝেছেন দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন বিদ্রোহ সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কিন্তু নিজের দেশের সম্পদ গুলোকেও চিনতে হয়, নিজের মাতৃভাষাকে সম্মান করতে হয়। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, ইয়ংবেঙ্গল দলের সদস্যরা কর্মসূত্রে একজন এক জায়গায় থাকেন। রাধানাথ সিকদার দেরাদুনে সরকারের জরিপ বিভাগে কর্মরত ছিলেন, পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে যখন তিনি ফিরে এলেন সেই সময়ে আবার সমস্ত বন্ধুবর্গ মিলিত হওয়ার সুযোগ পেল। রাধানাথ সিকদার, প্যাঁরীচাদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা মিলিত হয়েছেন রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে। রাধানাথ বহুদিন প্রবাসে থাকার ফলে বাংলা ভুলে গেছেন, তিনি দেখে অবাক হয়েছেন তার যে বন্ধুরা

যৌবনে বাংলাকে ঘৃণা করেছেন তাঁরাই আজ প্রবল সম্মানের সঙ্গে মাতৃভাষার জয়গান করছেন, ঈশ্বরচন্দ্রের লেখার সমাদর করছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাংলা রচনাভঙ্গী দেখে আপ্লুত হয়েছেন, হিন্দুধর্মের যে সংস্কার সাধন করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করে তার প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বুঝেছেন নব্যশিক্ষিত যুবকেরা যেভাবে খ্রীষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল তা এইদেশের উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। তাঁরা আরও বুঝেছেন নারীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের বিধান না হলে এই দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব।

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। মুক্তমনা এই পুরুষটি ভারতবর্ষে এসে দেখলেন ইংল্যান্ড থেকে তিনি ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি বুঝলেন, ইংল্যান্ডের জনসাধারণের ধারণা অধঃপতিত ভারতীয়দের উদ্ধার কার্যেই ব্রিটিশ জাতি নিহিত কিন্তু প্রকৃতচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি দেখলেন শিক্ষা, আইন, ব্যবসা বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই ভারতবাসীরা না বুঝেই শোষিত হচ্ছে। তিনি অবাক হলেন যখন দেখলেন ভারতবাসীরা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে না, শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে গর্বিত হয়। তিনি বুঝলেন ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় এদেশের মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হয় না, তাই তাদের আত্ম উপলব্ধি ঘটে না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজী ভাষায় লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপটিভ লেডি' দেখে বীটন অবাক হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন একজন বাঙালী কবি মাতৃভাষা ছেড়ে কবিতা লিখেছেন ইংরেজীতে, একজন ইংরেজ যতই ভাল ফরাসী জানুক সে কখনই ভাবতে পারে না মাতৃভাষা ছেড়ে ফরাসীতে কবিতা লিখবে। তাঁর মতে ভারতবাসীরা যতই শিক্ষিত নিজেদের ভাবুক না কেন তারা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত নয়, কারণ তাদের আত্মোপলব্ধি হয়নি। বেথুন সাহেব এদেশে আসার পর থেকে নানা রকমভাবে এদেশের মানুষদের নিয়ে ভেবেছিলেন।

তাঁর দেশে যেভাবে নারীরা নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, তারা সভা সমিতি করছে, তার বিপরীতে এদেশের নারীদের অবস্থা দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন।

এই সময়ে 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠী তাঁদের শিক্ষার গোড়ার দিকে নিজের দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভুলে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন এদেশের সবকিছুই কুসংস্কারে ভরা। মদনমোহন তর্কালংকারের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ধীরে ধীরে তাদের সেই ভুল ভাঙে, তাঁরা সন্ধান পান সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট ঐশ্বর্যের, তাঁরা বুঝতে পারেন মাতৃভাষার গুরুত্ব। মদনমোহনের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে সংস্কৃত পন্ডিতদের মধ্যেও এমন মুক্তমনা মানুষ থাকতে পারে। রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা বেথুন সাহেবের পরিচয় হলে তাঁরা বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখেন বেথুনের কাছে। বেথুন সাহেব নিজেও এই বিষয়ে ছিলেন প্রবল উৎসাহী কিন্তু ইংরেজ রাজসরকারের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সমস্তরকম সাহায্য করতে রাজী হলেন। মদনমোহন নিজের দুটি শিশুকন্যাকে এই বিদ্যালয়ের প্রথম দুটি ছাত্রী হিসাবে ভর্তি করতে রাজী হলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মির্জাপুরের বৈঠকখানা বাড়ি দিয়ে দিলেন স্কুল ভবনের জন্য। তাঁদের সকলের প্রচেষ্টায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুভ সূচনা হল এদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের। সালটি ১৯৪৯। প্রথমদিনে স্কুল শুরু হয়েছিল একুশটি বালিকা নিয়ে। শহরের বহু মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও বহু পত্রপত্রিকা নিন্দামন্দ ও কুৎসা রটনা করতে লাগল। এই কুৎসার ফলে হোক বা শহরের থেকে মীর্জাপুরের দূরত্ব বেশী হওয়ার কারণে হোক কিছুদিনের মধ্যে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা সাত জনে এসে পৌঁছল। বেথুন সাহেব নিজে উদ্যোগী হয়ে শহরের কেন্দ্রে হেদুয়ায় সরকারের কিছু জমি মির্জাপুরের

সমস্ত জমির বিনিময়ে নিয়ে নতুন স্কুল গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এই নতুন স্কুল ভবনের নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বেথুন সাহেবের মৃত্যু হল। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেলেন এই স্কুলের জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই স্কুলটি 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিত হয়ে গেল।

নবজাগরণের যুগে হিন্দু কলেজ হয়ে উঠেছিল বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান, কিন্তু হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ সকলের জন্য ছিল না। শুধুমাত্র হিন্দু ছেলেরাই এই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেত এবং তাদেরও প্রয়োজন হত বংশ গৌরব। উপন্যাসে বেশ্যা হীরা বুলবুল তার পুত্র চন্দ্রনাথকে ভর্তি করতে চেয়েছে হিন্দু কলেজে। হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা যাঁরা হিন্দু কলেজের চেয়ারপার্সন তাঁদের রাজী করানো প্রায় অসম্ভব। হীরা বুলবুলের একমাত্র সহচর রাইমোহন চন্দ্রনাথের বুদ্ধি দেখে তাকে স্কুলে ভর্তি করাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হীরেমণিকে সে নানা ভাবে বুদ্ধি দিয়েছে ছেলেকে ভর্তি করার উপায় খুঁজতে। দেশীয় সম্ভ্রান্ত বাবুদের পায়ে ধরেও যখন কোন ফল হয়নি, তখন রাইমোহনের বুদ্ধিতে হিরেমণি ছেলের হাত ধরে হাজির হয়েছে হিন্দু কলেজে। হিন্দু কলেজে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের শিক্ষালাভের অধিকার আছে, ইংরেজ সদস্যরা মনে করেছে হিরেমণি হিন্দু রমণী সুতরাং তার ছেলেকে ভর্তি নিতে হিন্দু সদস্যদের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। হিন্দু সদস্যরা কিন্তু চন্দ্রনাথকে কোনভাবেই ভর্তি করতে রাজী হননি। ইংরেজ সদস্যরা চন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিয়ে তাকে এই কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু যে সব বাবুরা রাতের অন্ধকারে হীরেমণির মত নারীকে ভোগ করতে দ্বিধা করেন না, তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনে দ্বিধান্বিত হন না, তারাই সেই সন্তানদের 'জারজ' আখ্যা দেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজের এই অদ্ভুত শুচিবায়ুতার কারণে এই ছেলেটি ভর্তি হবার পর থেকেই কলেজে ছাত্র সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। পতিতার ছেলের সঙ্গে একত্রে বসে শিক্ষালাভ করতে এতটাই ভীত বাঙালী সমাজ যে রাতারাতি স্থাপিত হয়েছে 'হিন্দু

মেট্রপলিটন কলেজ’। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে পাওয়া যায় সময়টা ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ।

ঔপন্যাসিক দেখালেন, একদিকে যে সমাজে ভদ্রসম্ভ্রান্ত পুরুষেরা প্রকাশ্যে বেশ্যা বিলাসে মগ্ন থাকতে পারেন এবং কোন লজ্জা বোধ তাদের মধ্যে কাজ করেনা, সেই সমাজেই ভদ্রপরিবারের সন্তানেরা বেশ্যাপুত্রের সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসে শিক্ষাগ্রহণ করে না। শহরের গণ্যমান্য লোকেরাই উদ্যোগ নিয়ে রাতারাতি স্থাপন করে ফেলে নতুন বিদ্যালয়। বেশ্যাপুত্র কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্র সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে কমতে শুরু করে, কলেজের হিন্দু শিক্ষকরা কোনভাবেই এই ছেলেটিকে পাঠদানে রাজী হয়নি। শুধুমাত্র ইংরেজ শিক্ষকরা প্রবল উদ্যমে এই মেধাবী ছেলেটিকে পড়িয়ে যান; কিন্তু শেষরক্ষা হয় না, ছাত্রসংখ্যা কমে যেতে থাকায় বাধ্য হয়ে কলেজ থেকে একদিন বিতাড়িত হতে হয়েছে চন্দ্রনাথকে। একটি সম্ভাবনাময় বালকের জীবন সমাজের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যায়। শুধু বালকের জীবনই নয়, ভেঙ্গেচুরে খানখান হয়ে যায় শহরের নামী বেশ্যা হীরেমণির জীবনও। স্কুল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে চন্দ্রনাথ মায়ের প্রতি প্রবল আক্রোশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সমাজের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ও মায়ের প্রতি ঘৃণায় সে আশ্রয় নেয় শ্মশানের ডোমদের মধ্যে। নিজের একমাত্র সন্তান হারিয়ে হীরেমণিও বজায় রাখতে পারে না নিজের স্বাভাবিক জীবন, বেশ্যা রমণীর মধ্যেকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে। সন্তান শোকে পাগলিনী নারী চায় বেরিয়ে পড়তে। তীর্থ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে নিজের সেই পাপকে স্খালন করতে চায়, যে পাপ তার নয়, তা একান্তই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক বানিয়ে তোলা ও চাপিয়ে দেওয়া। সমাজ নারীকে কোনো আশা করার অধিকার দেয়নি, দেয়নি নিজের মত করে বাঁচার অধিকার, আর এই নারী তো পতিতা। বজরা করে তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে তাকে করতে হয় নরক দর্শন। অর্থ লোভী কিছু দস্যু তার বজরা লুঠ করে ধর্ষণ ও বিবস্ত্র করে তাকে ছুড়ে ফেলে যায় নদীর

ধারে। পতিতা হীরা বুলবুলের চির অন্ধকারময় জীবন প্রবেশ করে এক গাঢ় অন্ধকারের গহ্বরে। সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে একদিন আত্মঘাতিনী হয় সে। সমাজের প্রবল শোষনে ধ্বংস হয়ে যায় এক নারীর জীবন। আসলে একটি মাত্র জীবন নয়, সমাজ যেখানে ব্যক্তির চেয়ে বড়, সেখানে এভাবেই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে শতকোটি নারী, শতকোটি মানুষ, ঔপন্যাসিক উনিশ শতকের সেই সময়কেই চেনাতে চেয়েছেন, তুলে আনতে চেয়েছেন সময়কে, যেখানে প্রতিটি ঘটনা সেই সময়েরই প্রতীক।

বেথুনের মৃত্যুর পর থেকে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বেথুন সাহেব বারবার যে কথাটা বলেছিলেন সেটি হল, আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে হলে শিক্ষা দিতে হবে মাতৃভাষায়। বিদ্যাসাগর বেথুনের ভাবনাকে মাথায় রেখে ইংরেজ সরকারের কাছে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশদ পরিকল্পনা পেশ করলেন। বহু সাধ্যসাধনার পর ইংরেজ সরকারের মঞ্জুরি পাওয়া গেল। সংস্কৃত কলেজের দায়িত্বের ওপর বিদ্যাসাগর নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব। তিনি গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে লাগলেন গ্রামের মানুষ যদি একখণ্ড জমি দেয় এবং নিজেরা চাঁদা তুলে একটি বাড়ি তুলে দেয় তাহলে সে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়। শিক্ষকদের বেতন দেবে সরকার। প্রায় সমস্ত জায়গায় তিনি সার্থক হতে লাগলেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বুঝলেন শুধু বিদ্যালয় স্থাপন করে গেলেই কোন উদ্দেশ্য সাধন হয় না, তার সঙ্গে প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষক। ছাত্রদের মতো শিক্ষকদেরও আগে গড়েপিটে নিতে হবে, আর সেই জন্য স্থাপন করতে হবে নর্মাল স্কুল।

উপন্যাসে দেখা গেছে যখন তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রবল উদ্যোগী সে সময়েই একদিন বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গ্রামে গিয়ে শুনলেন তাঁর ছেলেবেলার শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন

এবং সেই সঙ্গে তিনি বিধবা করে গেছেন ছয়টি রমণীকে, তার মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠাটির বয়স নয়। সেই সঙ্গে আরও শুনলেন তাদের প্রতিবেশীর কন্যা এগারো বছরের সত্যভামা বিধবা হয়েছে। অবোধ বালিকাদের এই বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিধান শাস্ত্র থেকে খুঁজে বের করার পণ গ্রহণ করলেন। গোটা সমাজ তাঁর বিরোধিতা করলেও তিনি থামবেন না, এই অঙ্গীকার তিনি নিজের কাছে করলেন। বিদ্যাসাগর মানসিকভাবে ছিলেন আপামর বাঙালীর থেকে বহুবছর এগিয়ে। তিনি বাঙালী সমাজকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের সুবর্ণভূমিতে। যেখানে নবজাগ্রত ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী জেগে উঠবে নতুন প্রভাতে।

উপন্যাসে নবীনকুমার যখন চতুর্দশ বর্ষীয় যুবা সেই সময় থেকেই তার মনে সমস্ত কিছুকে যাচাই করে দেখার প্রবণতা জাগতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে শহরের নানা রকম হুজুগের বিবরণও উপন্যাসে আছে। নবীনকুমার যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র সে সময়ে কলকাতার এক ধনী বাড়িতে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই মহাপুরুষের নামে গুজবের শেষ নেই। বিম্ববতীও সেই মহাপুরুষের পায়ের ধুলোর মাদুলি বানিয়ে নবীনকুমার ও গঙ্গনারায়ণের জন্য রেখেছিলেন। নবীনকুমার তার কিশোর বয়স থেকেই সমস্তকিছুকে যাচাই করার মানসিকতা অর্জন করেছিল, তার মনে হয়েছিল ভূকৈলাসের বাড়িতে যে মহাপুরুষ এসেছেন তাকে যাচাই করতে হলে তার নাকের কাছে নস্যি ধরলেই হবে। অর্থাৎ নব্যযুবকেরা ধীরে ধীরে মুক্ত হতে শুরু করেছিল ধর্ম সংক্রান্ত কোনও সংকীর্ণতা কিংবা অন্ধবিশ্বাস থেকে।

রাধানাথ সিকদার ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে প্রথম যৌবনে সর্বোতভাবে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করার নেশায় মেতেছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকেই চাকরিসূত্রে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল দেশের নানা স্থানে।

দীর্ঘকালবাদে যখন তিনি ফিরে আসেন। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে পাওয়া যায় মাত্র ১৯ বছর বয়েসে তিনি Great Trigonometric Survey তে computer হিসাবে ত্রিশ টাকা বেতনে যোগ দিয়েছিলেন, এই কাজে যোগদানের অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রায় ২০ বছর প্রবাসে কাটানোর পরে ১৮৫১ সালে তিনি বদলি নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি দেখলেন তাঁর বন্ধুদের ভাবনা-চিন্তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তিনি দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকে বাংলাভাষা প্রায় ভুলে গেছেন। তাঁরা কিশোর বয়স থেকেই বাংলাকে ঘৃণা করতেন। দেশে ফিরে দেখলেন তাঁর বন্ধুরা নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষাকে আবার নতুন শিখরে প্রতিষ্ঠিত করার আবেগে মেতে উঠেছেন। তাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। কলকাতায় বদলি হবার পর তাঁর জীবনে ঘটেছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গের উচ্চতা মাপতে গিয়ে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। তিনি বহু বছর যাঁর অধীনে কাজ করেছেন সেই জর্জ এভারেস্টের নামে নামকরণ করলেন এই পৃথিবীর চূড়ার। এত বড় একটা কাজের তেমন শিরোপা ইংরেজ সরকার তাঁকে দিল না, কিন্তু তা নিয়ে তিনি কোনরকম হইচই করতে রাজী হলেন না, তিনি মনে করলেন নিজের ভালোর জন্য লড়াই না করে সেই সময়টুকু যদি দেশের কাজে দেওয়া যায় তাহলে এই দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হবে।

উপন্যাসের ‘দ্বিতীয় পর্ব’ -এর সূচনা করেছেন ঔপন্যাসিক উনিশ শতকের অন্যতম হুজুগ বুলবুলির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। নবীনকুমার এইসময়ে পঞ্চদশ বর্ষীয় যুবক। উপন্যাসে তিনি এসেছেন ছাতুবাবুর মাঠে বুলবুলির লড়াই দেখতে। এই ভাবে দেশের মানুষদের অহেতুক কৌতুকে মজতে দেখে নবীনকুমারের মনে হয়েছে “দেশটা ধনী মর্কটে ছেয়ে গ্যেচে, আর সেই সুযোগে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ইংরেজ লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে সব।... বুলবুলি লড়াইয়ের এত নামডাক শুনিচি, তা কিনা এই!”[২০]

নবীনকুমার বুলবুলিদের চড়াদামে কিনে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছেন যা কিছু পুরাতন তার সবটুকুকে। ছাতুবাবুর মাঠের লোকেদের কাছে তা মূল খেলার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেন নতুন যুগের পদধ্বনিতে পুরোনো সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত আবর্জনাকে খাঁচা ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছেন নবীনকুমার এবং দেশের আপামর জনসাধারণ সামিল হয়েছে এই নবযুগকে আহ্বানের যজ্ঞে। নবীনকুমার নিজের বাড়িতে শুরু করেছেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। এর সদস্য ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হরিশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে দেখা যায় মাত্র তেরো বছর বয়সে ১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বিদ্যোসাহিনী সভা'। উপন্যাসে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানার্জনের পথে যখন এগোচ্ছেন নবীনকুমার তখন বিধুশেখর ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি বারবণিতা বিলাস, মদ্যপানের পথে না গিয়ে ধনী সদ্যযুবকের নিষ্পাপ জ্ঞানচর্চাকে। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়াই যখন ছিল তথাকথিত ভাবে জ্ঞানী হওয়ার প্রমাণপত্র, সেই সময়ে নবীনকুমার বুঝেছেন ব্রাহ্ম সমাজের অসারতা। কেশব সেন ও তার অনুগামীদের ইংরেজী ভাষার প্রতি অন্ধ অনুরাগ তাকে বীতরাগী করছে এই ধর্মের প্রতি। কেশব সেনের বিদ্যাচর্চার আসরে বক্তৃতা দেওয়া হয় ইংরেজিতে, ধর্মালোচনাও হয় ইংরেজিতে। এই নির্লজ্জ পরানুকরণ নবীনকুমারের পছন্দ হয় না। অর্থাৎ নবীকুমারকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক যাচাই করেছেন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শকে। দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'ব্রাহ্মধর্ম'এর পরিবর্তনকে।

উপন্যাসে নবীনকুমার বলেছেন, "বাঙালীরা ধর্ম বিষয়ক আলোচনাও করছে ইংরেজিতে, হায়!"[২১]

উপন্যাসে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে লেখক যুগের বৈপরীত্যকে ধরেছেন। সংবাদপত্রের পাতায় যিনি ক্ষুরধার লেখনীতে আগুন জ্বালান, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক বাণী বর্ষণ করেন, তিনিই সংসারে মা ও স্ত্রীর কলহে বীতশ্রদ্ধ এবং প্রবল নারীবিদ্বেষী। প্রচুর মদ্যপান ও বহুনারী সঙ্গ করতে তিনি দ্বিধাহীন। উপন্যাসে নবীনকুমার এই হরিশের কাছ থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করেছেন মদ্যপানের। নারীসঙ্গলিপ্সা তার না থাকলেও জড়িয়ে পড়েছেন এই ঐতিহ্যের বাঁধনে। একদিন পিতার রক্ষিতা কমলাসুন্দরীর ঘরে রাত কাটানোর পর তিনি সম্বিত ফিরে পান। পুরোনো ঐতিহ্যের বাঁধন হয়তো এই ভাবেই ভেঙে পড়ে। বিদ্যাসাগরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নিজের পাপ স্খালন করতে নেমে পড়েন বিশাল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদের যজ্ঞে। শিকড় থেকে রসদ নিয়েই তিনি এগিয়েছেন বিবর্তনের পথে। নবীনকুমারই সময়ের প্রতীক তাই সময়ের দ্বিধা দ্বন্দ্ব তার মধ্যে রয়ে গেছে শেষ দিন পর্যন্ত। ঔপন্যাসিক বলতে চেয়েছেন, ইংরেজ শাসনের দীর্ঘপথ পেরিয়ে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পার করে, নবীনকুমারের পনেরো বছর বয়স পেরিয়ে অর্থাৎ ১৮৫৫ সাল পেরিয়ে বাঙালী শিখেছিল পুরোনো প্রথাকে বিসর্জন দিতে। নারীসঙ্গ ও মদ্যাসক্তির ধারাকে বর্জন করতে।

‘বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, ১৮৫৫) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে প্রবল ঝড় উঠেছিল। বিপক্ষদলের ব্রাহ্মণরা দলে দলে কলম ধরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মত কলমকে তরবারিতে পরিণত করার ক্ষমতা সকলের নেই, তাছাড়া প্রতিপক্ষের পণ্ডিতেরা যখন শাস্ত্রের নানা যুক্তিকে তুলে ধরে তাঁকে পরাস্ত করতে চাইলেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র নিয়ে এসেছিলেন বিবেকের সমর্থন। যুক্তিতে হেরে সনাতন পন্থীরা বেশি উত্তেজিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যাসাগরকে মেরে ফেলার পর্যন্ত পরিকল্পনা

করেছিলেন। সেই সময়ে এদেশের কিছু ভন্ড সমাজ সংস্কারক যারা প্রকৃতপক্ষে নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতার কথা মুখে বলে কিন্তু আসলে নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে দেখেন, তারা বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকে নিয়ে নানা রকম কুরুচিকর আলোচনায় মেতেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের নারীমুক্তির পথিকৃৎ। তাঁর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বা বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টা কিংবা বহুবিবাহ রোধের চেষ্টার পথে প্রচুর বাধা এলেও তিনিই কাণ্ডারী হয়ে ভারতীয় সভ্যতার নৌকাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পৌঁছেছিলেন। একের পর এক ছাত্রপাঠ্য বই, বর্ণপরিচয়ের নানা ভাগ এগিয়ে নিয়ে গেছিল বাঙালীকে সময়ের অন্যপারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বিলেত যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে, কিন্তু খ্রীষ্টান হওয়ার পরেও তাঁর নেটিভ আখ্যা ঘোচেনি। তিনি কলকাতা থেকে মাদ্রাজে চলে যান, সেখানে গিয়ে তার ভাগ্যোন্নতি ঘটেনি, সামান্য শিক্ষকতার চাকরি তাকে নিতে হয়েছিল। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ এই দীর্ঘ আট বছর মাদ্রাজে কাটানোর পর তিনি নিজের পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের আশায় বন্ধু গৌরদাসের প্রচেষ্টায় দেশে ফিরলেন। হিন্দুকলেজে পড়ার সময় থেকেই মধুসূদন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন, তিনি বলতেন বাংলাভাষা ভুলে যাওয়াই ভালো, দীর্ঘদিন মাদ্রাজ প্রবাসের পরে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাই যেন পূর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন তিনি বাংলা প্রায় ভুলে গেছেন, দুই একটি শব্দ যেটুকু মনে রেখেছেন সেটুকুও ভাঙা ভাঙা ও বিকৃত উচ্চারণে পূর্ণ। তিনি যৌবনে যে মানুষদের দেখেছিলেন ইংরেজীর স্তাবকতা করতে, দেশে ফিরে দেখলেন তারা এখন ইংরেজিতে কৃতবিদ্য হলেও কথা বলেন বাংলাতে, দেশের যেসব মানুষেরা একদিন মহা শোরগোলের সঙ্গে পাশ্চাত্যর সমস্ত কিছু ভালো মন্দকে গ্রহণ করেছিলেন তারাই মেতেছেন বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে। প্যারিচাঁদ

মিত্র ও রাধানাথ সিকদার মিলে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সহজবোধ্য পত্রিকা প্রকাশ করছেন, চলিত কথ্য ভাষায় প্যারিচাঁদ মিত্র লিখছেন 'আলালের ঘরের দুলাল'; এসব মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেনে নিতে পারেননি। এইসময়ে তাঁর মনে হয়েছিল সাহিত্য পবিত্র জিনিস, তাকে সাধারণের স্তরে নামিয়ে আনা অনুচিত। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সংস্কৃত থেকে প্রচুর শব্দ আমদানি করে তিনি কুৎসিত বাংলা ভাষার উন্নতি ঘটাবেন এবং তাঁর সৃষ্ট ভাষাই এদেশে চিরস্থায়ী হবে।

উপন্যাসের প্রবাহ পথে ঔপন্যাসিক সচেতন ভাবেই তুলে ধরেছেন দুটি স্রোতের ধারা, একদিকে পুরনো প্রথা সংস্কারে আবদ্ধ জীবন; অন্যদিকে এই সমস্ত থেকে বেরিয়ে আসার সচেতন প্রয়াস। সমাজের সমস্ত পুরনো আগলগুলো ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রয়াস। একদিকে হাটখোলার মল্লিক বাড়ির চণ্ডিকাপ্রসাদ ও কালিকাপ্রসাদ নব যুগের আদব কায়দাকে গ্রহণ করেনি, তারা মদ্যপান ও নারীবিলাসের মধ্যদিয়েই নিজেদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করেছে, ঘরে নিজের স্ত্রীকে ফেলে রেখে বাইরে নারীর প্রতি আসক্তি, মদ্যপান, স্ত্রীপ্রহার প্রভৃতি গুণের সমারোহে এরা ধরে রেখেছে পুরাতন যুগকে। কলকাতার ধনী পরিবারে বহুবিবাহের চল না থাকলেও অন্তঃপুরে এক স্ত্রী মরলে আবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যেতে সময় লাগে না। "কলকাতার ধনী পরিবারের নিয়ম এমনই যে বাবুদের বাইরে যে–কটি রক্ষিতা থাকুক না কেন, বাড়িতে একটি স্ত্রী রাখতেই হবে।... বাবু হয়তো মাসের মধ্যে একদিনও রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করেন না। কিন্তু অন্তঃপুর শূন্য রাখা চলবে না। বাড়িতে একজন কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি না করলে রক্ষিতালয়ে আমোদ ঠিক জমে না।"[২৩] অন্যদিকে এই পরিবারের অন্তঃপুরেই বাসা বেঁধেছে আধুনিক যুগের বীজ। চন্ডিকাপ্রসাদের স্ত্রী দুর্গামণি চন্ডিকা প্রসাদের তৃতীয় পক্ষ। "চন্ডিকাপ্রসাদের... প্রথমা পত্নী মারা গেছে বিবাহের দু বৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয়া পত্নী এ গৃহে এক বছর অবস্থান করেই আত্মঘাতিনী হয়েছিল।

দুর্গামণি কান্নাকাটি কিংবা আত্মঘাতিনী হবার মতন পাত্রীই নয়। সে অতিশয় তেজস্বিনী ও আত্মসম্মানসম্পন্না যুবতী। তার পিত্রালয় ফরাসডাঙ্গায়, সেখানে সে কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখেছিল। তার নরাধম স্বামীকে সে প্রথম দিকে সুপথে আনার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এখন সে পারতপক্ষে তার স্বামীর মুখ দেখতে চায় না।"[২৪] দুর্গামণি তার সময় থেকে বহু বছর এগিয়ে। যে সময়ে নারী অন্তঃপুরচারিনী, স্বামীগতপ্রাণা, স্বামীর মৃত্যুতে তাকে বৈধব্যের আগুনে দগ্ধ হতে হয় পুরো জীবন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে দুর্গামণি বলতে পেরেছে, "তুই তো জানিস, আমি মাচ মাংস ভালোবাসি না। উনি গেলেন কি রইলেন তাতে আমার ভারি এলো গেল।"[২৫] দুর্গামণি নিজের হাতে পত্র লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে, বিধবা বিবাহের প্রতি তার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদ্যাসাগরকে। স্বামীর বহুনারী সংসর্গের কারণে অসুস্থ অবস্থায়ও তাকে ছুঁতে চাননি, কুসুমকুমারী তার পাগল স্বামী অঘোরনাথের মত্ত অবস্থা দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে সেই পাগলের পা জড়িয়ে ধরে ভগবানের কাছে তাকে সুস্থ করে দেওয়ার প্রার্থনা জানালে অঘোরনাথের পায়ের ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়ে কুসুমকুমারীর মাথা ফেটে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গামণি অকপটে বলেছে, "আমার কাছে বিষ আছে, তুই খাওয়াতে পারবি?... ও পাগল আর কোনদিনও ভালো হবে না। তুই বিধবা হ, তোর আমি আবার বিয়ে দেবো। তোর জন্যই তো আমি সাগরকে চিঠি দিয়েচি!... বুকে সাহস আন কুসোম! ভালো করে বাঁচতে শেক। মাতাল, পাগল - এদের সঙ্গে আমরা কেন ঘর করবো? আমাদের সাধ আহ্লাদ নেই!"[২৬] উনিশ শতকে নারী কীভাবে চিরায়ত সংস্কারের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে নারী ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল নিজের জন্য অর্ধেক আকাশ সেই অবস্থানটিকেই এখানে চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক, চিহ্নিত করেছেন সেই এক চিলতে আগুনকে যে আগুন আজ প্রতিটি নারীর হাতের মশালের রূপ নিয়েছে।

যে সময়ে একদিকে নব্যশিক্ষিত যুবসমাজে ধর্মকে নিয়ে সংকীর্ণতা

দূর হচ্ছিল, অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ও ব্রাহ্মণদের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে নির্মাণ করছিলেন নতুন মন্দির। যে সময়ে সমাজ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়কে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় না, সেই সমাজে শূদ্র রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির। বর্ণের চেয়ে বড় কর্ম, বিধানের চেয়ে বড় নিধান সেই সত্যকে করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মদের নিরিশ্বরবাদ, খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের মরশুমে দাঁড়িয়ে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সনাতন হিন্দু পৌত্তলিকতাকে। হিন্দু বাঙালীকে তিনি এগিয়ে দিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে।

যে সময়ে বাঙালী হিন্দু সমাজে একটা নবজাগরণের ঢেউ উঠেছে, সেই সময়ে বাঙালী মুসলমান সমাজ রেখেছিল এই সমস্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের বিভিন্ন চাকরিতে যোগ দেওয়ায় একটা বিশেষ বৃত্তিধারী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, সেই নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মুসলমান ছিল নগণ্য। হিন্দুসমাজ যখন বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষা, বহুবিবাহ রদের আন্দোলনে নেমেছে, মুসলমান নারী সমাজ তখনও অতি কঠিন পর্দাপ্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়নি, হিন্দু সমাজের একাংশ যখন ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসকে আত্মস্থ করছে, মুসলমান সমাজ তখন ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে নবাবী শাসন ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

একদিকে যেমন বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ইয়ংবেঙ্গল দলের শ্রীশচন্দ্র বিয়ে করছে এগারো বছরের বিধবা কালীমতীকে, বারবণিতাকে আবার সুন্দর সুস্থ মঙ্গলময় জীবনে ফিরিয়ে দিতে চাইছে নব্যশিক্ষিত যুবসমাজ, অন্যদিকে সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা বারবনিতা বিলাসের থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁ কলকাতায় আসাতে মুসলমান সমাজ যেমন পরাজয়ের গ্লানিতে মর্মাহত হয়েছে, হিন্দুদের

একাংশ পেয়েছে একটা নতুন হুজুগ, নতুন বিষয় নানা বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য গল্প ফাঁদার জন্য। রাধাকান্ত দেব বিরোধিতা করছেন বিধবাবিবাহ আইনের, রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এসে দাঁড়াতে চাইছেন না বিধবাবিবাহ আসরে। বিধবাবিবাহ নিয়ে নানা রকম রসালো আলোচনা চলছে কোন কোন মহলে। বিধবাবিবাহ নিয়ে নানা রসালো আলোচনা বা মড়া ফেরার হুজুগেই শেষ হয়েছে বাঙালীর শক্তি।

এই চরম বিপরীত স্রোতের মাঝেই বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সম্পন্ন হয়েছে প্রথম বিধবাবিবাহ। ১৭৭৮ শকাব্দ বা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বিবাহ করেছেন বিধবাকন্যা কালীমতীকে। প্রবল ইংরেজি আনুগত্যের যুগেই নবীনকুমার বাংলায় অনুবাদ করছেন কালিদাসের ‘বিক্রমোবর্শী’ নাটক। ইংরেজ শাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করার আশায় সিপাহীরা গর্জে উঠছে বার বার। মঙ্গল পান্ডে ও ঈশ্বরী পান্ডে প্রথম ঘোষণা করেছেন ‘আংরেজের দিন শেষ হয়ে এসেছে।’[২৭] মঙ্গল পান্ডের ফাঁসির পর সিপাহীরা জ্বলে উঠে বৃদ্ধ নবাব বাহাদুর শাহকে আবার স্বাধীন নবাব ঘোষণা করলে সেই সময়ে দিল্লী কিছুদিনের জন্য হয়ে গিয়েছিল স্বাধীন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে নব্যবঙ্গ সমাজ সিপাহীদের সমর্থন করতে পারেনি। মুসলমান সমাজ মনে মনে মোঘল সাম্রাজ্যের পুনর্প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও হিন্দুসমাজ বিশেষত হিন্দু বাঙালী সমাজ সিপাহীদের জয়ের পর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে পারেনি। ডিরোজিও শিষ্যকুলের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সিপাহীদের উত্থানের সমর্থক হলেও প্যাঁরীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদারেরা মনে করেছেন ইংরেজ শাসন আশীর্বাদ স্বরূপ। ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’র পক্ষ থেকেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, “বর্তমান সময়ে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ইংরেজদের অনেক দোষ আছে সত্য, তবে ইংরেজরা এদেশে মোটামুটি

সুশৃঙ্খল, সভ্য শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, তার বদলে শিক্ষাহীন, নীতিহীন সিপাহীদের শাসন চালু হলে দেশে চরম দুর্দিন আসবে, চরম অরাজক অবস্থা চলবে।"[২৮]

উপন্যাসে নবীনকুমার বিদ্যোৎসাহিনী সভার মত মেনে ইংরেজদের গুরুত্ব বুঝে নিলেও রাতে স্বপ্ন দেখেছে, "সেপাইরা ইংরেজদের মারচে, ইংরেজরা ভয়ে হাউ মাউ কচ্ছে, তখন আমার খুব আনন্দ হলো। আমি আনন্দে নাচতে লাগলুম।"[২৯] বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন কার্য সুসম্পন্ন হওয়ার পরে বাঙালী সমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানালো হলেও বাঙালী সমাজ তাদের জন্যই প্রথম অনুধাবন করেছিল স্বাধীনতার অর্থ। নবীনকুমার ভেবেছে সবাই মুখে সেপাইদের দোষারোপ করলেও কিন্তু এই যেকটা মাস দিল্লি স্বাধীন ছেল, ভারতবাসী যেন মনে মনে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। হাজার হোক ইংরেজ আমাদের বিজাতি, তাদের অধীনে পরাধীন হয়ে থাকা আমাদের বুকের উপরে একটা পাষাণভার রাখা। আবার এই একই সময়ে লক্ষ্ণৌ এর নবাব বাদশাহ শাহ জাফর যখন শুনেছেন সিপাহীরা লক্ষ্ণৌ দখল করেছে, লক্ষ্ণৌ আবার স্বাধীন হয়েছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়েও তিনি নিজের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন নি, তিনি ইংরেজ সরকারকে জানিয়ে দিলেন বিদ্রোহীদের খবর। ডুব দিলেন নিজের বিলাসের জীবনে। ইংরেজ সরকার তাকে আশ্রয় দিল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে। যেই মুসলমানেরা নবাবকে আবার সিংহাসনে বসিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা গ্রেপ্তার হলেন ইংরেজদের হাতে। সময় এগিয়েছিল এই বৈপরীত্যকে সঙ্গে নিয়েই।

উপন্যাসে নবীনকুমারের উদ্যোগে 'বিক্রমোবর্শী' নাটকের অভিনয়ের পর, কলকাতার ধনী সমাজে নাটক অভিনয় শুরু হয়েছিল ইংরেজী আদলে। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রিন্স দ্বারকানাথের সুবিখ্যাত বেলগাছিয়া ভিলা ক্রয় করে শুরু করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়। এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদের

অনুরোধ নিয়েই গৌরদাস বসাক হাজির হয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছে। উপন্যাসে মধুসূদন গৌরদাসের এই প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে জানিয়েছেন, “আমি ট্রান্সলেট করব বাংলা থেকে ইংলিশে? বড় ভাষা, গ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ছোট ভাষায় ট্রান্সলেসান হয়। যেমন হয় ইংলিশ থেকে বাংলায়।”[৩০] এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা পার করেই বাঙালী পৌঁছেছিল আত্ম অনুসন্ধানের আঙিনায়। এরপরই মধুসূদন আসতে শুরু করলেন ‘রত্নাবলী’র মহড়ায়, বাংলায় নাটক রচনায় উৎসাহী হয়ে তিনি মহাভারতের কাহিনী ঘেটে লিখে ফেললেন প্রথম বাংলা সার্থক নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’। ইতিহাসের পাতায় সালটা ১৮৫১। বাংলা সাহিত্য তার মধ্যযুগের নাড়ী কেটে বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে ক্ষুরধার হয়ে, মধুসূদনের লেখনী একযোগে একশ বছর এগিয়ে নিয়ে গেল বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীকে।

যে সময় মধুসূদন ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ লিখেছেন সেই সময়কালেই দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ প্রকাশিত হওয়ায় ইংরেজ নীলকর সাহেবদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল নব্যসভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত বাঙালী জাতির সামনে। সার্বিকভাবে উন্নত একটি নাটক না হলেও এই নাটকই নাড়িয়ে দিয়েছিল সেই সময়ের শাসকবর্গকে। পাদ্রী লঙ্ সাহেবের নামে এই নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হলে ইংরেজ সরকার জানতে পারে এই নাটকে ইংরেজদের চরিত্রকে কতটা কালিমালিপ্ত করা হয়েছে, আর এর আসল অনুবাদক মধুসূদনকে না পেয়ে ইংরেজ সরকার পাদ্রী লঙ্ সাহেবকেই দিয়েছিল এক সহস্র মুদ্রা জরিমানা ও একমাস কারাবাস। প্রথমবারের মত কোন ভারতীয় নাট্যকার কিছুটা হলেও নাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজ শাসককে। বোঝা গেয়েছিল ইংরেজ মাত্রই অপ্রতিরোধ্য নয়, বাঙালী এগিয়েছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে।

উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যদুপতি গাঙ্গুলি উপবীত ত্যাগ করে প্রথম বাঙালী সংস্কারবাদী ব্রাহ্মণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। নিজে

ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন বিধবা কায়স্থ সন্তানকে। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের বিধবাকন্যার সঙ্গে বংশগৌরবহীন যদুপতির বিয়ে দিতে রাজী হয়নি মেয়ের পরিবার। পাগল স্বামী অঘোরনাথের পা ধরে তার আরোগ্য কামনা করেছিল যে কুসুমকুমারী, সেই মেয়েটির পুনর্বিবাহ নিয়ে উপন্যাসে দেখানো হয়েছে নতুন আন্দোলন। বিধুশেখরের কন্যা সুহাসিনীর মুখ দিয়ে লেখক উচ্চারণ করেছেন সমস্ত বিধবা নারীর অন্তর্সত্যকে "গঙ্গাদাদা, দেশশুদ্ধ সব দুঃখিনী মেয়েরা তোমায় হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।"[৩১] সমাজ ভেঙেছে যেসব মানুষের জীবন, তারা ভাঙতে শুরু করেছিল সমাজের আগলকে।

বেশ্যা হীরা বুলবুলের পুত্র চন্দ্রনাথও নিজের মানসিক ক্লৈব কাটিয়ে খুঁজে পেয়েছে নিজের পরিচয়কে, শপথ করেছে, "যে মানুষ অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করতে চায়, তার ক্রোধী ও জেদী থাকাই উচিত। দেকো, তোমাদের এই সমাজটার একদিন ঘাড় মটকাবো।"[৩২] সমাজের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তি। কিছুদিন রেলের কর্মচারী হিসেবে কাজ করার পর সেই কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নতুন ভাবে শুরু করেছে। চন্দ্রনাথ ওঝা হিসেবে সমাজের নানা অসংগতিকে খুঁজে পেতে থেকেছে। তথাকথিত সম্মানীয় মানুষদের মুখোশ খুলতে থেকেছে। চন্দ্রনাথের এই আত্ম অনুসন্ধান আসলে ঔপন্যাসিকেরই সময় সন্ধান। উপন্যাসে চন্দ্রনাথের বিবর্তনও আসলে সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনেরই প্রকাশ।

আসলে 'সেই সময়' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়েই 'সময়'কে স্পষ্ট করেছেন। তাদের জীবনসন্ধান ও আত্ম অনুসন্ধানের পথেই তিনি দেখিয়েছেন বাঙালীর মানসিক ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস। নবীনকুমারের মধ্যেকার অসহায়তা, একাকীত্ব আসলে সেই সময়ের প্রতিটি জাগ্রত ও বোধ সম্পন্ন মানুষের সত্য। যে পথে নবীনকুমার নিজেকে সন্ধান করেছে, সমস্তকিছুর দিকে প্রশ্ন

ছুঁড়ে দিয়েছে, সমস্ত সত্যকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে চেয়েছে, চিনতে চেয়েছে নিজেকে, নিজের মধ্যেকার সুপ্ত পুরোনো ঐতিহ্যের ধারাকে চিনতে না পেরে রক্তাক্ত হয়েছে, কিশোর বয়স থেকেই কখনও নাটক, কখনও অভিনয়, কখনও অনুবাদ, সভা, সমিতি, আবার কখনও বাড়ির অন্দরমহলে নারীদের সঙ্গে কৌতুক। রোগাক্রান্ত হয়ে কিছুদিন স্তিমিত থেকে নতুন করে নিজ শক্তির সন্ধান, বন্ধু হরিশচন্দ্রের সান্নিধ্য পেতে মদ্যাসক্তি, সুবালা নামের এক পতিতাকে আশ্রয়দান ও ব্যর্থতা, বিধবা কুসুমকুমারীকে বিবাহ বাসনা, বিদ্যাসাগরের বিরাগভাজন হয়ে সেই সংকল্প পরিত্যাগ, হরিশের মৃত্যুতে তার পত্রিকার সম্পাদনা, চন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ ও তার সঙ্গে থাকা এক পতিতা নারীতে মাতৃমূর্তি দর্শন, বংশগৌরব বিসর্জন দিয়ে পতিতাপল্লীতে পায়ে হেঁটে ঘুরে চন্দ্রনাথের সন্ধান, কেন একই রকম রূপের দুই রমণীর একজন হয় স্নেহময়ী পুতচরিত্রা নবীনকুমারের জননী আর একজন বারনারী! এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান, মাতৃদর্শনের আশায় নদীপথে যাত্রা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, প্রকৃতির মধ্য থেকে মানুষে উত্তরণ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ, শেষে ঘটনাচক্রে দুলালচন্দ্রের পিতা যিনি স্ত্রী সন্তান হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদ, যার পরিচয় জানতে পারেনি দুলালচন্দ্রও, সেই উন্মাদের কামড়ে বুকে ক্ষত নিয়ে ফিরে আসা, সেই ক্ষত বুকে নিয়ে কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, চন্দ্রনাথ ও সেই রমণীকে খুঁজে পাওয়া, চন্দ্রনাথের কাছে চরম আঘাত, বুকের ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতে মৃত্যু, মৃত্যু শয্যায় বেঁচে থাকার আশা প্রকাশ "আমার অনেক কাজ, আরও অন্তত তিরিশটা বছর বাঁচতে হবে, গুপুস গুপুস করে একশোটা টোপ পড়বে, নতুন সেঞ্চুরি আসবে, তখন দেখবে সাহেবরাও ফরফরিয়ে বাংলায় কতা বলচে–"[৩৩]। "একদিন আমি থাকব না, তুমি থাকবে না, অন্য মানুষ আসবে, পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে-"[৩৪] এই আশা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, এই সবই সময়ের বিবর্তনের ছবি। বাঙালী সমাজ সংস্কৃতির এগিয়ে চলার যে ইতিহাস সেই ইতিহাসের পথে বাঙালী এইভাবেই আত্ম অনুসন্ধান চালিয়েছে, নিজের

সত্তার সঙ্গে সংঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে, খুঁজে পেয়েছে নতুন পথ, এগিয়েছে বিবর্তনের পথে, আত্ম আবিষ্কারের পথে হয়েছে উদ্বর্তিত, আত্মদর্শনের পথেই হয়েছে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা।

তথ্যসূত্রঃ

১। 'লেখকের কথা' অংশ, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২। 'লেখকের কথা', সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩। পৃ ২২, কথা বলেছেন প্রদীপ চৌধুরী, অতলান্তিক আমেরিকা, ১৯৮৩, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৪। পৃ ৭০৪, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৫। পৃ ২২, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৬। পৃ ৬৯, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা লি, কলকাতা ০৯

৭। পৃ. ২৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৮। পৃ ৪০, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৯। পৃ ৫৮-৫৯, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

১০। পৃ ২৯, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১১। পৃ ৩৪, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১২। পৃ ৩৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৩। পৃ ২৩, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৪। পৃ ২৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৫। পৃ ২৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৬। পৃ ৬৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৭। পৃ ৫৯১, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৮। পৃ ১৫৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৯। পৃ ১৫৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২০। পৃ ৩০৬, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২১। পৃ ৩৪৬, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২২। পৃ ৩৩৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৩। পৃ ৩৩৭, ৩৩৮ সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৪। পৃ ৩৩৮, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৫। পৃ ৩৪১, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৬। পৃ ৩৪৬ সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৭। পৃ ৪০২, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৮। পৃ ৪১৬, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৯। পৃ ৪১৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩০। পৃ ৪৫৫, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩১। পৃ ৫৬৯, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩২। পৃ ৫৬২, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩৩। পৃ ৬৯৭, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৩৪। পৃ ৬৯৭, ৬৯৮, সেই সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ, কলকাতা ০৯

‘প্রথম আলো’ : আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস সন্ধান

‘প্রথম আলো’ উপন্যাসটির প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে। দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে। প্রথম পর্বের উৎসর্গ পত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে’, এবং দ্বিতীয় পর্বের উৎসর্গ পত্রে খুব ব্যঞ্জনাবহ ভাবে লিখেছেন, ‘ভানু, রবি, রবিবাবু এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে’। অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই বুঝে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথই এই উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দু। বাংলার এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের বিবর্তন তথা রবীন্দ্রনাথের আত্ম আবিস্কারের পথেই সময়ের স্বরূপকে খুঁজেছেন তিনি। উপন্যাসটির সঙ্গে যুক্ত করেছেন ‘লেখকের কথা’ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাঁর বহুপাঠের পরিচয়বাহী দীর্ঘ একটি ‘গ্রন্থপঞ্জি’। এই ‘লেখকের কথা’ অংশে তিনি জানিয়েছেন, “ ‘সেই সময়’ উপন্যাসের মূল উপজীব্য ছিল সমাজ সংস্কার, তাকে কেন্দ্র করে নানাবিধ দ্বন্দ্ব, বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদিকাল, শিক্ষা বিস্তার ও একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে স্থান দেয়নি। বরং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভয় পেয়েছে, তা যে এক ধরনের বিপ্লব তা বোঝেও নি, সমর্থনও করেনি। পূর্ববর্তী দীর্ঘকালের অরাজকতার বদলে ইংরেজরা যে শক্তিশালী স্থায়ী সরকার গড়েছিল, বরং তাতেই স্বস্তি পেয়েছে। কিছুটা মুক্ত চিন্তার অধিকারী সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী মন দিয়েছে সংস্কৃতি চর্চায়। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেই সেই মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস এদেশের অনেকের কাছে পৌঁছে যায়। আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে ইংরেজের মার খাওয়া

এবং জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়ের সংবাদে এদেশেও কিছু মানুষের মনে এই চেতনা জাগে যে, ইউরোপীয় শক্তিগুলি অপরাজেয় সর্বশক্তিমান নয়। 'প্রথম আলো' উপন্যাসের সময়সীমায় জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষই প্রধান ঘটনা। তৎকালীন দেশের অবস্থা বোঝাবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলন, অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চা, থিয়েটারের ভূমিকা, কবি রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর, জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে তরুণদের মতবিরোধ, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগরোগ, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা সৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে আনতে হয়েছে।... 'প্রথম আলো' আমার পূর্ববর্তী উপন্যাস 'সেই সময়'-এর পরবর্তী খন্ড নয়, কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় মিল আছে।'’[১] উপন্যাস নিয়ে এই বিস্তীর্ণ আলোচনা সূত্রে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তাঁর জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টিকে। 'প্রথম আলো' -এর বিস্তীর্ণ পরিসরে তিনি ইতিহাসকে রেখেছেন; সেই ইতিহাসের পরিসরেই ডানা মেলেছেন কল্পনার সীমায়। সমকালকে তুলে এনেছেন নিখুঁত বাস্তবতায়। এই উপন্যাসটিরও মূল নায়ক সময়। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সময়কালে এই ঘটনা প্রবাহ বিস্তৃত।

এই সময়কালে হঠাৎ কিছু মানুষ যেন ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করেছে দেশ নামের একটা ভাবসত্তাকে, অনুভব করেছেন পরাধীনতার গ্লানি। 'প্রথম আলো'র ১১৩৪ পৃষ্ঠার পরিধিতে ঔপন্যাসিক বিস্তার করেছেন উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিধিরও। 'সেই সময়' -এর কলকাতা কেন্দ্রিকতা এখানে নেই। এই উপন্যাসে সূচনা পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায়, তারপর সমগ্র ভারতে। মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও বিশালতা আছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসে যে সময়কে জীবন্ত করেছেন, বাংলায় তখন এসেছেন একের পর এক মহামানব। ইংরেজ অধিকৃত বাংলাদেশ তখন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে নিজ শক্তিকে। দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাঙালীর

আত্মসচেতনতা ও সমাজসচেতনতার সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছিল প্রবল রাজনীতি সচেতনতা। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যুগসূর্য রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে এসেছেন প্রধান বিন্দুতে। তাঁর পাশে দাঁড় করিয়েছেন বিবেকানন্দকে। এই দুই সূর্য কিরণে আলোকিত হয়েছে বাংলার আকাশ। সময়কে ফুটিয়ে তুলতে তিনি এনেছেন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিপ্লববাদ। এই অনুষঙ্গেই এনেছেন তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তাধারা, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের ভূমিকা, কংগ্রেসের প্রবীণ-নবীন বিরোধ, দুর্ভিক্ষ-মহামারি, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও ভারতবাসীর প্রবল বিরোধিতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। কাল্পনিক বৃত্তেও আছে ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকা ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্র। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের পাশে উঠে এসেছে রাজার অবৈধ পুত্র ভরত। ভরত-ভূমিসুতা বৃত্ত উপন্যাসের গতিময়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, চিনিয়েছে সময়ের বিবর্তনকে। 'প্রথম আলো' -তে উঠে এসেছে উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত, আত্মসচেতন ও সমাজসচেতন বাঙালীর বিশ শতকের প্রথম দশকে জাতীয়তা বোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস।

উপন্যাসের ভৌগোলিক মানচিত্রের বিস্তার ঘটিয়ে এদেশে প্রথম আলো কীভাবে আলোকিত করেছিল সমকালের বোধ ও চেতনাকে তারই স্বরূপ সন্ধান করেছেন। 'সেই সময়' -এর পরস্পর বিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বাঙালী সমাজ 'প্রথম আলো'র সময় পরিসরে এসেও। উপন্যাসের সূচনাতেই ঔপন্যাসিক পাঠককে নিয়ে গেছেন ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরাতে। প্রথম আলোয় আলোকিত কিছু চরিত্র তুলে এনে সময়ের সন্ধান করতে চেয়েছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের শাসনে ত্রিপুরায় ব্রিটিশ ভারতীয় আধুনিকতা প্রবেশ করেছে। যদিও এই আধুনিকতা সরিয়ে দিতে পারেনি পুরোনো যা কিছু আছে তাঁর সমস্তটাকেই। বীরচন্দ্র মাণিক্য -এর পরিচয় দিয়ে গিয়ে ঔপন্যাসিক

জানিয়েছেন, "...মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। ইংরেজ শাসিত ভারতের মধ্যেও তিনি এক স্বাধীন নরপতি।... মহারাজ বয়সের বিচারে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছলেও তাঁর অঙ্গসঞ্চালন যুবকোচিত। কিছুক্ষণ আগেই তিনি দীর্ঘপথ অশ্বচালনা করে রাজধানীতে ফিরেছেন। বংশের প্রথা অনুযায়ী তিনি নবমীর রাত্রিতে উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন। মহাভোজের সময় উপস্থিত থাকতে হবে বলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফিরেছেন। ...এই রাজ্যের প্রজারা সবাই আদিবাসী, বহু উপজাতিতে বিভক্ত, তাদের ভাষাও বিভিন্ন। ...রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রিয় ভাষা বাংলা, অনেকদিন ধরে এ রাজ্যের সরকারি ভাষাও বাংলা। হালে কিছু কিছু রাজকর্মচারী দু' পাতা ইংরিজি শিখে দরবারের কাজে ইংরিজি প্রচলনের চেষ্টা করেছিল, মহারাজ ধমক দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করেছেন। ...মহারাজ ইংরেজের সংস্পর্শ থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকতে চান। অবশ্য একটি বিলিতি দ্রব্যের প্রতি মহারাজের খুব আসক্তি। ক্যামেরা!"[২] যে রাজ্যে রাজা ছবি তুলতে উৎসাহী, সেই রাজ্যে প্রজারা ছবি কথাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অর্থাৎ খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভোরের আলো পৌঁছতে পারেনি সাবঅলর্টানের জীর্ণ কুটিরে তা শুধুই আলোকিত করেছে উচ্চবিত্তের কাঁচ ঘেরা ঘরকে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, "ছবি কাকে বলে তা এদেশের মানুষ জানবে কী করে, অনেকে যে নিজের মুখখানাই স্পষ্ট করে কখনও দেখেনি।... প্রতিদিনের আহার্য যেখানে অনিশ্চিত, শরীর ঢাকার জন্য একটুকরো বস্ত্র মাত্র সম্বল, সেই সব অরণ্য কুটিরে দর্পণের বিলাসিতার প্রশ্নই নেই। মেয়েরা মুখ দেখে স্থির জলে।"[৩] প্রথম আলোয় আলোকিত অবশ্যই রাজা স্বয়ং। প্রান্তিক মানুষ এই আলোক সীমানার সম্পূর্ণই বাইরে।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য -এর রাজ্যে বিজয়া দশমীর দিন হাসাম ভোজনের একটি দিনই সকল উপজাতিকে এক জায়গায় মেলাতে চান, সকলের মাঝখানে আহার করতে বসে বুঝিয়ে দিতে চান তার চোখে

প্রজাদের মধ্যে কোন জাতি বৈষম্য নেই। ত্রিপুরার রাজকার্যে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকতা প্রবর্তনের জন্য মহারাজ কলকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এনেছেন, শশিভূষণ সিংহ নামে এক নব্যশিক্ষিত যুবক তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রাজকুমারদের শিক্ষক। হাসাম ভোজের সভায় উপস্থিত থেকে তিনি দলে দলে প্রজাদের আগমন প্রত্যক্ষ করছেন। রাজপুত্রদের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত কলকাতার নব্যশিক্ষিত যুবক শশিভূষণ সিংহ সেই সমবেত জনতার মাঝে একটি সাদা চামড়ার ইউরোপীয়কে দেখে মন্তব্য করেছেন, "আশ্চর্য! আশ্চর্য! ...মহারাজ, একপাল মেষের মধ্যে একটি ব্যঘ্র শাবক দেখলে আপনি অবাক হবেন না? আমি যে তাই দেখছি।"[৪] উপন্যাস আরও কিছুদূর এগোলেই জানা যায় শশিভূষণ ইংরেজ শাসনাধীনে থাকতে না চেয়েই এই প্রান্তিক ক্ষুদ্র রাজ্যে এসেছেন, ইংরেজ জাতির প্রতি জাতক্রোধেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করেছেন, সেই মানুষের মুখে প্রথম উচ্চারিত এই বাক্য পাঠককে হতবাক করেছে। আসলে নব্যশিক্ষিত কলকাতার যুবসমাজ বিশ শতকের প্রথম পর্বে পারেনি ঔপনিবেশিক মনোভাব থেকে মুক্ত হতে। সাদা চামড়া তার কাছে শক্তির প্রতীক। ঔপন্যাসিক এখানে দেখাতে চেয়েছেন, আমাদের আজকের এই উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে দাঁড়িয়েও ভারতীয় বিশেষত বাঙালী যে পারেনি এই বিজাতিপ্রেমের বীজকে ছাটাই করতে, তার বীজ রোপণ হয়েছিল সেই সময় থেকেই। কিংবা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ভাবা যায়, শশিভূষণের কাছে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সম্পর্ক বাঘ ও মেশ শাবকের মত খাদ্য-খাদকের। সেই অর্থেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন। মহারাজ শশিভূষণের এই কথা সমর্থন না করে বলেছেন, "সিংহমশাই, আমি আমার প্রজাদের মেষের পাল বলে মনে করি না।"[৫] শশিভূষণও নিজের উপমাকে বদলে ফেলে বলেছেন, "ফুলের বাগানে একটি বিষাক্ত সাপ।"[৬] অর্থাৎ দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নবজাগ্রত বাঙালী জাতি রাজনৈতিক চেতনায় জাগ্রত হয়েছিল। শশিভূষণের উপমা প্রমাণ করে একদিকে বাঙালী হয়েছিল ইংরেজ জাতির শক্তি ও কর্মদক্ষতা

সম্পর্কে সচেতন, আবার পরক্ষণেই সে সচেতন তাদের শাষণ ও শোষণের মনোভাব সম্পর্কে।

উপন্যাসে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য নতুন সভ্যতার আলোতে আলোকিত হয়ে জাতি বৈষম্য মানেন না, প্রজাদের ওপর অকারণ নির্যাতন করেন না, তিনি নিজে কবি ও কাব্যপ্রেমী, ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণবপদ সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ, বাংলা ও সংস্কৃতের নানা তথ্য তিনি শশিভূষণের কাছ থেকে জেনে নেন, ক্যামেরা সম্পর্কিত নানা তথ্যও শশিভূষণের থেকে জেনে নিতে দ্বিধা করেন না, নিজ প্রজাদের সঙ্গে একাসনে ভোজনেও দ্বিধা করেন না, আগরতলায় ভালো বইয়ের দোকান খুলতে তিনি আগ্রহী, উচ্চাঙ্গের গান বাজনা, কাব্যরস, চিত্রশিল্পেও প্রবল আগ্রহী। এই রাজাই আবার নিজের রাজ্যে সতীদাহ প্রথা রদ করতে দ্বিধান্বিত, রাজ্যে 'তিতুন প্রথা' প্রচলিত, দাস প্রথা সদ্য নিষিদ্ধ হয়েছে রাধারমণের উদ্যোগে। যদিও পঞ্চানন্দ নামে এক পার্শ্বচরের কথায় দাসীকে নগ্ন করে পাশ্চাত্য প্রথায় তার ছবি আঁকতে দ্বিধাহীন, এবং বহুনারী সঙ্গ করতেও সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। মহাদেবী ভানুমতী রাজ্যের পাটরাণী। এই বাল্যসঙ্গিনীর সঙ্গে হৃদয় সম্পর্কে যুক্ত হয়েও নিয়মিত নতুন সুন্দরী ভোগে তিনি অত্যসক্ত। নিজ সন্তান সমরেন্দ্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার ইচ্ছায় ভানুমতীও বালিকা মনোমোহিনীকে ভেট দিয়ে মহারাজকে খুশি রাখতে চান। তার উক্তি, "সত্যি করে বলুন তো, ওকে আপনার পছন্দ হয়নি? সেই জন্যই তো ওকে আমি পাছাড়া পরে আসতে বলেছিলাম। দিব্যি মেয়ে। লক্ষ্মী মেয়ে। আমি ওকে আপনার হাতে তুলে দেব, আপনি ওকে নিয়ে আনন্দ করুন। ওই গতরখাগী, আবাগীর বেটী রাজেশ্বরীর কাছে আপনাকে আর যেতে হবে না।"[৭] শ্যামা দাসী নগ্ন অবস্থায় মানাঘরে দীর্ঘক্ষণ কাটানোর ঘটনা সহ্য করতে না পেরে মহারাণী ভানুমতীর মৃত্যু হলেও মহারাজ তার তীব্র অভিমান বুঝতে পারেননি। তার মনে হয়েছে

যুবরাজ হিসেবে রাধাকিশোরের নাম ঘোষণা করাতেই তিনি অভিমানে আত্মঘাতিনী হয়েছেন।

দীর্ঘ মৃত্যুশোক পালনের পর তিনি কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের ‘ভগ্নহৃদয়’ -এর কয়েক লাইন শুনে নিজের মন শান্ত করেছেন। মহারাণীর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনোমোহিনীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন কিংবা হয়ত নিজের লালসাকেই রাণীর নামে চরিতার্থ করার পথে এগিয়েছেন। এই বিবাহের জন্য নতুন মহল পেতে তাঁর দুই কন্যার জননী রাণী করেণুকাকে তার মহল ছেড়ে দিতে বলতেও দ্বিধা করেননি। রাণীকে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গ দিয়ে ধন্য করে নির্বাসনে পাঠানোকেই নিজের আধুনিক মহানুভবতা ভেবে আত্মগরিমায় গরিমাণ্বিত হয়েছেন। বীরচন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমোহিনী নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, সে কবিতা রচনাও করে। যদিও তার কবিতা মুদ্রিত হবার অনুমতি পায় না, ‘‘কিন্তু অন্তঃপুরের এক বধূর কবিতা মুদ্রিত হলে, কেরানি, ভবঘুরে, সাধারণ পাঁচপেঁচি ধরণের লোকও পড়ে ফেলবে, এ যে অকল্পনীয় ব্যাপার। বে-আব্রু হতে বাকি থাকল কি! অনঙ্গমোহিনীর কবিতা এখানকার অতি ঘনিষ্ঠ দু’চারজনই শুধু পড়ে, তার বাবা একজন উৎসাহী সমঝদার।’’[৮] ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, সময়ের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও নারী পুরুষের ভোগের সামগ্রী। নারীকে মানুষের মর্যাদা দেবার আলো আলোকিত করেনি প্রথম আলোয় আলোকিত পুরুষের মনকে।

‘প্রথম আলো’র কাল্পনিক বৃত্তে অন্যতম চরিত্র শশিভূষণ যাকে কেন্দ্র করেই ভরত-ভূমিসূতার বৃত্ত এগিয়েছে। উপন্যাসে শশিভূষণ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক। শশিভূষণ তার পৈতৃক সম্পত্তি বা বাংলায় কোনো চাকরি নিয়ে দিন কাটানোর পরিবর্তে বেছে নিয়েছিল ত্রিপুরার স্বজন বন্ধুহীন জীবন। এই জীবন বেছে নেওয়ার পেছনেও রয়েছে ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষের ইতিহাস। একবার মুর্শিদাবাদের কান্দি অঞ্চলে শশিভূষণের পিতার ছোটো জমিদারি ছিল, সেখানে হরিণ শিকার

করতে গিয়ে শশিভূষণ দুজন ইংরেজ শিকারীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। ইংরেজরা শশিভূষণের গুলি করা হরিণকে নিজের দাবি করে সেটি ছিনিয়ে নিয়ে শশিভূষণকে ডাকাত বলে ঘোষণা করেছিল। বহরমপুরের পুলিশ কর্তা হ্যামিল্টন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবার সময় লাথি কষিয়েছিল শশিভূষণের মুখে। অপমানিত হয়ে ফিরে এসে দাদাদের এই চরম অপমানের কথা জানালে শশিভূষণের দাদাদের থেকে শুরু করে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই অপমানের প্রতিকার করতে পারেনি। হ্যামিল্টনের বিরুদ্ধে মামলা করেও কোনো সুরাহা হয়নি। কলকাতার কোনো কাগজওয়ালা এই ঘটনা ছাপাতে রাজি হয়নি। তার দাদারা পুলিশ সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করে টেকা যাবে না ভেবে সেই সুন্দর তালুকটিই বেঁচে দিয়েছিল। উপন্যাসে শশিভূষণের উপলব্ধি "এত কাপুরুষ, এত মেরুদণ্ডহীন যদি কোনো জাতি হয়ে যায়, সে জাত কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে?"[৯] এই উপলব্ধির আলোকেই শুরু হয়েছে প্রথম আলোর যাত্রা।

ত্রিপুরায় শশীভূষণের পাঠশালায় ছাত্র পাওয়া দুষ্কর। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, "শশিভূষণের পাঠশালাটি বড় বিচিত্র। মাস্টার ঠিক আছে, কিন্তু ছাত্রদের কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। প্রতিদিন সকালে দোকান খোলার মত তিনি একটি টেবিলে বইপত্র, দোয়াত-কলম সাজিয়ে বসে থাকেন সকালবেলা, প্রায় দিনই কোনও ছাত্র আসে না। তিনি রাজকুমারদের শিক্ষক, শুধুমাত্র রাজকুমারগণ ছাড়া অন্য কারুর এই পাঠশালায় প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু রাজকুমারদের পড়াশোনার কোন গরজ নেই, কেউ তাড়না করে তাদের পাঠায়ও না।"[১০] উপন্যাসে রাজপুত্ররা শশিভূষণের শিক্ষায় উৎসাহী না হলেও, রাজার রক্ষিতার সন্তান ভরত লেখাপড়ায় উদ্যোগী। রাজপুত্র হয়েও সে অবাঞ্ছিত, রাজপরিবারে 'কাছুয়ার ছেলে', তাই অপাঙ্‌ক্তেয়। শশিভূষণ অবাক হয়ে ভেবেছেন, "শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তেরও তো মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়নি, মিলন হয়েছিল

গান্ধর্ব মতে। কিন্তু শকুন্তলার সন্তান ভরতকে তো কেউ জারজ বলে না। ...এই ভরতই বা রাজকুমারের স্বীকৃতি পাবে না কেন?”[১১] শশিভূষণের চেষ্টায় জারজ রাজপুত্র ভরত মহারাজের কাছ থেকে শশিভূষণের পাঠশালায় পড়ার অনুমতি পেয়ে যায়। মহারাজের অনুমতি পাওয়ার পর, মহারাজের একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষ ভরতকে ভৃত্যমহল থেকে সরিয়ে আনেন, তাকে দুই জোড়া পরিধেয় বস্ত্র ও মাসিক দশ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন।

শশিভূষণ শুধু ভরতের জীবনেই বিরাট পরিবর্তন আনলেন তা নয়, তার মনোজগতেও তিনি নিয়ে এলেন বিরাট আলোড়ন। “হঠাৎ যেন এই পৃথিবীটা রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে তার কাছে। ...তার বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণায় প্রবল নাড়া লেগেছে। শশিভূষণ তো বই পড়ান না, আরও অনেক কথা বলেন। এই পৃথিবীর নীচে পাতাল কিংবা নরক নেই, আকাশেও কোথাও স্বর্গ নেই। স্বর্গ আর নরক আছে শুধু মানুষের মনে। মানুষই ইচ্ছে করলে নিজের মনটাকে নরক থেকে স্বর্গে রূপান্তরিত করতে পারে। ...শশিভূষণ আরও বলেছেন যে কালী, দূর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্তিগুলি শুধু পুতুল। ঠাকুর দেবতা বলে কিছুই নেই। এই বিশ্বের স্রষ্টা শুধু ঈশ্বর, তিনি নিরাকার, তার বউ ছেলেমেয়ে থাকতে পারেনা।”[১২] শশিভূষণের এই শিক্ষা ভরতের ভাবনার জগৎ পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। অন্ধকারময় জীবনকে ছাড়িয়ে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল আলোর দিকে। সময়ের সন্ধান করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন চরিত্রগুলো সময়ের প্রতীক। আসলে ভরতের মত ভারতবাসীদের জীবন ছিল মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে অন্ধকারের অন্ধকূপে। শশিভূষণ রূপী নবজাগ্রত ইউরোপ ভাবিয়ে তুলেছিল ভারতীয়দের। নাড়িয়ে দিয়েছিল বহুযুগ লালিত সংস্কার ও বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। যদিও এই আলোর পথে যাত্রা সহজ হয়নি। পুরোনো নির্মোক সম্পূর্ণ ত্যাগ করা একদিনের কাজ নয়। নতুন ও

পুরাতনের মেলবন্ধন একদিনে হয়নি, তাঁর জন্য উনিশ শতক থেকে যাত্রা শুরু হলেও এক শতাব্দী পেরিয়েও তার সার্বিক উদ্বর্তন ঘটেনি।

উপন্যাসে ভরতের এই আলোর পথে যাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়াল মহারাজের জন্য মনোনীতা কিশোরী মনোমোহিনী। প্রকৃতির অনিবার্য আকর্ষণে কিশোরী ভরতের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকলে একদিন ভরত রাতের অন্ধকারে আততায়ীদের হাতে আটক হল, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে তাকে ঘাতকেরা গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে এল। নির্মম ভাবে সমাপ্ত হল তার নব রাজকুমারের জীবন। আসলে আধুনিকতার পথে যাত্রাও ভারতীয় সমাজের কাছে এই রকমই নানা ঘাত প্রতিঘাত -এর মধ্য দিয়েই গেছে। নতুন ভাবনা, নতুন বোধ, নতুন জীবন দর্শনের ভূমিতে পৌঁছনোর পথও ছিল এমনই সঙ্কটপূর্ণ। শশিভূষণ ও রাধারণ মিত্র কলকাতা যাবার পথে মেঘনা নদীর তীরে এক গঞ্জে এসে থামলেন। স্থলপথের যাত্রা সমাপ্ত করে এখান থেকেই শুরু হবে নৌকাযাত্রা। নৌকা তৈরী রয়েছে, শুধুমাত্র কিছু রসদ কিনে তারা রওনা দেবেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। শশিভূষণ চুরুট কেনার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করছিলেন, এমন সময় তিনি উন্মত্তপ্রায় ভরতকে দেখতে পেলেন। যে ছেলেটিকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পেয়েছিল তারই চেষ্টায়, সেই ছেলেটির এমন অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ও বেদনার্ত হলেন। যদিও রাধারমণ ভরতের এই অবস্থান্তর দেখে অবাক হলেন না। তিনি ভরতকে তাদের নৌকাতে নিতেও রাজি হলেন না। শশিভূষণকে তিনি জানালেন, “ত্রিপুরার সঙ্গে ওর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। ভরত নিরুদিষ্ট হবার পর অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। এ খবর মহারাজের কানেও যায়। তিনি একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিলেন।... কুকুরের পেটে কি আর ঘি সহ্য হয়! তখনই আমি বুঝেছিলাম, ভরতের দিন ফুরিয়েছে।”[১৩] রাধারমণ আরও জানিয়েছেন মনোমোহিনীর কারণেই ভরতের এই বিপর্যয়। “মহারাজ নিজের সন্তান হলেও যাকে

কুকুরের মত বিদায় করতে চেয়েছেন, আমরা রাজকর্মচারী হয়ে তাকে গ্রহণ করি কীভাবে?”[১৪]

নব্যশিক্ষিত যুবক শশিভূষণ ভরতকে এভাবে ত্যাগ করতে পারেননি। আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ মানবতা বোধের জাগরণ। তিনি রাধারমণ মিত্রের সঙ্গ ত্যাগ করে ভরতকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছেন। শশিভূষণের হাত ধরে ভরতের জীবনে এসেছে এক নতুন অধ্যায়, সেই সঙ্গে উপন্যাসেও। ভারতীয় সমাজ নব্য আধুনিকতার হাত ধরে পা রেখেছে নতুন আলোর পথে। ‘প্রথম আলো’র গন্ডি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে এসে পৌঁছেছে ভারতের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার বুকে। যেই কলকাতা শহর উনিশ শতক ও বিশ শতকের সংযোগ স্থলে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে কেঁপেছে নিত্য নতুন ভাবনা, নিত্য নতুন বোধ, কিংবা নিত্য নতুন জীবন দর্শন নিয়ে। মেতে উঠছে নিত্য নতুন সৃষ্টিতে। জেগে উঠেছে রাজনীতি চেতনার ভূমিতে।

নবম পরিচ্ছেদে ভরতকে কেন্দ্র করে উপন্যাস প্রবেশ করেছে কলকাতা শহরে। ঔপন্যাসিকের বিবরণে সমকালীন কলকাতাও উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিক ভাবেই, “শশিভূষণদের ভবানীপুরের এই বাড়িটি দু’মহলা। একান্নবর্তী পরিবার, তার দুই দাদা জমিদারি বিক্রি করে দিয়ে পাটের ব্যবসা করেন, ইদানিং বিদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট রপ্তানি হচ্ছে বলে ব্যবসা বেশ ভালোই জমে উঠেছে। মধ্যম ভ্রাতা মণিভূষণ একজন আর্মেনিয়ানের সঙ্গে অংশীদারত্বে নৈহাটি অঞ্চলে একটি চটকল খোলারও উদ্যোগ নিয়েছেন।”[১৫] শশিভূষণের বৌদিদের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সমকালীন অন্দরমহলের চিত্র। “দুই বৌদি অনেকদিন পরে এই খামখেয়ালি দেবরটিকে পেয়ে খাতির যত্ন করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন। ...দুপুরবেলা ষোড়শ ব্যঞ্জনের ভোজনপর্ব সেরে শশিভূষণ বাইরে বেরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময়ে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া কৃষ্ণভামিনী এসে দাঁড়ালেন দরজার ধারে। হাতে একটা রূপোর

রেকাবিতে দু খিলি পান। তার নিজের দুগালও পানে ঠাসা, ঠোঁট দুটি টুসটুসে লাল। ...কোনো রকম ভূমিকা না করেই তিনি বললেন, হ্যাঁ গা, তুমি কি আর বিয়ে থাওয়া করবে না? লোকের কাছে যে মুখ দেখাতে পারি না। শশিভূষণ অবাক হয়ে বললেন, সে কি গো, বউদিদিমণি, আমি বিয়ে করছি না বলে তোমরা মুখ দেখাতে পারবে না কেন? ...শোনো তোমার কোনো আপত্তি শুনছি না। আমার এক পিসতুতো বোন আছে, তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করছি, একবার দেখ, দেখলেই তোমার পছন্দ হবে, একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা! শশিভূষণ হাসলেন। আগের সন্ধ্যেবেলা একটু ফাঁকা পেয়ে মণিভূষণের স্ত্রী সুহাসিনীও তার গ্রাম সম্পর্কে কোনও এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে শশিভূষণের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। এমনকি, এ বাড়িতে গ্রাম সম্পর্কে এক আশ্রিতা পিসি আছেন, তিনিও পাত্রী ঠিক করে ফেলেছেন তার জন্য। সুস্থ শরীর, উপার্জনশীল কোনও পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে না পারলে মেয়েরা স্বস্তি বোধ করে না। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রত্যেকেরই পাত্রী একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমার মতন।"[১৬] গৃহকেন্দ্রিক জীবনে মেয়েরা দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও প্রথম আলোর কিরণ পায়নি। তারা রয়ে গেছে মধ্যযুগীয় রীতিনীতিতেই। এই যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আপামর বাঙালী পরিবারে যেখানে নারী গৃহকেন্দ্রিক, ঠাকুর পরিবারকে কেন্দ্র করে সেখানে নারী জীবনের মানচিত্রের বদল শুরু হয়েছিল। প্রথম আলোর কিরণে তারা আলোকিত হতে শুরু করেছিল।

উপন্যাসে কলকাতায় ভরতকে সুস্থ করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করার পরিস্থিতিতে শশিভূষণ নিজেই ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শশিভূষণ অধিকাংশ সময়েই আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকেন, কোনও কিছুতেই সাড়া দেন না। মাঝে মাঝে তিনি সজাগ হন, দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, পূর্ণ চেতনা ফিরে আসে। তখন তিনি অনুভব করেন, তাঁর যেন শরীর নেই, শুধু মন আছে। এই পরিস্থিতিতেই শশিভূষণের স্বপ্নে মাতৃদর্শন হল।

মায়ের স্বপ্নে বলে দেওয়া বেল পোড়ার শরবত খেয়ে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করলেন। ‘সেই সময়’ উপন্যাসে নবীনকুমারের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল এই মাতৃদর্শন ও মৃতা মায়ের প্রতি প্রবল আকূতি। উপন্যাসের এই মাতৃদর্শন প্রকৃতপক্ষে শিকড় সন্ধান। সময় যখন নিত্য নতুন ভাবনা, নিত্য নতুন বোধের আলোতে আলোকিত করছে নব্যশিক্ষিত সমাজকে, তখন তারা সচেতন হয়েছে নিজের শিকড়ের প্রতি।

অসুস্থ শশিভূষণ ভরতের খোঁজ নিতে সক্ষম না হওয়ায় ভরত ভোগ করেছে চরম যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আদিম ক্ষুধার কষ্ট ভরতের গড়ে তোলা নতুন সত্তাকে ভেঙে দিয়েছে। আত্মসচেতনতার পথে এগোনো ত্রিপুরার ‘জারজ’ রাজকুমার গরু ছাগলের খাদ্য তেঁতুল পাতা চিবিয়েছে বাধ্য হয়ে। শশিভূষণের প্রতি প্রবল অভিমানে তার বুক ভরে উঠেছে। যদিও এই যন্ত্রণা দীর্ঘদিন সহ্য করতে হয়নি ভরতকে। শশিভূষণ সুস্থ হতেই ভরতের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। ভরতকে চিনিয়েছেন কলকাতার অলিগলি, তাঁকে দীক্ষিত করেছেন নবজাগরণের মন্ত্রে। মদ্যপান না করার জন্য তাঁকে করেছেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাকে বুঝিয়েছেন ঈশ্বরের স্বরূপ, “তোকে কতবার বলেছি না মন্দিরে-মসজিদে-গির্জেয় ঈশ্বর থাকেন না। ঈশ্বরকে নিজের মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর। নিজের ভাবের ঘরে যে চুরি করে, সে মন্দির-মসজিদ-গির্জেতে গিয়ে যতই ভড়ং দেখাক, সে সব মিথ্যে!”[১৭]

উনিশ শতকের প্রখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে পাওয়া গেছে এই উপন্যাসে। সেই সময়ের প্রবল নাস্তিক ও সংস্কার বিমুখ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভাবিত করেছেন শশিভূষণকে। শশীভূষণের হাত ধরে মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে ভরত। ব্রাহ্মরা যে সময়ে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে মেতেছে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সময়কে অতিক্রম করে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলতে পেরেছেন, “এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা এখানে শুধু সাকার না

নিরাকার, দ্বৈত না অদ্বৈত এই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছে। যেন সারা দেশে আর কোনো সমস্যা নেই। বিজ্ঞানের চর্চা করলে যুক্তিবোধ আসে। যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিখলে সাকার নিরাকার ফুৎকারে উড়ে যাবে!”[১৮] তিনি আরও বলেছেন, “ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে কেশব বাবু সদলবলে বোম্বাই গিয়েছিলেন। পথে নেমেছিলেন মুঙ্গের শহরে। সেখানে আগে থেকেই ব্রাহ্মদের আখড়া আছে। ভক্তির আতিশয্যে সেখানকার ব্রাহ্মিকারা ঘটি ঘটি জল কেশববাবুর পায়ে ঢেলেছে, তারপর সেই মেয়েগুলো তাদের লম্বা চুল দিয়ে পা মুছে দিয়েছে। নর – অবতার! মূর্তিপূজার বদলে মানুষ পূজা! ...দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ ঠাকুর, তাঁর কথা বেশ শোনা যাচ্ছে ইদানীং। বিদ্যেসাগরমশাইও একদিন বলেছিলেন বটে। তিনি নাকি পরমহংস, যখন তখন মুচ্ছো যান। মৃগীরোগ আছে কিনা একদিন গিয়ে দেখে আসতে হবে। কালীঠাকুর! ওই একটা ডবকা সাঁওতাল মাগীর সামনে লোকে যে কী করে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে, তা আমি কিছুতেই বুঝি না।”[১৯]

উনিশ শতকের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রলাল সরকারের মধ্যে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন জাতীয়তাবোধের জাগরণ। উপন্যাসে তাঁর উচ্চারণ, “কেশববাবু! তাঁকে কি কম চিনি? আমাদের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানেও তিনি একসময় কত কাজ করেছেন। যেমন ওঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তেমনি নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা। ইচ্ছে করলে তিনি কত বড় কাজ করতে পারতেন, তা নয়, শুধু একটা ছোটো গুষ্টির ধর্মগুরু হয়ে রইলেন। কেশববাবু আসল কাজ কী শুরু করেছিলেন জান? যদি তিনি শুধু একটি কাজ নিয়ে লেগে থাকতেন, তা হলে মহা উপকার হত এই দেশের। কেশববাবুই প্রথম বাঙালীদের ভারতীয় হতে শেখাচ্ছিলেন। এখনও একজন পাঞ্জাবি বা মাদ্রাজি ভদ্রলোক এলে লোকে বলে একজন বিদেশী এসেছে। কিন্তু পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ বিদেশ যে নয়, আমরা যে শুধু বাঙালি নই, ভারতীয়, একথা আগে কে বলেছে? কেশববাবু পত্রিকা বের করলেন, তার নাম বেঙ্গলী

মিরার নয়, ইন্ডিয়ান মিরার। বক্তৃতার সময় উনি প্রায়ই নেশান বা ন্যাশনাল শব্দ ব্যবহার করতেন। আমরা বেঙ্গলি রেস কিন্তু ইন্ডিয়ান নেশান। ... আমরা মুসলমান নই, খ্রিস্টান নই, হিন্দু নই, আমরা ভারতবাসী। এ একটা কত বড় কথা। এই বোধটা আমাদের ছিলনা বলেই তো ইংরেজ এসে আমাদের ঘাড়ে রক্ত চুষছে। আমেরিকাতেও নানা জাতের লোক আছে কিন্তু তারা সবাই আমেরিকান, সে জন্যই দেশটা ধাঁ ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের নেতাদের এখন এই আদর্শের প্রচারটাই প্রধান কাজ নয়?"[২০] ভরতকে তিনি বুঝিয়েছেন, "বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই। তোর এই দাদাটি যদি ব্রাহ্মদের দলে ভেড়াতে চায়, সটকে পালিয়ে আসবি। নিজে ভালো-মন্দ বিচার করবি, নিজেই নিজের ধর্ম তৈরী করে নিবি।"[২১] এই বোধের জাগরণই সময়কে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কয়েক যুগ পেরিয়ে।

উপন্যাসের কাল্পনিক বৃত্তে ভরতের বিপরীতে ঔপন্যাসিক এনেছেন ভূমিসূতা নামে একটি কিশোরীকে, ঘটনাচক্রে সেও ভরতের মতই শশিভূষণের বাড়িতে আশ্রিতা। অনাথা ভূমিসূতাকে পুরী থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন শশিভূষণের মেজদাদা মণিভূষণ। বাঙালী অন্দরমহলেও যদিও ভূমিসূতার মত কিশোরী সুরক্ষিত নয়, বাইরে থেকে আভিজাত্য ও সংস্কারে বাঁধনও যে কতটা মূল্যহীন তাঁর প্রমাণ ভূমিসূতা বার বার পেয়েছে। ভূমিসূতার রক্ষাকর্তা হিসেবে বেশ কয়েকবার রুখে দাঁড়িয়েছে ভরত। সেই সূত্রে এই দুই আশ্রিত অবহেলিত চরিত্র দুটি কাছাকাছি এসেছে একে অপরের। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ভরত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, ভূমিসূতার নাচ-গান-শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়ে সে তাকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভেবেছে, ভেবেছে, "থিয়েটারের মেয়েদের অবশ্য কেউ ভালো বলে না, সমাজে তাদের স্থান নেই, কিন্তু বাড়ির ঝিদেরও কি গ্রাহ্য করে সমাজ? অভিনেত্রীরা তবু হাততালি পায়, বাড়ির ঝি সারাদিন মুখে

রক্ত তুলে পরিশ্রম করলেও কি পায় কিছু?"[২২] ভরতকে কেন্দ্র করে কলকাতার সমকালীন সময়কে সন্ধান করেছেন ঔপন্যাসিক।

ভরত কলকাতায় এসেই দেখা পেয়েছে তার কৈশোরের দেবতা বঙ্কিমচন্দ্রের। একখানি ছেঁড়া 'বঙ্গদর্শন' সম্বল করেই ত্রিপুরায় লেখাপড়ার জগতে যাত্রা শুরু করেছিল ভরত, 'আনন্দমঠ' কবিতার মত মুখস্থ বলতে পারত সে। সেই 'আনন্দমঠ' -এর দ্বিতীয় সংস্করণ দেখে চরম হতাশ হয়েছে ভরত, ভেবেছে, "এই উপন্যাস থেকে ইংরেজ কেটে নেড়ে কিংবা যবন বসানো হয়েছে? কেন? আমাদের আসল প্রতিপক্ষ কে, ইংরেজ নয়? মুসলমানেরাও তো এই দেশের মানুষ! তার বন্ধু ইরফান আলি, বঙ্কিমচন্দ্রের খুব ভক্ত। সেও আনন্দমঠ পড়ে উচ্ছ্বসিত। দ্বিতীয় সংস্করণ তার চোখে পড়লে সে কষ্ট পাবে না?"[২৩] এই শহরে এসেই সে নিজের সম্পর্কে ভাবতে পেরেছে, "শিশু বয়েস থেকেই যার বাপ মা থাকে না, তার কি কোনো জাত থাকে? রাস্তায় যে কাঙালিগুলো সব জাতের এঁটো-কাঁটা খুঁটে খায়, তারা হিন্দু না মুসলমান?"[২৪] এই সময়ে দাঁড়িয়ে ভরত পুরুষ হিসেবে সমাজের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমস্ত জাতপাত ভেদাভেদ ভুলে নিজের পরিচয় দিয়েছে মানুষ হিসেবে, বলতে শিখেছে, "আমার কোনো জাত নেই, আমি শুধু একজন মানুষ।"[২৫]

অন্যদিকে ভূমিসূতাকে তার শিক্ষিত অন্তঃকরণ নিয়েই পড়ে থাকতে হয়েছে অন্দরমহলে, দাসী হিসেবে। বাঙালী অন্দরমহলের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে হাপিয়ে উঠেছে সে প্রতিদিন, কিন্তু মুক্তির পথ পায়নি। মনে মনে ভরতকে কেন্দ্র করে বানিয়ে তুলতে শুরু করে স্বপ্নের জগৎ। যদিও সেই নিষ্পাপ স্বপ্নজগৎ রক্ষাকরার অধিকারটুকুও পায়নি ভূমিসুতা। ভরতের হাত ধরে সে ব্রাহ্ম আশ্রমে যোগ দেবার আশায় পথে নেমেছে। ভরত চেয়েছে তাকে দাসীবৃত্তির নরক থেকে উদ্ধার করে একটা স্বাধীন জীবন দিতে। যদিও সেই জীবনের সন্ধান পাওয়া ভূমিসুতার ভাগ্যে ঘটেনি।

উপন্যাসে রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যও শশিভূষণের কথামতো কলকাতায় একটি নিবাস গড়ে তোলার কথা ভেবেছে। ভূমিসুতার স্থান হয়েছে সেই রাজবাড়িতে। যেখানে ভরতের প্রবেশ অসম্ভব। রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তাকে ভোগ করার জন্য উতলা হয়েছে, রাজা বীরচন্দ্রের আগমন সংবাদে ভরতকেও ছাড়তে হয়েছে শশিভূষণের বাড়ি। রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য নারীদেহ বিলাসী পুরুষ, রূপ গুণে সমৃদ্ধ দাসী ভূমিসূতাকে দেখে তিনি তাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, শশিভূষণও আবিষ্কার করেছেন ভূমিসূতার স্বরূপ, তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে রক্ষা করতে চেয়েছেন, উপন্যাসের সময় সন্ধানের পথে নারীর সামাজিক অবস্থানকে বার বার স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। ভূমিসূতার বঞ্চিত জীবন আসলে সেই সময়ের নারী জীবনের বঞ্চনার ইতিহাস। একদিকে যখন ভরত ভূমিসূতাকে রক্ষা করতে, নিজের করে রাখতে সক্ষম হয়নি, এই তিন পুরুষের মাঝে পড়ে ভূমিসূতাকে একাকী পথে নামতে হয়েছে।

অন্যদিকে উপন্যাসে মামাদের জমিদারিতে বড়লোক হয়ে দ্বারিকা তার শৈশবের ভালোবাসা বসন্তমঞ্জরীকে পতিতাপল্লী থেকে উদ্ধার করে রেখেছে নিজের করে, সমাজ সংস্কার অগ্রাহ্য করে ভালোবাসাকে জয়ী করার পথে এগিয়েছে। সময় হয়ত এভাবেই এগিয়েছে নতুন প্রভাতের পথে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে দ্বারিকা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এই বসন্তমঞ্জরীকে, সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বন্ধু যাদুগোপালকে সে জানিয়েছে, "হিন্দুত্ব নিয়ে আমার গর্ব আছে। তবে যে মানুষ নিজের ধর্মের দোষ ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা না করে, সে নিজের ধর্মকে ভালোবাসেনা! ধর্ম মানে তো কতগুলি সংস্কারের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস নয়! বাপ-মায়ের দোষে যদি একটি মেয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে, তবু যে সমাজ সেই মেয়েটিকে শাস্তি দিতে চায়, চিরকালের জন্য তাকে নরকে ঠেলে দেয়, তা হলে সেটা আবার কোনো সমাজ হল নাকি? সে সমাজ

গোল্লায় যাক! সমাজের নির্দেশ আমি মানব না, তবু আমি হিন্দুই থাকব।"[২৬] বসন্তমঞ্জরী নিজে এই বিয়েতে রাজি হতে না চাইলে দ্বারিকা বলতে পেরেছে, "জোর করে নয়, গোপনে নয়, পাপবোধ নিয়েও নয়, আমি তোকে সসম্মানে চাই।"[২৭] এই বোধের জাগরণই হয়ত সময়কে এগিয়ে নিয়েছিল নতুন পথে।

উনিশ শতকের প্রান্তভাগে এসে উপন্যাসে ভরতের বন্ধু ইরফান জেনেছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ। বুঝেছে ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সৃষ্টির ইতিহাস আসলে সত্য নয়। নবচেতনায় জাগ্রত ইরফান বলেছে, "তুই আমার বিপদ বুঝতে পারছিস না ভরত! আমি ফিরে যাব মুর্শিদাবাদে, আমার নিজের সমাজে। সেখানে সবাই কোরান হাদিসের প্রতিটি বাক্য ধ্রুব সত্য বলে মনে করে। ভক্তি ভরে পাঁচ ওকত নামাজ পড়ে, রোজার মাসে সারাদিন মুখে একফোঁটা জল পর্যন্ত নেয় না। মৌলভি সাহেবের নির্দেশ সেখানে ইংরেজ সরকারের আইনের চেয়েও বড়। তার মধ্যে আমি থাকব কী করে? আমার যে বিশ্বাস টলে গেছে। অবিশ্বাসের কথা আমি মুখ ফুটে বলতেও পারব না। তোদের হিন্দুদের মধ্যে তবু নাস্তিকের স্থান আছে, আমাদের সমাজ নাস্তিককে একেবারে সহ্য করে না।"[২৮] এই বোধের জাগরণেই তো উনিশ শতকের নবজাগরণের ভিত্তিভূমি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে ভূমিসূতাকে পাওয়া গেছে নতুন রূপে। ভরতের আশ্রয় থেকে পথে নেমে তার স্থান হয়েছে থিয়েটার জগতে, নতুন নাম হয়েছে নয়নমণি। গিরিশ ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখরের দলে যোগ দিয়ে সে পৌঁছেছে খ্যাতির শিখরে। যদিও এই পথেও প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রক্ষা করেছে নিজের সতীত্ব। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছে পুরুষকে বাদ দিয়ে নারী একাও বাঁচতে পারে। গঙ্গামণিকে সে বলতে পেরেছে, "তোমার বাবা একজন ছিল ঠিকই। সে তোমার মাকে বিয়ে করেনি। তোমাকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেয়নি। তুমি যখন জন্মেছিলে তখন কি এসব কিছু জানতে? তোমার বাবা

মায়ের বিয়ে হয়নি এই জেনেই কি তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে? আসনি, তাই না? তা হলে তোমার কোনো দোষ নেই। বাপ-মা যদি বিয়ে না করে, সমাজের চোখে কোনো দোষ করে, তার জন্য সন্তান দায়ী হতে যাবে কেন? সন্তান কেন সারাজীবন বেজন্মা হয়ে থাকবে? দিদি, তুমি নিজেকে কখনও পতিত বলবে না, পাপী বলবে না।”[২৯] নিজের নারীত্ব রক্ষা করেই নয়নমণি অর্জন করেছে প্রবল ব্যক্তিত্ব। ‘সেই সময়’ উপন্যাসের সময় পরিধি থেকে বেরিয়ে ‘প্রথম আলো’র সময় পরিধি এভাবেই নারী জীবনের উত্তরণের সাক্ষ্য বহন করেছে।

‘প্রথম আলো’ উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিধির বিস্তারের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে সময় সন্ধানের পথে এগিয়েছেন, উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে শশিভূষণকে দেখা গেছে একটি বিধবা কন্যাকে বিবাহ করে ত্রিপুরা সরকারের চাকরি ছেড়ে বাস করছেন ফরাসি রাজত্ব চন্দননগরে। ইংরেজ রাজত্বে না থাকার সংকল্প তিনি বজায় রেখেছেন। এই পর্বে এসে দেখা গেছে ভরত পাটনা শহরে একটি ব্যাঙ্কে কর্মরত। ভূমিসূতাকে হারিয়ে ফেলার পর বেশ কিছু বছর ভরত ওড়িষ্যাতে কাটিয়েছে। তারপর সে পৌঁছেছে কটক শহরে। এই শহরে ঔপন্যাসিক জেগে উঠতে দেখিয়েছেন দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মুসলমান সমাজ কংগ্রেস সম্পর্কে সন্দিহান ছিল, এমন পরিস্থিতিতে গো-রক্ষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজ উৎসাহী হয়ে পড়লে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের বিভেদ রেখা আরও স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। ভরতের সহকর্মী বিষ্ণুকান্ত সহায়ের পুত্র শিউপূজন উপন্যাসে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত কর্মী ও গোঁড়া হিন্দু। গোরক্ষাই তার কাছে ধর্মরক্ষা। পাটনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে, মির্জা খোদাবক্স নামে একজন মুসলমান পুলিশ অফিসার ভরতকে তার বাড়িতে স্থান দিয়ে তাকে রক্ষা করেছে। ভরত ভেবেছে কংগ্রেসে যোগ দিতে মুসলমানরা এমনিতেই দ্বিধান্বিত, এই সব ঘটনা ঘটলে তারা আরও পিছিয়ে যাবে। তার বন্ধু ইরফানের কথা

মনে পড়ে। সে আছে মুর্শিদাবাদে। ইরফানই তাকে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, এখন ইরফানও সন্ধিহান হয়ে উঠবে!

উপন্যাসে ভরত ভূমিসূতার সন্ধান না পেয়ে যখন বিধ্বস্ত, সেই সময়েই সে পেয়েছে ভূমিসূতার মত একটি মেয়ে মহিলামণিকে। মহিলামণি বালবিধবা বুদ্ধিমান রমণী। উপন্যাসে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ের সময় তার যোগ্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন রবি। 'সেই সময়' উপন্যাসের বালবিধবা বিন্দুবাসিনী পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে হারিয়ে গেছে অন্ধকারের অন্ধকূপে। 'প্রথম আলো'তে সময় পরিবর্তিত। মহিলামণি বাড়িতে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে, গান-বাজনার চর্চা করেছে। রবির উদ্যোগে ভরত ও মহিলামণির বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে ব্রাহ্মমতে। বছরান্তে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে মহিলামণি, পুরীতে গিয়ে তারা গড়ে তুলেছে সুখের সংসার। যদিও ভরতের এই সৌভাগ্য বেশীদিন সয়নি, আকস্মিক একটি অপঘাতে মহিলামণির মৃত্যু হল। ভরত আবার চ্যুত হয়েছে তার স্থিত জীবন থেকে। ভরতের বন্ধু দ্বারিকা ও বসন্তমঞ্জরী ভরতকে খুঁজে পেয়েছে প্রয়াগে, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়। এলাহাবাদের তারা ভরতকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু ভরত এই আশ্রয় ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছে পথে। স্ত্রী বিয়োগের পর সংসারের পাট চুকিয়ে, সন্তানকে শ্বশুরালয়ে রেখে সে ভ্রাম্যমাণ। দীর্ঘ সময় সে যাপন করেছে সম্পূর্ণ অসার মন নিয়ে। হঠাৎ একটি নারীকে নিয়ে দুই পুরুষের লড়াই তার সম্বিৎ ফিরিয়েছে।

ভ্রাম্যমান জীবনে সে পৌঁছেছে নাগপুরে। এখানে এসে সে দেখেছে প্লেগ কমিশনের প্রধান র‍্যান্ড এবং আয়াস্ট নামে দুজন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষদের হত্যাকারীদের ধরার জন্য চলছে চরম দমন ও পীড়ন। পুণার কতগুলি মারাঠি যুবকই এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা জানার পর থেকে ইংরেজ সরকার তাদের আরও কঠোর হাতে দমন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ইংরেজ শাসকরা এই হঠকারীদের খুঁজে বের করে ফাঁসির

দড়িতে ঝুলিয়ে সকলের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়। ভরত লক্ষ্য করেছে, “এদেশের বহু মানুষেরই এখনও স্বাধীনতা-পরাধীনতার বোধ নেই। রাজশক্তিকে তারা শুধু ভয় পায় না, ভক্তিও করে। শাসকরা এদেশী না বিদেশি, তা নিয়েও তারা মাথা ঘামায় না। বিশ্বাসঘাতকতা যেন অধর্ম নয়, সামান্য পাঁচ-দশ টাকার জন্য নিজের বন্ধু বা আত্মীয়কে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায়।”[৩০] এরপর ভরত এসে পৌঁছেছে পাটনা শহরে। সেখানে সে খুলেছে ইংরেজি শেখাবার স্কুল। একাকী জীবনে তার একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠেছে এই স্কুল। শেষপর্যন্ত এক ভয়াবহ অগ্নিলীলায় তার স্কুলের আসবাব সমেত সমস্ত স্কুলটিতে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গেছে তার গড়ে তোলা জীবন। পাটনার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক হয়েছে ছিন্ন। এরপর ভরত কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পৌঁছেছে কলকাতা।

নতুন শতাব্দীতে কলকাতা পৌঁছে ভরত নতুন চোখে দেখেছে কলকাতাকে। ক্লাসিক থিয়েটারে নাটক দেখতে গিয়ে ফিরে পেয়েছে ছাত্রজীবনের বন্ধু ইরফানকে। যে ইরফান ছাত্রজীবনে ডারউইনের তত্ত্ব পড়ে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল সে ভরতকে জানিয়েছে, “ওরে ভাইরে, ধর্ম না আঁকড়ে ধরলে কি সমাজে টেকা যায়, না উন্নতি করা যায়? তুই যদি ধর্ম না মানিস, তা হলে তুই কে? হিঁদুও না, মোছলমানও না, কুষ্ঠরোগীর মত অস্পৃশ্য। আমি এখন দিনে পাঁচ ওয়ক্ত নামাজ পড়ি, এই শরীরে আল্লার করুণার স্পর্শ পাই।”[৩১] কৃষ্ণকান্তের উইলের নাট্যরূপ ‘ভ্রমর’ -এর অভিনয়ে ভরত দেখতে পেয়েছে ভূমিসূতাকে, সমাজের চোখে যে প্রখ্যাত অভিনেত্রী নয়নমণি। উপন্যাসে বসন্তমঞ্জরী, দ্বারিকার স্ত্রী বার বার অলৌকিক উপায়ে ভরতকে মূল কাহিনী সূত্রে যুক্ত করেছে। দ্বারিকা ভরত ও ভূমিসূতাকে যুক্ত করতে চেয়েছে, ভরতকে বলেছে, “ছিঃ ভরত! তুই এত কাপুরুষ। ও মেয়ে তো ছাইগাদার মানিক। হাড়কাটা গলির নরক থেকে আমি বসন্তমঞ্জরীকে উদ্ধার করে এনেছি। সমাজের পরোয়া

করিনি। আর তুই ওই ভূমিসূতাকে থিয়েটারে গিয়ে নষ্ট হতে দিলি? ধরে রাখতে পারলি না?”[৩২] ভরত দ্বারিকার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভূমিসূতাকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত হতে চায়নি, সে যুক্ত হয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে।

অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভরত। পৌঁছেছে মেদেনিপুর শহরে। সেখানে সে গীতা ও তলোয়ার স্পর্শ করে দীক্ষিত হয়েছে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির কাজে। দীক্ষার শপথ গুলিছিল, “সোসাইটির তরফ থেকে যখন যা আদেশ করা হবে, প্রত্যেক সদস্যকেই তা পালন করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড। দেশের শত্রুদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রয়োজনে ডাকাতি করতে হবে। সোসাইটি যদি কোনও সদস্যকে অন্য কোথাও যাওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে আত্মীয় বন্ধুদের তা জানানো চলবে না, কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে যেতে হবে। দেশের কাজে সর্বস্ব সমর্পণ করতে হবে, নিজের বিষয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ির ওপরেও অধিকার থাকবে না। ধরা পড়লে দ্বীপান্তর বা ফাঁসি বা দীর্ঘ কারাবাসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, বিচারের সময় সহকর্মীদের সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করা যাবে না।”[৩৩] বারীন্দ্র – যতীন বাড়ুজ্যের সহকর্মীরূপে ভরত যোগ দিয়েছে, দুটি ডাকাতির অভিযানেও। যদিও অরবিন্দ – বারীন্দ্রের এই গুপ্ত সমিতি ভেঙে গেছে অচিরেই।

ভরত আবার যুক্ত হয়েছে ভ্রাম্যমাণ জীবনে। হঠাৎ দার্জিলিং-এ পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষায় সে পৌঁছেছে কার্শিয়াং-এ। সেখানে দীর্ঘদিন বাদে দেখেছে রাধাকিশোরকে, রক্তের টান অনুভব করলেও যুক্ত হতে পারেনি তার সঙ্গে। ভেবেছে, “রাধাকিশোরের যদি মনে হয় সে কোনো মতলবে এসেছে? এই পাহাড় অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন নয়, কিন্তু এখানেও গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ করা যেতে পারে। ভরতের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগল। নিয়তি? ...নিয়তি তাকে বার বার বিপদের মুখে ফেলে দেয়। সেই

নিয়তিই তাকে এখানে টেনে এনেছে আবার কোনও কৌতুক করার জন্য? না, এবার আর ভরত সেই ফাঁদে পা দেবে না। দার্জিলিং যাওয়া হল না, ভরত ফিরে এল কলকাতায়। দু'দিন পরে কোনও চিঠি না লিখে সে রওনা হল মেদেনিপুরের দিকে।"[৩৪] সেখানে গিয়ে আবার যুক্ত হয়ে পড়ল বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে। ভরতের মেদেনিপুরে বাস সূত্রেই ঔপন্যাসিক যুক্ত করেছেন ক্ষুদিরাম বসুকে।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষিত যুব সমাজ বুঝেছে, "কোটি কোটি পরাধীন মানুষের অপমানিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মুখ।"[৩৫] হেম বাড়ুজ্যেকে সঙ্গে নিয়ে ভরত আবার পৌঁছেছে কলকাতায়। দেখেছে সবাই উত্তেজিত বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে। বঙ্কিম রচিত 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। কোনো হরতালের ডাক ছাড়াই সব দোকানপাট বন্ধ। কোনো সংগঠন ছাড়াই দলে দলে সাধারণ মানুষ এক হয়েছে। স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে শুরু হয়েছে বিদেশি বর্জন। পোড়ানো হয়েছে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা। যদিও এসবের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হিন্দু মুসলিম বিভেদের ভেদরেখা। বহু মুসলমান বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা চেয়েছে বঙ্গভঙ্গ, ধর্মের ভিত্তিতে একই ভাষাভাষী গোষ্ঠী হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত। ইরফান ভরতকে জানিয়েছে, "জাতিগতভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের আধিপত্য মেনে নেবে কেন? হিন্দুদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য মুসলমানদের এখন পৃথক আইডেনডিটি দরকার। সেই জন্যই আমরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করি। মুসলমান প্রধান একটা আলাদা রাজ্য পেলে আমরা ছাড়ব না কিছুতেই।"[৩৬] অঙ্কুরিত হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ। একদিকে হিন্দু বাঙালী বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গর্জে উঠেছে, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি হয়ে উঠেছে তাদের বীজমন্ত্র। অন্যদিকে ঢাকার নবাব বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে একত্রিত করেছে মুসলিম সমাজকে, দেশ এগিয়েছে বিভাজনের পথে।

অরবিন্দ-বারীন্দ্রের গুপ্ত সমিতি সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে এগিয়েছে। ‘যুগান্তর’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তারা শুরু করেছে ইংরেজ বিরোধী চরমপন্থা। ভরত-বারীন্দ্র-হেম ফুলার সাহেবকে হত্যার পরিকল্পনায় পৌঁছেছে শিলং শহরে। সেখান থেকে ফুলার সাহেব বেরিয়ে পরলে তাকে ধরতে গিয়ে তারা পৌঁছেছে প্রথমে গৌহাটি, তারপর বরিশাল শেষে রঙপুর। ফুলার সাহেবকে ধরতে পারা আর সম্ভব হয়নি। অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় তারা ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে, আর এই ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাদের সমস্ত বিপ্লবী পরিকল্পনা হয়ে গেছে ধ্বংস।

ভয়াবহ ভাবে আহত অবস্থায় ভরতকে একটি ভাঙা মন্দির থেকে উদ্ধার করেছে দ্বারিকা ও বসন্তমঞ্জরী। ভূমিসূতাকে সন্ধান করে যাদুগোপাল ও দারিকা ভরতের শুশ্রুষার দায়িত্ব দিয়েছে। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে ভরতকে। যদিও তাদের মিলনের পথ হয়নি প্রশস্ত। ভরতকে সুস্থ করে ভূমিসূতা নিঃশব্দে ফিরে গেছে নিজের পুরোনো জীবনে, ভরতও আবার দেশের কাজে উৎসর্গ করতে চেয়েছে জীবন। বলেছে, “তবু লড়াইটা শুরু করতে তো হবে কোনও এক সময়। চিরকালের জন্য যারা পরাধীনতা মেনে নেয়, তারা কি পূর্ণ মানুষ হতে পারে? আমরা হয়ত তেমন কিছুই পারব না, এমনি এমনি প্রাণটা যাবে, তবু ইংরেজ শক্তির মতন এক বিশাল দৈত্যের অধীনতা মেনে নিইনি, আঘাত দিতে চেয়েছি, এই গর্বটুকু নিয়ে মরতে পারব।”[৩৭] ভরতের প্রতি অভিমানে ভূমিসূতা কাশীতে পৌঁছেছে, ভরতও পৌঁছেছে তার সন্ধানে। সেই কাশীতেই ভরত ঘটনাচক্রে পেয়েছে ত্রিপুরার রাজা তার ভাই রাধাকিশোরকে, দীর্ঘকাল পরে জন্মপরিচয় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাধাকিশোর তাকে মাসোহারা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে, কিন্তু ভরত আর সেই সম্পর্কের জালে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। যদিও একটা মুক্তি সে অনুভব করেছে। ভূমিসূতাকে ফিরে পেয়ে একটা অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে ভরতের জীবন।

উপন্যাসের ‘প্রথম পর্ব’ -এর ‘দশম পরিচ্ছেদে’ যখন প্রথম রবীন্দ্রনাথের দেখা মেলে তখন তিনি বাস করছেন চন্দন নগরের গোলন্দপাড়ায় গঙ্গার ধারে মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে। নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর ছত্রছায়ায় থাকা সদ্য যুবক তখন রবি। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন “কুড়ি বছর পূর্ণ করে সদ্য একুশে পা দিয়েছে সে।”[৩৮] অর্থাৎ সালটা ১৮৮১। এই বছরেরই ৭ ই মে তিনি কুড়ি পূর্ণ করে একুশে পা দিয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, “ইদানিং সে বাইরের লোকের সংস্পর্শ পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতে চায়, এমনকি আত্মীয় স্বজনের সামনেও অস্বস্তি বোধ করে। এই সংসারে আর যা কিছুরই অভাব থাক, অযাচিত মন্তব্য বা উপদেশ দেওয়ার মানুষের অভাব নেই।... একবার নয়, দু দুবার রবিকে বিলেতে পাঠানো হয়েছিল ব্যারিস্টার কিংবা আইসিএস হয়ে আসার জন্য। দুবারই সে ব্যর্থ হয়েছে।”[৩৯] ‘রবিজীবনী’ -র পাতা খুঁজলে দেখা যায় ১৮৮১ সালের ২২ শে এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বারের জন্য বিলাত যাত্রা করেছিলেন। এই সময়ে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের কারণে তাঁর আর বিলেত পৌঁছনোই হয়নি সেবার। মাদ্রাজ থেকেই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। প্রশান্ত কুমার পাল জানিয়েছেন, “জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সস্ত্রীক চন্দননগরে ‘তেলেনিপাড়া বাড়ুজ্যেদের বাগান’-এ অবস্থান করেছিলেন। যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৭ ই জৈষ্ঠ্য [বৃহ 19 MAY] একটি পত্রে [অপ্রকাশিত] মহর্ষিকে জানিয়েছেন, জ্যোতিবাবুরা ফরাশডাঙ্গার বাগানে আছেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।”[৪০] সকলের কাছে রবি যখন ব্যর্থ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, ঠিক সেই সময়েই কাদম্বরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে ত্বরান্বিত। “দিন কাটছে যেন স্বর্গের এক একটি দিন। প্রতিটি মুহূর্ত এক এক বিন্দু অমৃত। সারাদিন কোনো পরিকল্পনা নেই, কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো কর্তব্য নেই, কোনো দায়িত্ব নেই। যখন যা মন চায় তাই করা যায়। ইচ্ছে করলে বাগানে গিয়ে দোলনায় বসা যায়, গাছ থেকে ফল পাড়া যায়, নদীতে নৌকা বিহারে যাওয়া যায়, আবার ঘন্টার পর ঘন্টা বিছানায় বুকে

বালিশ দিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করলেও বাধা দেবেনা কেউ। তিনজন একসঙ্গে থাকলে গান হয়, গানের পর গান, নতুন নতুন গান। সুরের তরঙ্গই আনন্দের তরঙ্গ। সেই সঙ্গে হাসির উচ্ছলতা। জ্যোতিদাদা জীবনকে উপভোগ করতে জানেন, এক একদিন এক একরকম পরিবেশ... কাদম্বরী রবির চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়, তিনি এখনো জননী হননি, তিনি এক অসংসারী নারী, তাঁর শরীর ও মন জুড়ে রয়েছে শিল্পের সুষমা। এই লাজুক দেবরটিকে প্রীতি ও বন্ধুত্ব দিয়ে তিনি সব সময় আপন করে রাখেন আর রবিও তাঁর মন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতে পারে এই নতুন বউঠানেরই কাছে।"[৪১] এই দুজনের সান্নিধ্যেই রবির মন মুক্ত হয়েছে। বিশ্বের মাঝে নিজের স্থান খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি এই সময় থেকেই।

পিতার পরিচয়ের বাইরে নিজের পরিচয় গড়ে তোলার পথ খুঁজে পেতে চেয়েছেন রবি। শুরু হয়েছে আত্ম অনুসন্ধান তথা জীবন অনুসন্ধান। একুশ বছর বয়েসে পৌঁছে বুঝতে চেয়েছেন নিজেকে। বাল্যকাল থেকেই কবিতা লিখেছেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে প্রায় তিন চারটি গ্রন্থের গ্রন্থকার তিনি। কবিত্ব শক্তির খ্যাতি ছড়িয়েছে কিছুটা হলেও। গায়ক হিসেবেও নাম কুড়িয়েছেন পরিচিত মহলে। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষা তাঁকে ঋদ্ধ করেছে। ঠাকুর বাড়ির নাট্য উৎসবে অভিনেতা হিসেবেও খ্যাতি কুড়িয়েছেন। কিন্তু গায়ক বা অভিনেতা হিসেবে সে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়। তাঁর প্রথম ও একমাত্র ভালোবাসা কবিতা। কবি হিসাবে সার্থকতাই তাঁর কাছে আসল সার্থকতা। যদিও এই সার্থকতার পথ সহজ নয়। ঔপন্যাসিক রবিজীবনের বাস্তব তথ্যকে সাহিত্যের সত্য করে তুলে দেখিয়েছেন তাঁর 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য বিশেষ গুরুত্ব বা সম্মান আদায় করতে পারেনি। কবি বন্ধু প্রিয়নাথ সেন, যাঁর মতামতকে রবি বিশেষ শ্রদ্ধা

করতেন তিনি রবিকে প্রায় ভৎসনাই করেছিলেন। ‘রবিজীবনী’র পাতা ওলটালে এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। যদিও ঔপন্যাসিক যেসব মন্তব্যগুলো যুক্ত করেছেন প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে সেগুলো অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘সাধারণী’ পত্রিকায় ‘আশ্বিন’ সংখ্যায় করেছিলেন। যদিও এই কাব্যের জন্যই ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রবিকে সম্মান জানাতে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তেলেনিপাড়ার বাড়ুজ্যেদের বাগান থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখরা ঠিক কবে চন্দননগর ত্যাগ করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ ‘ছেলেবেলা’য় লিখেছেন কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হয়েছিল মোরান সাহেবের বাসায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরা কবে চন্দননগর ছেড়ে কলকাতা ফিরেছিলেন তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে প্রশান্ত কুমার পাল জানিয়েছেন, ১৮৮১-র ১৬ ই অগ্রহায়ণ অর্থাৎ 30 NOV দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সম্ভবত এই বিবাহের পূর্বেই তারা কলকাতা ফিরে এসেছিলেন।

কবিতার চেয়েও রবীন্দ্রনাথের গদ্য পরিচ্ছন্ন, নির্মেদ ও ধারালো। স্কুল পালানো ছেলে হলেও তাঁর পড়াশোনার বিস্তার অসীম। প্রাচ্য পাশ্চাত্য এই দুই জগতেই তাঁর অনায়াস গতায়াত। ‘ভারতী’ -র বৈশাখ ১২৮৮ সংখ্যায় ‘বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা’ এই প্রবন্ধে তিনি শেলির ‘Queen Mab’ কাব্য থেকে দীর্ঘ অংশ, ওয়ার্ডওয়ার্থের একটি কবিতা ও কয়েকটি কাব্যানুবাদ ব্যবহার করেছিলেন। পশ্চিমী সাহিত্যের সাম্প্রতিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রবি বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে গদ্যেরই যুগ আসছে। চন্দন নগরে তিনি ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ নামে একটি উপন্যাস শুরু করেছিলেন। ‘ভারতী’র পাতায় তাঁর ক্ষুরধার গদ্যের মধ্যে অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এই ‘ভারতী’র পাতাতেই তাঁর রাজনৈতিক ভাবনারও জাগরণ। রবিজীবনীকার লিখেছেন “চন্দননগরে থাকার সময় কেবল কবিতা ও গান নয়, অন্যান্য গদ্যরচনাও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।”[৪২] ‘ভারতী’ র পাতায় প্রকাশিত

‘জুতা ব্যবস্থা’ তিনি লিখেছিলেন ‘ইংলিশ ম্যান’ পত্রিকায় লিখিত একটি মন্তব্যের বিরোধিতা করে। ‘ইংলিশ ম্যান’ পত্রিকা একসময় লিখেছিল ‘kick them and speak to them. Age lat pechoo bat’ তিনি তাঁর উত্তরে জবাব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত হয়ত এখানেই। উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজবাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করতে এসে ব্রিটিশ বিদ্বেষী শশিভূষণ তাঁকে বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। উপন্যাসে শশিভূষণের মন্তব্য, “আপনি বাঙালি জাতটাকেও বলেছেন আর কতকাল জুতো খাবে? Perfect piece of political writing! ওই লেখাটির জন্য বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি।”[৪৩] ‘জুতা ব্যবস্থা’ প্রকাশিত হয়েছিল ভারতীর জৈষ্ঠ সংখ্যা ১৮৮০। মন্তব্যটি ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ৩০ শে এপ্রিল ১৮৮০ তারিখে। প্রশান্ত কুমার পাল জানিয়েছেন, উক্ত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন চলছিল, রবীন্দ্রনাথ মুসৌরী থেকে সম্ভবত সেই উত্তেজনার মধ্যেই ফিরে আসেন ও তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রবন্ধটি রচিত হয়। কুড়ি বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখনই কী পরিমাণ তীব্র ব্যঙ্গ বর্ষণে সক্ষম হয়ে উঠেছিল, রচনাটি তারই একটি নিদর্শন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ভুলক্রমে রচনাকাল ১৮৯০ মুদ্রিত হয়েছিল, ওটা ১৮৮০ হইবে। - একথা ঠিক মনে করার কোনো কারণ নেই, ‘১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত’ এই উল্লেখটি রচনার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিরই অন্তর্গত বলে প্রশান্ত কুমার পাল মনে করেছেন এবং তাঁর মতের সঙ্গে যথার্থই সহমত হতে দ্বিধা নেই। ইংলিশ ম্যানের মন্তব্যকে সরকারি নীতি ধরে নিয়ে তিনি প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন যে, “যে হেতুক বঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বেজুত হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেন্টের অধীন যে বাঙ্গালী কর্মচারী আছে তাহাদের প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লয়া হইবে।’ এরপর বাঙালীর দাস মনোভাবকে কল্পনা করে দশ বছর পরের একটি কল্পচিত্র রচনা করেছেন। লিখেছেন, “আজকাল ট্রেনে হউক, সভায় হউক, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে ‘মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস?

মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ? আজকালকার বি-এ এম-এ রা নাকি বিশ পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। সেই আমলের শ্রেষ্ঠ আশীর্বচন 'পুত্র পৌত্রানুক্রমে গবর্মেণ্টের জুতা ভোগ করিতে থাক, আমার মাথায় যত চুল আছে, তত জুতার তোমার ব্যবস্থা হউক।"[৪৪] এর আগে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' -এ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে কিছু রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু 'জুতা ব্যবস্থা'ই তাঁর প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ। উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবনার উন্মেষের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সময়ের বিবর্তনের রূপরেখাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের শেষপাদে এসে উনিশ শতকের আত্মসচেতন বাঙালী রাজনীতি চেতনার প্রথম আলোতে হয়েছে আলোকিত।

উপন্যাসে সময় সন্ধানের পথে সময়ের বহুতলীয় বিবর্তনের রূপরেখাকেই ওপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবর্তনের পথরেখাকে। কাদম্বরীদেবীর সংস্পর্শে তিনি যখন উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন, কাব্যজগতে তাঁর হচ্ছে রাজ্যাভিষেক, অন্যদিকে পারিবারিক বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বিশ্বমাঝে দাঁড়াতে চেয়েছেন। কাদম্বরী দেবীর অনুপ্রেরণাকে নিজের প্রতিভা বিকাশের পাথেয় করে নিজ প্রতিভার বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বিশ্বলোকে। ব্যক্তিমানুষ থেকে বিশ্বমানব হয়ে ওঠার সাধনা শুরু হয়েছে এখান থেকেই। বহুদিনের যবনিকা সরিয়ে নারীমুক্তির জোয়ার যখন এসেছে ঠাকুরবাড়িতে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কাদম্বরী দেবী একাকীত্ব বা অবহেলা মেনে নিতে চাননি, রবিকে আশ্রয় করেই তিনি মেতে উঠতে চেয়েছেন পুতুলখেলায়, সন্তানহীন একাকীত্বের জীবন তিনি নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেনি। রবি তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন, তাঁকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু গৃহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করতে পারেননি।

পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে মুক্ত হয়ে একজন গৃহবধূ বাস করছেন নিজের মতো করে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে মুক্ত হয়েছে বাঙালীর চিরায়ত প্রথা, যেই প্রথায় 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার'ই নারীর পৃথিবী, সেই পৃথিবী বেরিয়ে এল অন্দরমহলের বাইরে। ইউরোপীয় ধাঁচে বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সঙ্গে নেই কোন রক্ষিতা, বরং আছে তার বিবাহিতা কাদম্বরী। এখানেই পরিবর্তনের চিহ্নকে ধরা যায়। নারী পুরুষের নর্মসঙ্গিনী আর নয়, ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করেই নারী হয়ে উঠেছে কর্মসঙ্গিনী। চন্দননগর থেকে ফিরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর অত ভিড়ের মধ্যে থাকতে চাননি। চৌরঙ্গী পাড়ায় একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিলেন। সদর স্ট্রিটের গলিতে দশ নম্বর বাড়িতে শুরু হয়েছে কাদম্বরীদেবীর নতুন সংসার। প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন, "জ্যোতিরিন্দ্র সম্ভবত অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে চন্দননগর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর তিনি চৌরঙ্গির সদর স্ট্রিটে একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে কয়েক মাস বাস করেন।... জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোন্ মাসে বাড়িটি ভাড়া করেছিলেন তা জানা না গেলেও চৈত্র ১২৮৮ তে তিনি সেখানে ছিলেন... রবীন্দ্রনাথ এখানেও তাদের সঙ্গী হন।"[৪৫] এই বাড়িতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরীর সাহচর্যে রবি জীবনেও শুরু হয়েছিল নতুন অধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতা অদম্য সাহস তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই সময়েই রবি প্রবেশ করতে শুরু করেছিলেন কর্মজীবনের প্রাঙ্গনে। প্রায়ই সকালে আসেন অক্ষয় চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষালের মত আত্মীয় বন্ধুরা। 'ভারতী' -র সম্পাদনার কাজ চলে। সম্পাদক হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম ছাপা থাকলেও তিনি বিশেষ সময় দিতে পারতেন না। সমস্ত দায়িত্ব জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই পালন করতে হত।

এই সদর স্ট্রিটের বাড়িতে আসার পর রবির জীবনে বেশ কিছু পটপরিবর্তন ঘটেছিল। প্রশান্তকুমার পাল বলেছেন, "সদর স্ট্রিটের

বাড়িতে অবস্থান কালে রবির জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে।"[৪৬] 'জীবনস্মৃতি' তে কবি লিখেছেন, "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছগুলি পর্বন্তরাল থেকে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের ওপর হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের ওপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোকে একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।"[৪৭] এই সময়েই তথা ১২৮৯ বঙ্গাব্দে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ফরাসিদেশের ফ্রেঞ্চ আকাদেমির অনুকরণে সাহিত্যের স্বাহ্যরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করার কথা ভাবলেন। তিনি ঠিক করলেন বাংলার সব বিশিষ্ট লেখক, পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদদের একসঙ্গে জড়ো করে একটি সারস্বত সমাজ গঠন করা হোক। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর সভাপতির পদ গ্রহণ করতেও আপত্তি করেননি। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন, "এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।"[৪৮] রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, "রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন ও সভাপতি হতে রাজি হন। কিন্তু অন্যান্য বিশিষ্টব্যক্তিদের সকলের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়নি।"[৪৯] 'জীবস্মৃতি' তে কবি লিখেছেন, "যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভাসদদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি

পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো – 'হোমরা চোমরা'দের লইয়া কোন কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলিবে না।"[৫০] এই ঘটনারই উল্লেখ উপন্যাসে তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক। এর পরের দু একটা মাসিক অধিবেশনেই রবি বুঝতে পারলেন কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। উপদলীয় কোন্দল শুরু হয়ে গেছে। এই সব বড় বড় মানুষগুলির প্রত্যেকেরই আত্মম্ভরিতার লম্বা লম্বা লেজ আছে, সেই লেজের বিড়ে পাকিয়ে সিংহাসন তৈরী করে তার ওপর একজন রাজা সেজে বসে থাকেন। এঁরা দূরবীনের উল্টো দিক দিয়ে দেখে জগৎ সংসারকে। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আর তেমন গা করেন না, কয়েকজন আড়ালে বলাবলি করতে লাগল ওসব ঠাকুরবাড়ির ব্যাপার, সব বিষয়েই ওরা কৃতিত্ব নিতে চায়! রবি নিরাশ হয়ে পড়লেন। বাঙালী জাতির এতদূর অধঃপতনের পরেও এঁরা সবাই একসঙ্গে হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কিছু একটা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে পারছেন না দেখে তিনি ভেবেছে, শুধুই দলাদলি আর পরনিন্দা চলতে থাকবে? রবি উপলব্ধি করলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সাবধান বাণী কত মর্মে মর্মে সত্য। ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন সময়ের বিবর্তনের রূপরেখাকে যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এগোনো বাঙালী এগিয়েছে আরও কিছু জোরালো আলোর পথে। যদিও অন্ধকার তার ছায়াসঙ্গী চিরকাল, ভোরের সূর্যের প্রথম আলো মধ্যাহ্ন সূর্যের মত জোরালো তো নয়! তাই হয়ত ছায়া-অন্ধকার মুক্ত হতে পারেনি বাঙালী সমাজ।

যদিও এই পথে প্রথম পা বাড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির পর্দাপ্রথাকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে যিনি বাঙালী তথা ভারতীয় নারী সমাজকে এক ধাক্কায় এক শতাব্দী পার করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা ভারতের প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। চিত্রা দেব তাঁর 'ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল' গ্রন্থে জানিয়েছেন, "সত্যেন্দ্র বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পরে জ্ঞানদানন্দিনী একান্নবর্তী

ঠাকুরবাড়িতে যৌথ পরিবারের একজন হয়ে থাকতে চাননি। তিনিই প্রথম জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি ছেড়ে অন্যবাড়িতে উঠে যান স্বামী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে। বাঙালি জীবনে এর আগে এই স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়নি। ...আধুনিক জীবনে পারিবারিক ছকটি জ্ঞানদানন্দিনীই নিজের হাতে গড়ে দিলেন।”[৫১] উপন্যাসে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রথম সংবাদ পাওয়া গেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখে, কাদম্বরী রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দিতে আসা রাজদূতদের সামনে থাকতে না চাইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন মেজবৌদি লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আর তুমি এক রাজার দূতদের সামনে থাকতে পারবে না কেন। এই প্রসঙ্গে চিত্রা দেব তাঁর ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’ -এ লিখেছেন, “তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কথামতো গিয়েছিলেন লাটভবনে, নিমন্ত্রণ রাখতে। সেখানে তাঁকে দেখে সবাই প্রথমে ভেবেছিলেন ‘ভূপালের বেগম’, কারণ ‘তিনিই তখন একমাত্র বেরোতেন’। ভোজসভায় ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি তো ঘরের বউকে প্রকাশ্য রাজসভায় আসতে দেখে রাগে-লজ্জায় দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। আগে কোনও ‘হিন্দু রমণী’ গভর্নমেন্ট হাউসে যাননি। এখনই বা যাবার কী দরকার ছিল? সেকথা সনাতনপন্থীরা বুঝবেন কী করে? বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাই পুলকিত হয়ে লিখেছেন, ‘সে কী মহাব্যাপার! শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে একমাত্র বঙ্গবালা!’ যতই হইচই হোক-না-কেন রোগটা বড় ছোঁয়াচে। একটি দুটি করে আরও দরজা খুলতে শুরু করল।”[৫২] জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে প্রথম বিলিতি আদবকায়দা আমদানি করেছিল জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। প্রথম বাঙালী নারী হিসেবে তিনি স্বামী সঙ্গ ছাড়াই একা দুটো শিশু পুত্র-কন্যা নিয়ে ইংল্যান্ড পাড়ি দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মক্ষেত্রে কতদূর এগিয়েছে তা বুঝে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তা চেতনাকে নিজের জীবনে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। সমান আত্মমর্যাদা নিয়ে ইংরেজি ও ফরাসীতে অনর্গল কথা বলতেও তিনি পারতেন। বহুযুগ ধরে বাঙালী হিন্দু সমাজে নারীদেহ শুধু ভোগের জন্য

ও সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হত। সেই সনাতনী নারী দেহকে তিনি নারীমানুষীতে পরিবর্তিত করার পথে এগিয়েছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দু বাঙালি স্ত্রীলোকেরা ছিল একবস্ত্রা, অঙ্গে তাদের শাড়ি ছাড়া কোনো অন্তর্বাস থাকত না। সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে গেলেন তখন তাঁর ওই পোষাক অসভ্য বলে মনে হল। জ্ঞানদানন্দিনীর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল আধুনিক বাঙালী নারীর শাড়ি পরার ভঙ্গি।

রবীন্দ্রনাথ তখন দুবার ইউরোপ থেকে শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে প্রতির্ষ্ঠিত করার পথ খুঁজছেন। প্রথমবার ইংল্যান্ড গিয়ে বছর দুয়েক কাটানোর পর পিতৃ আদেশে সম্পূর্ণ খালি হাতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফেরার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারীতে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিলাত যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সেবারও ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশের কারণে তাঁকে মাদ্রাজ থেকেই ফিরে আসতে হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবার বিলাত যাবার কথা উঠলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' গ্রন্থদ্বয় যথাক্রমে 'শ্রীমতি হে-কে' ও 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে উৎসর্গ করেছিন। উভয় গ্রন্থই যে বিলাত যাত্রার আগে রচিত তা উপহারের মধ্যেই স্পষ্ট। বিলাত যাত্রায় ব্যর্থতার পর তিনি বুঝেছিলেন বাংলা লেখাই তাঁকে দিতে পারে কাঙ্খিত প্রতিষ্ঠা। তিনি খুঁজতে শুরু করেছিলেন নিজের সত্তার প্রকৃত মুক্তির পথ। ঔপন্যাসিক বলেছেন, "কবি হিসাবে রবি এ পর্যন্ত তেমন কোনও অসাধারাণত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। সে অনবরত কবিতা লিখে যেতে পারে, ছন্দমিল আসে সাবলীলভাবে, কিন্তু কিছুতেই গভীরতা আসে না। বিষণ্ণতার বদলে হা হুতাশ। ...রবি কবিতা লিখতে গেলেই হয়ে যায় ছন্দবদ্ধ ব্যক্তিগত ডায়েরি কিংবা চিঠি, তাতে সার্বজনীনতার স্পর্শ লাগে না। রবি এখন তা বুঝতে পারছে কিন্তু কী করে এর থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়?"[৫৩] 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি প্রকাশ হবার পরে পাঠকের প্রশংসা পায় নি। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন প্রিয়নাথ সেনের মত

সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক মনে করেছেন "যাত্রাদলের ছোঁড়ারা এমন প্যানপ্যানানি গান গায়।"[৫৪] যদিও এই কাব্যের কারণেই তিনি ত্রিপুরার রাজার পক্ষ থেকে সম্মান পেলেন। তাঁর মনে হল, "...কবিতাগুলি তা হলে একেবারে ব্যর্থ নয়। একজন মানুষকে শোকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সে মানুষ যে সে মানুষ নয়, একজন মহারাজ এবং কবিতার সমঝদার।"[৫৫] তবুও রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে নিজের খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় এগিয়েছেন বেশ কয়েক ধাপ। বিদেশ ঘুরে এসে তিনি বুঝেছেন "ভবিষ্যতে গদ্যের যুগই আসছে।"[৫৬]

আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশব সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি প্রকাশ্যে আসার ঘটনাও রয়েছে উপন্যাসে। রাজনারায়ণ বসু আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা, তাঁর মেয়ে লীলাবতীর বয়েস সতেরো, তার সঙ্গে বিবাহ হবে কৃষ্ণকুমার মিত্রের। সম্বন্ধ করা বিয়ে নয়, পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখে মনোনীত করেছে। কৃষ্ণকুমার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবে ঠিক করেছে তাদের বিয়ে হবে সদ্য পাশ হওয়া 'সিভিল ম্যারেজ আইন' অনুযায়ী। এতে জাতি বিচার নেই, মন্ত্র কিংবা পুরুতের কোনো স্থান নেই, তরুণ ব্রাহ্মসমাজ এটাই মানে। আদি ব্রাহ্মেরা আবার ছিলেন ঘোর বিরোধী, কারণ রেজিস্ট্রি বিয়ে মানে তো নাস্তিকতা। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই বিয়ের বিপক্ষে। কন্যা বয়স্কা ও এই বিয়ের ভালো মন্দ বিচারে সক্ষম বিবেচনা করে রাজনারায়ণ বসু এই বিবাহে কন্যার মত জিজ্ঞাসা করেন এবং মেয়েটির মতের বিরোধিতা না করে তিনি বিবাহে মত দিয়েছিলেন, যদিও রাজনারায়ণ বসু সমেত কোনো আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতাই সেই বিবাহে যোগ দেননি। ঔপন্যাসিক এই ঘটনার সম্পূর্ণ উল্লেখ করেছেন ও চন্দনগরের মোরান সাহেবের বাড়ি থেকে এই বিবাহ উপলক্ষে গান রচনা করেছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত গানের গায়কদের দলে ছিলেন। এই গায়কদলে নরেনের উপস্থিতির ঐতিহাসিক সূত্র রবিজীবনীকারও সমর্থন

করেছেন। ঔপন্যাসিক ১৮৮২ সালের একটি ঘটনার সূত্রে এই দুই যুগসূর্যকে পাশাপাশি রেখেছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে সমান্তরাল ভাবে নিজেদের কর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। যাঁদের আলোয় আলোকিত হবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৪ শে অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের বিয়েকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা ঐতিহাসিক সূত্র রক্ষা করেই তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।

প্রখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র হিসেবে মেধাবী, বি.এ পাশ করে বিলেত যান আই সি এস পরীক্ষা দিতে। সামান্য বয়সের ব্যাপারে খুঁটিনাটি জন্য তিনি পরীক্ষায় পাশ করলেও তাঁকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি মামলা করেছিলেন এবং বাধ্য করেছিলেন মামলায় জিতে ইংরেজ সরকারকে তাঁকে নিয়োগপত্র দিতে। কিন্তু মামলায় জিতে চাকরি পাওয়া গেলেও নিয়োগকারীর আস্থাভাজন হওয়া যায় না। শ্রীহট্টের সরকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করতেন সুরেন্দ্রনাথ, তাঁর শ্বেতাঙ্গ উপরওয়ালা তাঁকে মোটেই পছন্দ করতেন না, একবার আদালতের কাজে সামান্য ত্রুটি দেখিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করা হল। এই অবিচারের প্রতিকারের জন্য আবার বিলেত গেলেন সুরেন্দ্রনাথ। সেখানেও সুবিচার পেলেন না, বিমুখ হয়ে ফিরতে হল। দেশে ফিরে সুরেন্দ্রনাথ আর কোনো কাজ পেলেন না। এদেশের মানুষ কর্তাভজা। তারা কেউ সুরেন্দ্রনাথকে ছুঁতে চাইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ সরকারী চাকরি আর পাবেন না, দেশের মানুষরাও তাঁকে চাকরি দিতে চাইল না। এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে ডেকে মেট্রোপলিটন কলেজে চাকরি দিলেন। যেখানে তিনি সূক্ষ্মভাবে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করেছিলেন দেশাত্মবোধ। অন্য একজন উজ্জ্বল ছাত্র আনন্দমোহন বসু ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ‘র‍্যাংলার’ হয়ে ‘স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন’ নামে ছাত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। সুরেন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন তাঁর

সঙ্গে। তিনি ‘Raise of the sikh power’ বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝাতে চাইলেন যে, আদর্শের দৃঢ়তা থাকলে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধেও সংবদ্ধ হওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকার সম্পাদক। ইংরেজ শাসকের নানা অব্যবস্থার সমালোচনা করেন। এই সময়ে নরিস নামে হাইকোর্টের এক বিচারক হিন্দু বাড়ির গৃহদেবতা তথা শালগ্রামশিলাকে অবমাননা করলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকায় এই ঘটনাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে লিখলেন, ওই বিচারক সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসার অযোগ্য। এরপর আদালত অবমাননার অভিযোগে দু’মাসের কারাদণ্ড হল সুরেন্দ্রনাথের। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের খবর নাড়িয়ে দিয়েছিল ছাত্রসমাজকে। এই প্রথম প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখানো হল রাজশক্তির বিরুদ্ধে। ছাত্রসমাজ ক্ষেপে উঠেছিল, বিভিন্ন স্থানে সভা করে বক্তারা প্রতিবাদ জানাতে লাগল। রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ হতো এভাবেই প্রথম অঙ্কুরিত হল। সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির পর বহুস্থানে তাঁকে সংবর্ধিত করা হল। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২ শ্রাবণ কলকাতার অনাথনাথ দেবের বাজারে একটি বিরাট জনসভা হয়। এই সভার বিবরণ বহু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা সমসাময়িক সময় থেকে ছিল বহুগুণ এগিয়ে। তাঁর দূরদৃষ্টি, সমাজবোধ, রাজনীতিবোধ অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক হুজুগের সমধর্মিতা লাভ করতে পারেনি। ‘ভারতী’ কার্তিক ১২৯০ তে ‘ন্যাশনাল ফান্ড’ প্রবন্ধে রবি ন্যাশনাল ফান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য political agitation বিরোধিতা করে তিনি লিখেছেন যে, “এই ব্যাপারটাই ন্যাশনাল নয় ও যাহারা বাঙ্গালা ভাষা অবহেলা করেন, ইংরেজীতে বাগ্মিতা প্রদর্শন করাই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারাই ইহার প্রধান, গোড়াতেই ইহার নাম হইয়াছে National Fund, ইংরাজীতেই ইহার উদ্দেশ্যে প্রচার হইয়াছে, আজ পর্যন্ত ইংরাজীতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে, people রাই আমাদের সহায়, people দের

জন্যই আমরা এতটা করেতিছি, people দের উপরেই আমাদের ভরসা। এসব ভাণ করিবার দরকার কি? People রা যে তোমাদের কথাই বুঝিতে পারেনা। ইংরেজি ভাষায় তোমাদের তর্জন গর্জন শুনিয়া যে সে বেচারিরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। যে সকল political agitation একমাত্র ব্যবসায় তার উপর আমার খুব একটা ভরসা নাই। আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই, ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়। ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পারি না। আর যদি তাহাই না পাই, তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। কারণ ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্ম নির্ভরতার ফল স্থায়ী।”[৫৭] এই ভাবনার সহধর্মিতা পোষণ করেছেন স্বয়ং ঔপন্যাসিকও। ১৮৮৪ তে রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশ ভাবনা সত্যিই অভূতপূর্ব। ঔপন্যাসিক তাঁর সময় সন্ধানের পথে এভাবেই রবীন্দ্রচিন্তার প্রবাহকে যুক্ত করেছেন যা সত্যই ক্রান্তদর্শী। উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী এভাবেই বিশ শতকে এসে খুঁজে পেয়েছে চিন্তার বহুতলীয় মাত্রা।

উপন্যাসে রবির বিবাহকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক কাদম্বরী দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনীর দ্বন্দ্বের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিত্বময়ী প্রকাশমুখী জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে চাননি কাদম্বরী। রবীন্দ্রনাথের সদ্য বিবাহিতা ভরতারিণী ঠাকুরবাড়িতে এসে হয়ে উঠেছিল মৃণালিনী। নতুন নামের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তুললেও তাকে নিয়ে মেতে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির সকলে। জ্ঞানদানন্দিনী ইংরেজ সমাজের ধারক ও বাহক। তাঁর কন্যা ইন্দিরা পড়ে লরেটো হাউসে। জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা পড়ে বেথুন স্কুলে। বেথুন স্কুল বাংলা মাধ্যম। সেখান থেকে প্রতি বছর অনেক নামকরা ছাত্রী পাশ করে। ব্রাহ্ম দুর্গামোহন দাসের

কন্যা অবলা দাস নামে একটি মেয়ে ঠিক করেছিল ডাক্তারি পড়বে। সেই সময়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হত না। অর্থাৎ মেয়েরা ডাক্তারি পড়তে পারত না। সেজন্য শেষ পর্যন্ত তাকে পাঠানো হয়েছিল মাদ্রাজে ডাক্তারি পড়তে। অবলার জেদ দেখে ইংরেজ সরকার তার জন্য মাসিক কুড়ি টাকা বরাদ্দ করেছিল। পরে অবলা দাস জগদীশচন্দ্র বসুকে বিবাহ করে অবলা বসু হন এবং নারী শিক্ষার প্রসারে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ইলবার্ট বিলের সময়ে সাহেবেরা যখন দেশীয় মানুষদের বিদ্যে বুদ্ধিকে হেয় করে চলেছিল তখন কামিনী সেন নামে একটি তেজস্বিনী ছাত্রীর নেতৃত্বে বেথুনের মেয়েরা বিক্ষোভ জানিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে ভরার আদেশ দিলেও বেথুনের সব ছাত্রী হাতে কালো ফিতে বেঁধে এসেছিল। অন্যদিকে লোরেটো হাউজে যীশুর জয়গান করে নিয়মিত প্রার্থনা করতে হয়। লরেটো হাউসে স্বদেশীয়ানা নিষিদ্ধ। ছাত্রীরা ভালো ইংরেজি শেখে। বিলিতি আদব কায়দা রপ্ত করতে হয়। পাস করার পর তারা বড় বড় সিভিলিয়ান ও ব্যারিস্টারের পত্নী হিসেবে বেশ মানিয়ে যায়। উপন্যাসে সরলার বেথুন স্কুল তাঁর মনে ইংরেজ সরকারের প্রতি বিরোধিতার ভাব এনেছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।’ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাঙালীর স্বাধীন চেতনার এহেন প্রকাশ নাড়িয়ে দিয়েছে সময়কে। যদিও রবির স্ত্রীর জন্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বরাদ্দ করলেন লরেটো হাউজ, তাকে রাখলেন নিজের কাছে। কাদম্বরী পড়ে রইলেন একাকীত্বের অন্ধকারে। নব্যসভ্যতার প্রথম আলোতে আলোকিত সব নারীই পেরে ওঠেনি সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতে। কারও অন্তঃকরণ উজ্জ্বল হয়ে নিভৃতে সেই আলো ছড়িয়েছে অন্যের মানসজগতে। কেউ বা নিজের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল করেছে জগৎ ও জীবনকে।

উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সরোজিনী’ জাহাজের শুভারম্ভের ঐতিহাসিক তথ্যকে সাহিত্যের সত্য করে তুলেছেন। সরোজিনীর আগেও ফ্লোটিলা কোম্পানি জাহাজ চালিয়েছে, কিন্তু সরোজিনী স্বদেশী জাহাজ, বাঙালীর জাহাজ, বাঙালীর গর্ব। এই জাহাজ নিয়ে ভারতবাসীর উৎসাহ প্রবল। ভারতবাসীর সদ্যজাগ্রত জাতীয়তাবোধের পালে হাওয়া লাগিয়েছিল এই সরোজিনী। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, ‘সরোজিনী’র সাফল্যের ছাত্ররাও উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জাতীয়তাবোধে জেগে উঠতে শুরু করেছে আপামর ভারতবাসী। “আপনারা বাঙালি, বাঙালির জাহাজ থাকতে আপনারা ইংরেজদের জাহাজে যাবেন কেন? দেশের টাকা কেন দেবেন বিদেশীদের। সাহেবরা কি আমাদের মানুষ বলে মনে করে? কতরকম অপমান করে, মনে করে দেখুন! আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঠাকুরবাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন। তবু কি বিদেশীর জাহাজে যেতে আপনাদের মন চায়?”[৫৮] একটি বারো তেরো বছরের লুঙ্গি পরা ছেলে নদীতে নেমে পড়ে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লেগেছিল। উপন্যাসে রবির মনে হয়েছে, “ইংরেজের সঙ্গেও যে প্রতিযোগিতায় নামা যায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চেতনা জাগল কী করে? সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর এদেশের মানুষদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, ইংরেজরা অপরাজেয়। শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা মহাশক্তিধর তারা সব দিক থেকেই এই কালো মানুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আবার কি সেই ভুল ভাঙছে? একটি সাধারণ কিশোরও সাহসের সঙ্গে সেই কথা বলতে পারছে।”[৫৯] যদিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের স্বদেশী জাহাজ রক্ষা পায়নি শেষ পর্যন্ত। জাতীয়তাবোধ তখনও স্বদেশী কোম্পানিকে রক্ষা করার মত প্রবল হয়নি ভারতীয়দের মনে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। বিদেশী ফ্লোটিলা কোম্পানির সঙ্গে অসম লড়াইতে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। শুধু আর্থিক ভাবে নয় সর্বতোভাবে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। একদিকে স্ত্রী বিয়োগ অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হয়ে তিনি হারালেন পরিবারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্মান।

জমিদারির আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষার দায়িত্ব ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবেন্দ্রনাথ দায়িত্ব দিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের ওপর। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ থেকেও চ্যুত করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ পেলেন রবি। চব্বিশ বছর বয়সে রবিকে একটা জুড়িগাড়ি উপহার দিলেন দেবেন্দ্রনাথ যা তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের বাড়িকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ছবি উঠে এসেছে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম বোম্বাই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিছু কিছু রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। উপন্যাসে উনিশ শতকের শেষপাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক সূত্রকে ঔপন্যাসিক সূক্ষ্মভাবে তুলে এনেছেন। তুলে এনেছেন জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের ইতিহাস। উঠে এসেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম ও তাঁর থিয়োসফিস্ট সোসাইটি। যদিও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা তাঁর সমসাময়িক চিন্তাশীলদের চেয়ে ভিন্ন। উপন্যাসে রবি ভেবেছন, "সবটাই যেন কথার ফুলঝুরি, উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিতদের বাকচাতুর্যই প্রধান হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর যোগ কোথায়? সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, একযোগে ভারতেও অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং পরীক্ষার্থীদের বয়স বাড়াতে হবে, কংগ্রেসের এই অন্যতম দাবিতে দেশের অবস্থার কী হেরফের হবে? ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়ছে চাকরি তত কমে যাচ্ছে, আরও চাকরি আদায়কে কেন্দ্র করেই যেন এখানকার রাজনীতি। সরকারের কাছে সব আবেদন বা দাবির মধ্যেই ভিক্ষের সুর।"[৬০] তাঁর আরও মনে হয়েছে, "এদেশের মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তোলাই উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। যার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে সে কখনও অন্যায় মেনে নেয় না।"[৬১]

রবি আদি ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব ও দায়ভার গ্রহণের পর তাঁর নানা স্থানে যাতায়াত বাড়তে থেকেছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারের ভারে জর্জরিত মুখগুলি দেখে তিনি পীড়িত হয়েছেন। দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে, বীরভূম বাঁকুড়ায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষে রবি উপলব্ধি করেছিলেন দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ওই মানুষদের জন্য সমবেদনা মূলক কবিতা রচনাই যথেষ্ট নয়। আগে মানুষগুলোকে বাঁচানো দরকার। রবি চাঁদা তোলার জন্য তৎপর হয়েছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে সাহায্য পাঠানো ওদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রবি আরও খানিকটা এগিয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের নতুন জমিদারি হয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলে। রবি প্রস্তাব করেছিল, খরা অঞ্চলের চাষিদের সুন্দরবনের আবাদি জমিতে বিনা পয়সায় তিনি বসাতে চায়। তাদের বাড়িঘর নির্মাণ ও কৃষির সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। রবি ভাবলেন, “বাঙালিদের এমনই অদ্ভুত স্বভাব, তারা নিজের বাড়িতে না খেয়ে মরবে , তবুও দূরে কোথাও যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চায় না। বিপদ দমন করার ঝুঁকির বদলে নিশ্চেষ্ট মৃত্যুতেও তারা রাজি।”[৬২] দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে রবি এই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, ক্ষুধা কি সাংঘাতিক জিনিস। অন্যান্য অনেক বিপদ মানুষের মনুষ্যত্ব জাগিয়ে রাখে। কিন্তু খিদেয় মনুষ্যত্বও দূর হয়ে যায়। খিদের সময় মানুষ যেন অত্যন্ত একটা ক্ষুদ্র প্রাণী, প্রায় পিঁপড়ের মতন। একমুষ্টি অন্নের জন্য মানুষ হন্যে হয়ে থাকে, সমস্ত মহৎ আশা, আদর্শ ধরাশায়ী হয়ে যায়, মানুষ তখন এমন দীন। রবি আরও একটা বিষয় বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা হল, শহরের কত অন্ন উদ্বৃত্ত হয়। বিয়ে, অন্নপ্রশান ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কত অপচয় হয় তার ঠিক নেই, রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় বাসি ভাত, লুচি, মাংস; তখন ক্ষুধিত মানুষগুলির কথা এই সব শহরবাসী মনে পড়ে না। আবার এইসব লোকেরাই রাজনীতি করতে গিয়েই জ্বালাময়ী বক্তা, দেশের মানুষের দুঃখে কেঁদে উঠে বুক ভাসায়।

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের আইডল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী জাহাজ ব্যবসার চিত্রর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে জেগে উঠতে থাকা জাতীয়তাবোধও অন্যদিকে বিদেশী ফ্লোটিলা কোম্পানি সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার বিবরণের মধ্য দিয়ে সময়ের স্বরুপকে তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে বাঙালী জেগেছে জাতীয়তার মন্ত্রে কিন্তু সেই মন্ত্র আপামর বাঙালীর চিন্তা চেতনায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। বিদেশী ধনী কোম্পানির সঙ্গে অসম লড়াইতে পারেনি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে। রবিজীবনীর পাতা ওলটালে এই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য সহজে সন্ধান করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৬ সালের ১লা মে রাজনারায়ণ বসুকে '২৫২ সার্কুলার রোড' থেকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, তাঁর সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়। তিনি জাহাজ চালানি কারবারে প্রবৃত্ত ছিলেন। ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে ভয়ানক প্রতিযোগিতা চলেছিল, সেই কারবারে তিনি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, ঋণজালে একেবারে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। যে টাকা মাসোহারা পেতেন তার সমস্তই সুদ দিতে ব্যয় হয়ে যাত। তাঁর নিজের নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ অতিকষ্টে নির্বাহ হত। 'প্রথম আলো'র প্রথম পর্বশেষ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন মৃণালিনীর সন্তানসম্ভবা হবার খবর।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রতির্ষ্ঠিত জমিদার, শিলাইদহ সাজাদপুরে বজরা চেপে জমিদারি পরিদর্শনে রত। তিন সন্তানের পিতা। সংসার জীবনে সুখী স্ত্রী মৃণালিনীকে নিয়ে, কিন্তু মৃণালিনী তার মর্ম সঙ্গিনী হতে পারেনি কিছুতেই। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তৈরী হয়েছে তাঁর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা। 'রবিকা'র ছায়াতেই বেড়ে উঠেছে ইন্দিরা। অন্যদিকে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথের কন্যা সরলা ইন্দিরার সমবয়েসী হয়েও অনেক বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিয়ে না করে কুমারী থেকে সে দেশের সেবা করতে চায়। এই সময়েই শিলাইদহ সাজাদপুর ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ চিনেছেন হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষের জীবন।

শিলাইদহে চিনেছেন অছিমুদ্দি সর্দার নামে এক কবিয়ালকে, চিনেছেন শিলাইদহ পোষ্ট অফিসের ডাক পিওন গগন হরকরাকে। সাজাদপুরে তাঁকে জমিদার হিসেবে হতে হয়েছে 'পুণ্যাহ অনুষ্ঠান' -এর অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানে তিনি জাতিভেদ প্রথা না মেনে সকলের সঙ্গে একাসনে বসেছেন, মানবতাবাদের মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রজাদের মধ্যে।

জানকীনাথ ঘোষালের বাড়িকে কেন্দ্র করেও এসেছে নবযুগ। সরলা দেবী সেই সময়ে দাঁড়িয়ে নারী হয়েও পড়েছেন পদার্থবিদ্যা। বেথুন কলেজে পড়ানো হত না পদার্থবিদ্যা। মহেন্দ্রলাল সরকারের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর দা কাল্টিভেশান সায়েন্স' -এর সান্ধ্য লেকচার শুনে পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে পাশ করে রূপোর মেডেল পেয়েছিলেন তিনি। বিয়ে না করে দেশের কাজে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, তার মনে হয়েছিল জীবন অনেক বড় কাজ করার জন্য, সংসার আর সন্তান পালন জীবনের ধর্ম নয়। 'ভারতী' পত্রিকার দায়ভারও তিনি তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। এই সময়েই সরলা পরিচিত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে। এই বাল গঙ্গাধর তিলক একদিকে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী অন্যদিকে প্রবল দেশ প্রেমিক। তাঁর রাজনীতি চেতনা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। বাঙালী তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তার মতের মিল হয়নি। তিনি সারা দেশে একযোগে হিন্দুদের জন্য গণেশ উৎসব বা শিবাজী উৎসবের সূচনা করতে চেয়েছিলেন।

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সম্পর্কে ভেবেছেন, "যাতে আত্মবমাননা করা হয়, তাতেই তো যথার্থ জাত যায়! ...আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভাঙা কুটিরের, সবচেয়ে মলিন চাষীকেও আমি আপনার লোক বলতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিটফাট কাপড় পরে ডগকার্ট হাঁকায়, আর আমাদের নিগার বলে তারা যতই সভ্য, যতই উন্নত হোক – আমি যদি কখনও তাদের কাছাকাছি যাবার জন্য লোভ করি, তা হলে যেন আমার মাথার ওপরে জুতো পড়ে।"[৬৩] কলকাতায় কংগ্রেসের

দ্বাদশ অধিবেশনের সময়ে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা বিপিনচন্দ্র পাল যখন দেবীমূর্তিকে দেশ মাতৃকার রূপ দিয়ে কংগ্রেসের আসনে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন, তখন রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনাকে সমর্থন জানাতে পারেননি। কংগ্রেসের মঞ্চে ইংরেজির আধিক্যও রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি, ভারতের একটি সর্বজন-বোধ্য ভাষার অভাব তিনি বোধ করেছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নাটোর কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ বক্তাদের বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রবীণ নেতৃবৃন্দ বাংলায় বক্তৃতা দিতে রাজি হননি কোনোভাবেই। তরুণদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করে শোনানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল আপামর সাধারণ মানুষকে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করা। যদিও সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ রবীন্দ্রনাথের বাংলাও ঠিক কতটা বুঝবে তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। উপন্যাসে ডব্লু সি ব্যানার্জি রবির কাঁধ চাপড়ে বাঁকা সুরে বলেছিলেন, “বাট ডু ইউ থিঙ্ক ইয়োর চাষাজ অ্যান্ড ভুষাজ আন্ডারস্টুড ইয়োর মেল্লিফ্লুয়াস বেঙ্গলি বেটার দ্যান আওয়ার ইংলিশ?”[৬৪]

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন ও সেই কারণে গড়ে ওঠা প্রবল অর্থচিন্তা, প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরার বিবাহ, দুই কন্যার বিবাহ, মৃণালিনী দেবীর অসুস্থতা ও মৃত্যু (২৩ শে নভেম্বর ১৯০২) ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে তাঁর সাহিত্যিক সত্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাময়িক কাল সবকিছু থেকে বিযুক্ত থাকলেও আবার যুক্ত হয়েছেন কর্মযজ্ঞে। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলে রবীন্দ্রনাথ সর্বত ভাবে তার বিরোধিতা করেছিলেন। এই সময় রচনা করেছিলেন একের পর এক দেশাত্মবোধক গান। ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ হয়ে উঠেছিল মিছিলের মুখপত্র। বয়কটের ডাক সমর্থন করেছিলেন তিনি, তাঁর আশা

ছিল "ইংরেজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বর্জন করে এই জাতি আত্মশক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠুক। এমনকি সংবাদপত্রে কালো বর্ডার দিয়ে বঙ্গভঙ্গের খবর ছাপা কিংবা সভায় দর্শকদের করতালিও তিনি পছন্দ করেন না, এগুলোও বিদেশের অনুকরণ।"[৬৫] তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন অরন্ধন ও রাখি বন্ধন ব্রতের সঙ্গে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টায় এগিয়েছিলেন বহুদূর। যদিও বঙ্গভঙ্গের বর্ষপূর্তির সময়ে তিনি আর যোগ দিতে চাইলেন না। রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে কবি ও গুরুদেব হিসেবেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে সরলা দেবীকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক নারী জাগরণের স্বরূপকে বুঝিয়েছেন। "ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও সরলা মহীশূরে চাকরি করতে গিয়েছিলেন নিছক ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্পৃহায়। পুরুষরা লেখাপড়া শেখে জীবিকা অর্জনের জন্য। সরলাও লেখাপড়া শিখেছে, তা সে কাজে লাগাবে না কেন? মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিছক ঘরের বউ হয়ে থাকবে, তা হলে সে শিক্ষার প্রয়োজন কী? স্বামীরা সগর্বে, কোনও বন্ধুকে বলবে, আমার স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট, ভাল সংস্কৃত জানে, আর স্ত্রী সেই সময় অন্দরমহলে বসে কোলের সন্তানকে দুধ খাওয়াবে, এতেই রমণী জীবনের চরম সার্থকতা? মহীশূরের মহারানি গার্লস কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট-এর চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল সরলা"[৬৬] যদিও সরলার এই স্বাধীন জীবন খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কলকাতা ফিরে তিনি 'ভারতী' পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে বেশ দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। সেই সঙ্গে দেশপ্রেমেও উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন সরলা। এই সময়ের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সরলার 'বিলেতি ঘুষি বনাম দেশি কিল'। তিনি এই রচনায় আহ্বান জানালেন ট্রেনে-স্টিমারে, পথে-ঘাটে গোরা সৈন্য বা ইংরেজ সিভিলিয়ানরা অনেক সময় ভারতীদের অপমান করে এমনকি লাথি-ঘুঁষি মারে এমনকি, কোন নারীদের অসম্মান করতেও দ্বিধান্বিত হয় না,

কোথাও কোনো ভারতীয় এমন ঘটনার প্রতিবাদ করে থাকলে তা যেন লিখে পাঠানো হয়। সরলার উদ্যোগে 'ভারতী'র পাতায় ছাপা হতে শুরু করেছিল এসব বৃত্তান্ত। সরলা দেবী উপলব্ধি করেছিলেন "অনেকেই দেশ সম্পর্কে উদাসীন, মাতৃভূমি যে বিদেশি শাসকদের অধীনে রয়েছে, সে বোধটাও যেন নেই। যে পরাধীন জাতি পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করে না, তাদের কি উদ্ধার পাবার কোনোও উপায় আছে?"[৬৭] সেই সময়ে দাঁড়িয়ে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সরলা দেবী। প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পুত্র উদয়াদিত্যকে আদর্শ করে বাংলার যুবসমাজকে সরলা দেবী উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তলোয়ার পুজার মধ্য দিয়ে বীরত্বের বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন। ভারতের মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হত, "তাদের পোষাক কতরকম, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ... এত মানুষ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, দেশকে মাতৃভূমি হিসেবে চিনতে শেখে, মাতৃভূমিকে পরাধীনতার অপমান থেকে মুক্ত করার জন্য একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায়, তা হলে শাসক সম্প্রদায় বিচলিত হবে না? ...কল্পনায় সে দেখতে পাচ্ছে জাগ্রত ভারত।"[৬৮] পুণায় দুজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ডের জেরে তিলককে গ্রেপ্তার করা হলে সরলা ভেবেছেন, "আমাদের দেশের ছেলেরা সত্যিকারের মুরোদ দেখিয়েছে! ইংরেজরা এবার বুঝুক, এ দেশের ছেলেরাও অস্ত্র ধরতে জানে। সরলার ধারণা তিলক নিশ্চয় আছেন এর পিছনে। তিলকের কারাবাসেও সে খুশি। ...মামলা চলুক, তাতে দেশের মানুষ আরও রাগে ফুঁসবে! আরও কয়েকটা র‍্যন্ড নিকেশ হবে!"[৬৯] যদিও চাপেকর ভাইয়েরা ও মহাদেব রাণাডে বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। সামান্য বিচারেই তাদের ফাঁসির আদেশ হয়ে গেল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই পাশ হল সিডিশান বিল। ইংরেজদের কোনো কাজের প্রতিবাদ করার পথও রইল না। এই ঘটনায় কোনো প্রতিবাদ সভাও হল না কলকাতায়। সরলা এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার দলের সদস্যদের মনে। তাদের অস্ত্র সংগ্রহেও প্রেরণা যুগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনই সন্ত্রাসবাদের পথ পছন্দ

করেনি, এই পথ তাঁর মতে ভ্রান্ত, তবুও চারজন সচ্চরিত্র যুবক নিজের জাতির সম্মান রক্ষার্থে অবলীলায় ফাঁসির দড়ি গলায় দিতে পারে এই ভাবনাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি।

সময় সন্ধানের পথে সুনীল রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড় করিয়েছেন বিবেকানন্দকে। তাঁর বিবর্তনের পথে চিনতে চেয়েছেন সময়ের বিবর্তনের স্বরূপ। উপন্যাসে প্রথম যখন নরেনকে দেখা যায় তখন তিনি জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন কলেজের ছাত্র, বি.এ পাঠরত। ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত উজ্জ্বল, কুস্তি করা সবল শরীর, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা ক্রিকেট খেলায় দক্ষ, রীতিমত সুগায়ক, পাখোয়াজ-এস্রাজের মত অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে জানেন, প্রবল তার্কিক ও আড্ডাপ্রিয়। বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপাচাপি শুরু হলেও নরেন রাজি হতে পারেননি, ভেবেছেন, "জীবন সম্পর্কে একটা দর্শন তৈরী করে নেবার আগেই ঝপ করে একটা বিয়ে করে সংসারী হয়ে যায় নেহাত গাড়লেরা। এ জীবন তো রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া একটা জিনিস নয়, দুর্লভ এই মানবজন্ম, এর সার্থকতার পথ অন্বেষণ করা, চিত্তবৃত্তি বিকাশের জন্য যত্নবান না হয়ে গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে পশুর সঙ্গে তফাৎ রইল কি!"[৭০] এই সময়ে নরেনের মনে জন্মেছে প্রবল সংশয়। ডেকার্তের অহংবাদ, হিউমের নাস্তিকতা, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এসব পড়েও তাঁর মনের মধ্যে রয়ে গেছে হিন্দু ঐতিহ্য, তাই উপন্যাসে বন্ধু ব্রজেনকে সে প্রশ্ন করেছে, "যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে যা বিশ্বাস করে এসেছে, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা যে ধর্মের বিধান আর সৃষ্টিকর্তার রূপ মেনেছেন, তা কি আমরা এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারি? যদি উড়িয়ে দিই, সেই অবিশ্বাসের যে শূন্যতা, তা সহ্য করা সম্ভব?"[৭১] ব্রজেন জানিয়েছেন, "ঈশ্বর আছেন কি নেই, এ নিয়ে মাথা ব্যথা করার দরকারটাই বা কী? এই যে এত প্রার্থনা, ধ্যান, পুজো-আচ্চা, নামাজ পড়া, উপোস, মানুষের জীবনে এর কোনো প্রয়োজন আছে? এসব বাদ দিয়েও তো দিব্যি চলে যায়। অক্ষয় দত্ত মশাই অঙ্ক দিয়ে কী

প্রমাণ করেছিলেন তুই দেখিসনি? উনি একটা ফর্মুলা দিয়েছিলেন। কৃষকরা সারাদিন পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে। তা হলে পরিশ্রম = ফসল। সেই সঙ্গে যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করে তাহলে পরিশ্রম + প্রার্থনা = ফসল। অর্থআআৎ প্রার্থনা = ০।”[৭২] নরেন এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল প্রবল ভূকম্প। রামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা তাঁর মনে এনে দিয়েছিল প্রবল সংশয়। রামকৃষ্ণের সম্মোহন একদিকে এনেছিন অবিশ্বাস অন্যদিকে প্রবল ভালবাসার আকর্ষণ। তিনি কোনোরকম বিধি নিষেধের জালে আবদ্ধ করতে চান না নরেনকে। “তুই যা খুশি খা, কোনও দোষ লাগবে না। শোর-গরু খেয়েও যদি কেউ ভগবানে মন রাখে তবে তা হবিষ্যান্নের তুল্য। আর শাক-পাতা খেয়েও যদি কেউ বিষয় বাসনায় ডুবে থাকে, তবে তা গরু-শোর খাওয়ার চেয়ে কোনো অংশে পবিত্র নয়।”[৭৩] এই চরম মানসিক সংকটের দিনে নরেনন্দ্রনাথকে এক ধাক্কায় বাস্তবের মাটিতে পৌঁছে দিয়েছিল তাঁর পিতার মৃত্যু। অর্থচিন্তা ও খাদ্যচিন্তার ভয়াবহতায় তাঁকে কাটাতে হয়েছিল বহু দিন ও রাত। উপন্যাসে দেখা যায়, “সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ তো ছেড়েছেই নরেন্দ্র, এখন সে আর দক্ষিণেশ্বরেও যায় না। ব্রাহ্মদের সভায় দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বর কিংবা ধর্মতত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়, তা সবই এখন নরেন্দ্রর কাছে অবান্তর বলে বোধ হয়। গরিবের আবার ঈশ্বর কী? ক্ষুধার্তের কাছে ধর্মের আবার কী প্রয়োজন? ধর্মের কথায় পেট ভরে?”[৭৪] দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেন নরেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রতি অদ্ভুত টানে তিনি পারেননি দূরে থাকতে। রামকৃষ্ণের স্পর্শে তাঁর হয় এক ধরণের দিব্য অনুভূতি। যদিও সেই অনুভূতি কেটে যায় অচিরেই, ফিরে আসে অন্ন এবং অর্থচিন্তা। এক রাতে নরেন কালীমূর্তির কাছে আত্মসমর্পন করলেন, যদিও মূর্তিকে বিশ্বমাতা রূপে গ্রহণ করেও চাইতে পারলেন না সংসারের সচ্ছলতা।

রামকৃষ্ণের অসুস্থতার সময়ে তাঁকে ভক্তরা কাশীপুরে একটি বাগান বাড়ি ভাড়া করে রাখলে নরেন তাঁর টানে মায়ের অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। আইন পরীক্ষার জন্য বইপত্র সঙ্গে থাকলেও পড়ায় মন বসে না। একদিকে সাংসারিক দায়বদ্ধতা অন্যদিকে বৈরাগ্যের প্রবল আকাঙ্খায় দগ্ধ হতে থাকেন নরেন। রামকৃষ্ণের তুলে দেওয়া গেরুয়া বস্ত্র পরে ধনী ভক্তদের অর্থ সাহায্য নেওয়া বন্ধ করে তারা গ্রহণ করেন ভিক্ষার পথ। শুধুমাত্র রামকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসায় কিছু প্রাণবান সদ্য যুবক মেতে উঠেছিলেন সন্ন্যাস ব্রতে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতেন 'নরেন শিক্ষে দেবে'।

রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর (১৬ আগস্ট ১৮৮৬) পরই শুরু হয় তাঁদের সন্ন্যাসের মূল পথ। বরাহনগরের সেই জীর্ণ পোড়ো বাড়িতেই রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরও বহুদিন মঠ বজায় রাখছিলেন তাঁরা, কিন্তু তাতে কৃচ্ছসাধন ছাড়া সদর্থক কিছু হচ্ছিল না। ফলে দলে ভাঙন দেখা দিতে শুরু করেছিল। এক এক জন মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছিল তীর্থযাত্রায়। নরেন ও দেশটাকে চেনার আশায় গ্রহণ করেন পরিব্রাজকের জীবন। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, শুরু হল তার পরিব্রাজক জীবন। পিছুটান নেই, সামনেও নির্দিষ্ট কোনও অভীষ্ট নেই। শুধু চলা, কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ট্রেনে। অঙ্গে গেরুয়া কৌপীন, হাতে একটি লম্বা লাঠি আর কমণ্ডলু, আর একটা পুটুলিতে থানকতক বই। পড়ার নেশা সে ছাড়তে পারে না। পড়ার ব্যাপারে তার বাছ বিচার নেই, সে যেমন বেদান্ত পড়ে কেউ ট্রেনের টিকিট কেটে দিলে ট্রেনে চাপে সেরকম কেউ না দিলে হাঁটে। কিছুর জন্য ব্যস্ততা তো নেই তার। নরেন কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির যেমন দেখতে যায়, তেমনি সে বারাণসীতে পণ্ডিতপ্রবর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তর্কে মাতে। ভক্তির জন্য সে জ্ঞানকে ছাড়েনি, আবার জ্ঞানের জন্য সে সৌন্দর্যবোধও বিসর্জন দেয়নি। এদেশে আগে

কেউ ইংরিজি বলা সাধু দেখেনি। শুধু ইংরিজি বলাই নয়, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান এবং চিন্তা ভাবনায় আধুনিক।

এভাবে পরিব্রাজক রূপে ভারত ভ্রমণের সময় তিনি উপলব্ধি করলেন প্রকৃত ভারতবর্ষকে। যাদের দুবেলা আহার জোটে না, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। দারিদ্রের এমন কুম্ভীপাক যে কেউ বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পায় না, শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, ধর্মের মর্মও বোঝে না। যে মহান ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে ভারতবাসীর গর্ব, তা অত্যন্ত নিম্নস্তরে পৌঁছেছে। তিরিশ কোটি মানুষ, তার মধ্যে শতকরা একজন মাত্র ইংরেজি শিক্ষিত। ইদানীং সে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা প্রচুর। তারা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার ইংরেজি শিখে জীবিকার সংস্থান করতে পারে না। ইংরেজ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য শোষণ, ভারতীয়দের নিজস্ব সম্পদ বলতে আর কিছু নেই। এইরকম অবস্থায় ধর্মেরও অধঃপতন হয়। জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ, যুক্তি মার্গ সব চুলোয় গেছে, এখন শুধু ছুঁৎ মার্গ। জাত পাতের হাজার বিভেদ। হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তর নেই, অন্য দেশে তারা ধর্ম প্রচার করতে যায়নি, অন্য ধর্মের মানুষদের হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে টেনে আনেনি কখনও, বরং নিজেদের ধর্মের মানুষদেরই জাতিচ্যুত করেছে। দেশের এই দুর্বিসহ অবস্থা দেখে নরেন ভেবেছেন, যে ধর্ম মানুষকে অপমান করে তা ধর্ম নয়, দেশের দারিদ্র দূর করা, অসহায় মানুষকে সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম। বরানগর মঠ ছাড়ার চার বছর পর নরেন সারা ভারত পরিভ্রমণ করে কন্যাকুমারীর একটা শিলাতটে বসে তার মনে পড়ল সারা দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের মুখ। মহাসমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে তিনি দেখলেন ভারতের মহা জনসমষ্টি, অভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন। এদের উদ্ধার করতে না পারলে ধর্মপ্রচার নিতান্ত অপপ্রয়াস। বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই। বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও যন্ত্র নির্মাণে পশ্চিম দেশগুলো অনেক এগিয়ে আছে। কিন্তু ওদের কাছ থেকে নিতে হলে কিছু তো দিতে হবে? এই রিক্ত হীনবল ভারতের দেবার মত স্বর্ণ নেই, শস্য

নেই, শুধু আছে কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও দর্শন। পশ্চিমের মানুষ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নানান দ্বিধা সংশয় ও নৈরাশ্যে ভুগছেন। তাদের কাছে গিয়ে বলা যেতে পারে তোমরা আমাদের উদরের অন্ন দাও আমরা তোমাদের মানসিক খাদ্য দেব।

নরেন ঠিক করলেন শিকাগোতে যে বিশ্বধর্ম সম্মেলন হচ্ছে সেই মঞ্চ থেকেই নিজের চিন্তাধারা পৌঁছে দিতে হবে। নরেন আরও ঠিক করলেন ভারতের মানুষের চাঁদার টাকায় ভারতের প্রতিনিধি হয়েই তিনি যাবেন। মাদ্রাজে পৌঁছে তিনি শুভানুধ্যায়ীদের জানালেন তাঁর পরিকল্পনা। মাদ্রাজী পেরুমল আলাসিঙ্গা সহ বেশ কিছু যুবক লিপ্ত হয়েছিলেন অর্থ সংগ্রহের কাজে। যদিও বিশাল পরিমাণ অর্থ মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। দেশীয় রাজাদের কাছে সাহায্য চাইলেন নরেন। খেতড়ির রাজা অজিত সিং সবচেয়ে উদার হস্ত প্রসারিত করলেন। অজিত সিং নরেনের পোশাকের পরিকল্পনা করে দিলেন। দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশে গেলে কেউ গ্রাহ্য করবে না, পরিচ্ছেদের ঔজ্জ্বল্যে আগে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চাই। সন্ন্যাস জীবনে ব্যবহৃত অন্য সমস্ত নাম বাদ দিয়ে খেতড়ির রাজা পছন্দ করলেন বিবেকানন্দ নামটি। নরেন হয়ে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি পৌঁছলেন শিকাগো। বহু সমস্যার কন্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে যখন তিনি মঞ্চে পৌঁছলেন তাঁর সহজ অভিব্যক্তি নাড়িয়ে দিল আমেরিকার শ্রোতৃ সমাজকে। সহস্র করতালিতে কেঁপে উঠল প্রেক্ষাগৃহ, জনতার উচ্ছ্বাসে জয়ী ঘোষিত হলেন বিবেকানন্দ। আমেরিকান পত্র পত্রিকায় তাকে অভিহিত করা হল ‘সাইক্লোনিক হিন্দু’ নামে। আমেরিকার শিক্ষিত সমাজের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন প্রবল ভাবে জনপ্রিয়। শুধুমাত্র বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে নয়, আরও অনেকগুলি আলোচনা চক্রে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় এক দারুণ আকর্ষণী শক্তি আছে। যে সব সভায় অনেক বক্তা সে সব সভায় বিবেকানন্দের ডাক পড়ে সবার শেষে। অন্যান্যদের বক্তৃতা শুনতে

শুনতে শ্রোতারা ঝিমিয়ে পড়লেও বিবেকানন্দের বক্তব্য সকলকে উজ্জীবিত করে। আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

এই সময়ে শিকাগোর শ্লেটন লাইসিয়াম ব্যুরো নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাঁর সঙ্গে একটা তিন বছরের চুক্তি করে ফেলল, তারা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করবে, টিকিট বিক্রির টাকা বক্তা ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটি ছিল বিবেকানন্দের জন্য ভীষণ উপযোগী। তিনি ভারতের ধর্ম ও বাণী প্রচার করার জন্য এদেশে এসেছেন, সহসা ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না, তাঁর পক্ষে নানা শহরে ঘুরে ঘুরে ঘর ভাড়া করা, টিকিট বিক্রি করা সম্ভব নয়, সুতরাং এই ভার অন্যের ওপর চাপানোই শ্রেয়। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে কী এরকমভাবে অর্থ উপার্জন শ্রেয়? চুক্তিটি করার সময়ে তিনি আমেরিকায় তাঁর নবলব্ধ বন্ধুদের কারো সঙ্গে পরামর্শ করেননি, দেশেও কাউকে জানাননি। অর্থ উপার্জনের ব্যপারে বিবেকানন্দ একটা যুক্তি তৈরী করে নিলেন, ভারতে একজন সন্ন্যাসী গাছতলায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু শীতের দেশে তা সম্ভব নয়। ভারতে সাধু সন্ন্যাসী দেখলে পুণ্য অর্জনের আশায় মানুষ তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। এদেশেও তিনি অনেকেরেই আতিথ্য পেয়েছেন, কিন্তু মাঝেমধ্যে তাকে হোটেলেও থাকতে হয়েছে, তাছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত কিছু খরচ রয়েছে। তাছাড়া অনেক টাকা জমিয়ে সে টাকা তিনি দেশে পাঠাবেন, দেশে শিল্প স্থাপন করতে না পারলে দেশের দরিদ্রদশা কোনোদিনও ঘুচবে না।

বহু শহরে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে তিনি প্রচার করতে লাগলেন হিন্দু ধর্মের ও ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের মহত্ব। দেশের নানা কুসংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে ভারতবর্ষকে কালিমালিপ্ত করলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, “আমাদের দেশে ধর্মান্ধতা আছে, কুসংস্কার আছে। আমরা যখন ধর্মান্ধ হই, আমরা জগন্নাথ দেবের

বিরাট রথের চাকার সামনে লাফিয়ে পড়ে নিজেই নিষ্পেষিত হই, নিজেদের গলায় ছুরি দিই কিংবা কন্টকশয্যায় শুই। কিন্তু তোমরা যখন ধর্মান্ধ হও, তখন তোমরা অন্যের গলায় ছুড়ি চালাও, অন্যদের আগুনে পোড়াও, তাদের জন্য কন্টকশয্যা তৈরী করো, নিজেদের চামড়া তোমরা নিজেদের সাবধানে বাঁচিয়ে চলো।’’[৭৫] চার মাস মতো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থেকে তারপর বহু অর্থের বিনিময়ে তিনি এই চুক্তি থেকে মুক্তি পেলেন। আমেরিকায় তিনি বহু ধনীর বাড়িতে বাস করে বক্তৃতার আয়োজন করে তিনি নিজের কথা পৌঁছতে লাগলেন সকলের কাছে। এ দেশের নারীদের স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বিবেকানন্দ। গোড়া থেকে নারীদের সংখ্যাই বেশি। এঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর মা কিংবা বোনের মতন সম্পর্ক। তবে খ্রিস্টান মিশনারিরা বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা দেখে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে নানা কুৎসা রটাতে শুরু করেছিল। বিবেকানন্দের বক্তৃতায় তাদের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছিল। তাঁর বক্তৃতা শুনে অনেকেরই ধারণা হচ্ছিল যে দেশে এমন উচ্চ ধর্মীয় ভাব আছে সে দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য মিশনারি পাঠাবার কী দরকার। খ্রিস্টান মিশনারিদের আয় কমে যেতে লাগল। আর বিবেকানন্দ ঘুরে ঘুরে ডলার পকেটস্থ করতে লাগল। একজন সন্ন্যাসীকে বাতিল করার সবচেয়ে বড় উপায় হল তাঁর চরিত্র হনন করা, পাদ্রিরা বিভিন্ন পরিবারে বেনামী চিঠি পাঠাতে লাগলেন, দুশ্চরিত্র বিবেকানন্দকে যেন কোনো বাড়িতে স্থান দেওয়া না হয়। শিকাগোয় তিনি প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন লায়ন পরিবারে। তবে তাঁর সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল হেল পরিবারের সঙ্গে। বস্টনের কাছে কেমব্রিজে থাকেন শ্রীমতি অলি বুল। তিনি একজন ধনী বিধবা। কেমব্রিজের জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবী মহলে এই প্রৌঢ়ার বিশেষ স্থান আছে। প্রায়ই তাঁর বাড়িতে নানা বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ঘটে, খানাপিনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাঙ্গের আলোচনা হয়, শ্রীমতি ওলি বুল এখানে ইউরোপীয় প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। ইউরোপের সমাজে নারীরা শুধু সংসারের তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকেন না, তাঁরা কবি

শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষক হন। এই অলি বুলের বৈঠকখানায় বিবেকানন্দ কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবন দর্শনে সকলে মুগ্ধ হয়ে যান। বেসী স্টার্জেস ও জোসেফিন ম্যাকাউল দুই বোন। বেসীর ডাকনাম বেটি আর জোসেফিনের ডাকনাম জো, আমেরিকান সমাজের ওপর মহলে এই দুই বোনের খুব সমাদর, এরা দুজনেই কিছুদিন ফ্রান্সে কাটিয়ে এসেছে, প্যারিসের শিল্পী, লেখক, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংস্পর্শে এদের সাংস্কৃতিক রুচি উন্নত হয়েছিল। আমেরিকানরা ফরাসী সংস্কৃতি ও আদব-কায়দাকে বেশ সমীহ করে, সুতরাং তাদের চোখে এই দুই বোন অন্যদের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয়। বেটি আর জো নিয়মিত ছবির প্রদর্শনী দেখে, কনসার্ট বা থিয়েটার বাদ দেয় না, বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তৃতা শুনতে যায়। বিবেকানন্দের বক্তৃতা এই দুই বোনকে মোহাবিষ্ট করেছিল। বিবেকানন্দের ভাষণের প্রতিটি শব্দ তারা মনে গেঁথে নিতে চায়, নিজের খরচে তারা নিয়োগ করল একজন শ্রেষ্ঠ স্টেনোগ্রাফার, যিনি প্রতি মিনিটে দুশো শব্দ লিখতে পারে।

আমেরিকায় বহু গুণীজনের কাছে আদর পেয়েও তিনি দেশের মানুষের সার্বিক উন্নতির পথকে প্রশস্ত করার চিন্তা ত্যাগ করেননি। ভেবেছেন, "আমার স্থান এখানে নয়, স্বদেশে। দুঃখী, বঞ্চিত মানুষগুলোকে জাগাতে হবে, তারা মানুষ হিসেবে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার দাবী করবে।"[৭৬] অন্যতমা অনুরক্তা জো ম্যাকাউলের সঙ্গে তিনি পৌঁছেছিলেন ইউরোপ। সেখানে তিনি অনুভব করলেন, "আমেরিকার তুলনায় ইউরোপে বর্ণবিদ্বেষ কম। একা একা রাস্তায় ঘুরলেও ফেউ এর মত একপাল ছেলেমেয়ে ব্ল্যাকি ব্ল্যাকি বলে তাড়া করে না। আমেরিকায় ছোটো কিংবা মাঝারি হোটেলে কালো চামড়ার লোকেদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, এমনকি নাপিতের দোকানেও চুল কাটতে প্রত্যাখ্যান করে, ইংল্যান্ডে সে সব সমস্যা নেই। স্বামীজির বক্তৃতায় যেসব নারী পুরুষ আসে, তারা ধৈর্যশীল শ্রোতা, যে কোনো বিষয়ই তারা গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা

করে, সেই তুলনায় আমেরিকানরা ছটফটে। অধিকাংশ আমেরিকানই কূপমণ্ডূক, ইংরেজরা পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। এসব দেখে স্বামীজির মনে হয়, ভারত শাসনের জন্য যেসব ইংরেজদের পাঠানো হয়, তারা বেশির ভাগই ছ্যাঁচড়া ধরনের। তারা ইংরেজ জাতির কুলাঙ্গার।"[৭৭]

দীর্ঘ সময় আমেরিকাতে কাটানোর ফলে এমন কয়েকজন লোককে বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন যাঁরা বেদান্তের মানবধর্ম প্রচারের কাজ করতে চেয়েছিলেন। আমেরিকার সহস্রদ্বীপে থাকার সময়, স্বামীজি তাঁর ভক্তদের দীক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, ল্যান্ডসবার্গ ও মেরি লুই হলেন কৃপানন্দ ও অভয়ানন্দ। আমেরিকান নারী পুরুষরা নিজেদের নাম বর্জন করে ভারতীয় নাম গ্রহণ করতে লাগলেন। লন্ডনে এসেও তিনি মন দিলেন তাঁর আদর্শ প্রচারে। শ্রীমতি মুলার এবং শ্রীযুক্ত স্টার্ডির উৎসাহে বক্তৃতাস্থানের ব্যবস্থা হয়ে গেল,প্রথম থেকেই উৎসাহী লোক আসতে থাকল দলে দলে। সংবাদপত্র গুলোও মনোযোগ দিল তাঁর দিকে। ক্রমে দিনে দুবার বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। তাঁর বক্তৃতায় যেমন থাকে ইতিহাস শাস্ত্র, দর্শন, যেমন থাকে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাও তেমন বাদ যায় না। আমেরিকায় যেমন তিনি আমেরিকানদের ধনতান্ত্রিক উন্মত্ততার কথা বলতে ছাড়েননি, এখানেও তেমনি ইংরেজদের যুদ্ধনীতি ও শাসনের উন্মত্ততার কথা বলতে পিছপা হননি। এখানেই বিবেকানন্দের প্রতি মুগ্ধ হলেন তাঁর অন্যতমা অনুগামিনী মার্গারেট নোবেল। স্বামীজির ত্যাগের আদর্শে তিনি হয়ে উঠলেন মুগ্ধ। তাঁর আহ্বানে সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেও তিনি দ্বিধা করলেন না।

এক বস্ত্রে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্রায় কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি রওনা দিয়েছিলেন, চার বছর পর ফিরে এলেন রাজকীয় মহিমায়। ভারতে ফিরে তিনি পেতে শুরু করলেন বিপুল সংবর্ধনা যখন ইংল্যান্ডে বক্তৃতা সভাগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল বেশ কয়েকজন সক্রিয় শিষ্য ও কর্মী পাওয়া গেছিল তারই মধ্যে একদিন তিনি ঠিক করলেন দেশে ফিরে আসবেন। বিদেশে যতই সাফল্য আসুক দেশে তাঁর গুরুভাইরা অনেকটা

দিশেহারা অবস্থার মধ্যে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের নামে তারা সংসার ছেড়েছে, তাদের সকলকে এক নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে এনে একটি সঙ্ঘ বা মিশন স্থাপন করতে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেবামূলক কাজে। এতকাল হিন্দুধর্ম শিখিয়েছে শুধু ব্যক্তি মানুষের মুক্তির কথা। চতুর্দিকে এত অভাব, এত দারিদ্র, এত বঞ্চনা, এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে যদি নির্জনে একা তপস্যা করো, তা স্বার্থপরতারই নামান্তর, অন্য সব ধর্মে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানবসেবার উদ্যোগ থাকে, হিন্দুধর্মে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনো কাজ করার ধারণাই নেই, সেই কারণেই হিন্দুধর্মের এত অবনতি। কোনো হিন্দু সন্ন্যাসী সচরাচর যে কথা বলেন না, বিবেকানন্দ উচ্চারণ করলেন সে সার সত্য। মুর্তিপূজা প্রকৃত পূজা নয়। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী এদের মধ্যে যিনি শিবের দর্শন করেন তিনিই যথার্থ শিবোপাসনা করেন। শিবের সন্তানদের সেবাই প্রকৃত শিবসেবা, যে ব্যক্তি প্রতিমার মধ্যে শিবপাসনা করে সে প্রবর্তক মাত্র। তিনি উচ্চারণ করলেন এমন কিছু শব্দ যা কোনো সন্ন্যাসীর পক্ষে বলা প্রায় অসম্ভব। মাদ্রাজের শেষ বক্তৃতায় বললেন, এখন পুজো-টুজো সব বন্ধ থাক। আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কটা বছর ভুলে থাকলে ক্ষতি নেই, সেই সব দেবতারা এখন ঘুমাচ্ছে, দেশের মানুষই জাগ্রত দেবতা। দেশের ভয়াবহ দুরবস্থায় তিনি ধর্মের কথা উচ্চারণ করে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন, দেশের মানুষকে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে। ভক্তির বদলে যুক্তির যুগ এসেছে।

ইউরোপ আমেরিকায় দীর্ঘসময় কাটিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, যারা খুব ধনী তাদেরও অভাব থাকে, আহার বিহারে কোনো অভাব না থাকলেও তারা মানসিক দিক থেকে বুভুক্ষু। তাই তিনি চেয়েছিলেন আদান প্রদানের সম্পর্ক। বলেছিলেন, “ওদের কাছ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের নিতেই হবে, তার বদলে আমরাও দেব এক

উদার ধর্ম দর্শন, যাতে শান্তির সন্ধান পাওয়া যাবে।”[৭৮] হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সগর্বে উচ্চারণ করেছিলেন, আগে মানুষকে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর ধর্ম। “দারিদ্রই সব রোগের মূল। দারিদ্র মানুষকে একেবারে নির্জীব, কাপুরুষ করে দেয়। আমার গুরু বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। আমিও মনে করি, এমনকী এ দেশের একটা কুকুরও যতদিন অভুক্ত থাকবে ততদিন বেদ-পুরান-কোরান-বাইবেল চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই। দেশবাসীর অন্ন জোগানোর ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো ধর্মেরও প্রয়োজন নেই।”[৭৯] শেষ পর্যন্ত তিনি মানবজাতিকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চান, যেখানে বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরানও নেই। তিনি ভেবেছিলেন শূদ্র জাগরণের কথা। যারা জাতির মেরুদণ্ড, তারাই কিনা জাত, পতিত, অচ্ছুৎ। এদের উন্নতি ঘটাতে না পারলে গীতা, বেদ, বেদান্ত সব মিথ্যে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে বিরাট কর্মযজ্ঞে যোগদান করার পর নিবেদিতা এলেন তাঁর অনুগামী হয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞে। তিনি নানা বাধা সত্ত্বেও এদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তিনি নিজেকে করলেন নিয়োজিত। প্রথমে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বামীজির দূতি হিসাবে মানুষের সেবা করবেন এবং ভারতবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার ব্রত নিয়েই তিনি এগিয়ে যাবেন, কিন্তু যত তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতে লাগলেন, তত উপলব্ধি করলেন এদেশের কোটি কোটি মানুষের মুখে লেখা আছে পরাধীনতার জ্বালা, বেদনা, অপমান। এ দেশের দারিদ্র অশিক্ষা ইত্যাদির মূলে আছে পরাধীনতা। একটা স্কুল খুলে পনেরো কুড়িটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে কিংবা রোগ মহামারীর সময়ে দুচারটে বস্তিতে সেবাকর্ম চালিয়ে সেই মূল সমস্যার গায়ে একটি আঁচড়ও কাটা যাবে না। বিদেশি শাসকদের দূর করে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনই এখন প্রধান কাজ। বিবেকানন্দের অনুগামী হিসেবে নিবেদিতা কালীর মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, কালী দ্য মাদার নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তিনি

অনুভব করলেন, এখন তাঁর নতুন বই লেখা উচিত, যে বইয়ের নাম হবে 'স্বাধীনতা'। তিনি অনুভব করলেন, স্বাধীনতার রূপ যে কী তা অধিকাংশ ভারতবাসী জানে না, বহু বছর ধরে পরাধীনতার অপমান সইতে সইতে স্বাধীনতার স্বাদ তারা ভুলে গেছে। ইংরেজরা যেন দেবতাদের মত অপরাজেয়। তাদের বিতাড়ন করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না বরং আবেদন নিবেদন ভিক্ষা চেয়ে কিছু সুযোগ সুবিধে আদায়ের চেষ্টা করাই তাদের কাছে শ্রেয়। পরাধীনতার জ্বালা এবং শোষিত নিষ্পেষিত ভারতীয় জনগণের অবস্থা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ সচেতন। প্রথম প্রথম ভারতে এসে নিবেদিতা সব কিছু দেখেই মুগ্ধ হতেন, ভারতে চুরি ডাকাতি নরহত্যার সংখ্যা খুব কম দেখে নিবেদিতা একদিন সব কিছু দেখেই মুগ্ধ হতেন, ভারতীয়রা শান্তিপূর্ণজাতি। তা শুনে স্বামীজী বলেছিলেন, এই জাতটা এমনি নির্জীব হয়ে গেছে যে ভালো করে গুণ্ডামি ডাকাতি করতেও জানে না। তিনি আরও বলেছেন, ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজদের পক্ষে এত সহজ হয়েছিল কারণ তারা ছিল সঙ্ঘবদ্ধ জাতি, নিবেদিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন নিপীড়িত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে তিনি নিজের অগ্নিশ্রাবী ভাষণকে কাজে লাগাবেন, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর মতে জগতের সেবা, অন্নদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান বেলুড় মঠ স্থাপনের এগুলিই প্রধান উদ্দেশ্য। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন, ভারত স্বাধীন না হলে এদেশের সুসন্তানেরাও বিশ্বের দরবারে যোগ্য মর্যাদা পাবে না। ধর্ম বিপ্লবের বদলে রাজনৈতিক বিপ্লবের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। এই সময়ে তিনি স্বামীজীর অন্য শিষ্যা জো ম্যাকাউলের কাছে জাপানের দূত অকাকুরার সন্ধান পেলেন। ওকাকুরার সঙ্গে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁর কাছে খুলে গেল নতুন দিগন্ত। ওকাকুরা শুধু পণ্ডিত নয়, তিনি স্বাধীনতার প্রবক্তা। একটি অশ্রুতপূর্ব তত্ব এনেছেন তিনি, এশিয়া মহাদেশের ঐক্য। এশিয়ার সব দেশগুলি মিলে ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। জাপান কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ভারতকে সহযোগী দেশ হিসেবে পেতে চায়। ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম

শুরু করলেই অইসব দেশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। ওকাকুরা সেই বার্তা নিয়েই ভারতে এসেছেন। কলকাতায় ওকাকুরার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর নিবেদিতা ওকাকুরার সহযোগী হয়ে গেলেন প্রথম দর্শনেই। যদিও আমৃত্যু স্বামীজী নিবেদিতার স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াকে মেনে নিতে পারেননি।

'প্রথম আলো' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পেরিয়ে বাঙালীর আত্মানুসন্ধানের ইতিবৃত্ত। সময় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় বিবর্তনের পথে, আর এই বিবর্তন ঘটায় উদ্বর্তন। সেখানে নিজের সত্তার সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে চরিত্রগুলি, বিবর্তনের পথে তারা হয়েছে উদ্বর্তিত। শিক্ষা বোধকে জাগ্রত করে, এই জাগ্রত বোধ আলো খুঁজতে চেয়েছে, নতুন আলো সরিয়ে দিয়েছে পুরোনো অন্ধকারকে। 'প্রথম আলো' এই আলোকিত সত্তার সার্বিকভাবে জেগে ওঠার ইতিবৃত্ত। আত্ম অনুসন্ধানের পথে বিবর্তিত চরিত্রগুলি বিশ শতকের প্রথম দশকে আবিষ্কার করেছে পরাধীনতার গ্লানি। আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়ার লড়াই তাদের এগিয়ে দিয়েছে উদ্বর্তনের পথে।

তথ্যসূত্রঃ

১। লেখকের কথা, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২। পৃ ১১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩। পৃ ১২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৪। পৃ ১৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫। পৃ ১৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬। পৃ ১৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭। পৃ ১৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৮। পৃ ১১৫, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৯। পৃ ৬২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১০। পৃ ২৫, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১১। পৃ ২৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১২। পৃ ৩০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৩। পৃ ৬৫, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৪। পৃ ৬৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৫। পৃ ৬৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৬। পৃ ৬৭ , প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৭। পৃ ১২৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৮। পৃ ১৩১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

১৯। পৃ ১৩১, ১৩২ প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২০। পৃ ১৩২ প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২১। পৃ ১৩৩ প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২২। পৃ ১৬৭ প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৩। পৃ ২০৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৪। পৃ ২১২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৫। পৃ ৩৪১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৬। পৃ ৬০১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৭। পৃ ৬০৩ , প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৮। পৃ ৪১৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

২৯। পৃ ৪৭২, ৪৭৩ , প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩০। পৃ ৭০১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩১। পৃ ৮৪৯,প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩২। পৃ ৮৬২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৩। পৃ ৯২১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৪। পৃ ৯৭৮, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৫। পৃ ১০০০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৬। পৃ ১০৩৩, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৭। পৃ ১১১১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৮। পৃ ৭২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৩৯। পৃ ৭২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৪০। পৃ ১০০, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৪১। পৃ ৭৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৪২। পৃ ১১৮, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৪৩। পৃ ৮০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৪৪। পৃ ৩৭৬, ৩৭৭ জুতা-ব্যবস্থা (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত), ভারতী জৈষ্ঠ ১২৮৮, সমাজ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পুণর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা

৪৫। পৃ ১৩৭, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৪৬। পৃ ১৪৬, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৪৭। পৃ ১৩০, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৮১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

৪৮। পৃ ১৩৬, জীবনস্মৃতি, , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৮১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

৪৯। পৃ ১৪৯, রবিজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯

৫০। পৃ ১৩৬, ১৩৭ জীবনস্মৃতি, , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৮১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

৫১। পৃ ২৪, ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৫২। পৃ ২১, ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৫৩। পৃ ৭৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৪। পৃ ৭৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৫। পৃ ৭৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৬। পৃ ৭৮, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৭। পৃ ৪০৩, ন্যাশনাল ফান্ড, ভারতী ১২৯০, সমাজ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পুণর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা

৫৮। পৃ ২৬৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৫৯। পৃ ২৬৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬০। পৃ ৩৪৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬১। পৃ ৩৫০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬২। পৃ ৩৫০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৩। পৃ ৫২৮, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৪। পৃ ৬৭৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৫। পৃ ১০০৯, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৬। পৃ ৬৬২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৭। পৃ ৬৬৫, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৮। পৃ ৬৬৮, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৬৯। পৃ ৬৮২, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭০। পৃ ১৩৪, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭১। পৃ ১৩৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭২। পৃ ১৩৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৩। পৃ ২০০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৪। পৃ ২৫০, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৫। পৃ ৫৫৩, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৬। পৃ ৫৬১, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৭। পৃ ৬১৩, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৮। পৃ ৬৩৬, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা ০৯

৭৯। পৃ ৭৭৭, প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ, কলকাতা

পঞ্চম অধ্যায়

‘পূর্ব-পশ্চিম’ : পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে শিকড় সন্ধানের ইতিহাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ‘সেই সময়’ উপন্যাস থেকে বাঙালী সংস্কৃতির প্রবাহ পথকে খোঁজার যে সচেতন প্রয়াস শুরু করেছিলেন, সেই প্রবাহ সমৃদ্ধ হয়েছে ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে। উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী হৃদয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই প্রবল হয়েছিল পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার স্বপ্ন। কিন্তু ১৯৪৭ -এর দেশভাগ বিদীর্ণ স্বাধীনতা বাঙালীকে দ্বিখন্ডিত করল, বাঙালী হৃদয়ের দীর্ঘ লালিত

স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ নেতাদের আচরণ দেশবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাকে নিয়ে গেল বিনষ্টির পথে। স্বাধীনতা উত্তর পর্বের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসকেই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে। এই বাংলা আর উনিশ বিশ শতকের অখন্ড বাংলা নয়, এই বাংলার মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে উঠে গেছে কাঁটা তারের বেড়া। দুই বাংলার বাঙালী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। পশ্চিমের দেশগুলির মূলস্রোতে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে বাঙালী। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা পঞ্চাশের মধ্যভাগে, কাহিনীর সমাপ্তি আশির দশকের মোহনায় এসে। এই চারটি দশক জুড়ে দুই বাংলার তথা বাঙালী জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের ওঠা পড়াকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক, বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রবাহের ইতিহাসে খুঁজেছেন নিজের শিকড়কে। 'পূর্ব-পশ্চিম' নামটি উপন্যাসে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রবাহ; পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের বৃহত্তর পটভূমি উপন্যাসে এসেছে। আবার মানুষের জীবনে ও মনে যে পূর্ব ও পশ্চিম, তার প্রবৃত্তি ও সামাজিক সত্তার যে দ্বন্দ্ব, মন ও মননে দেবতা ও দানবের একত্র সহাবস্থানই মানুষের মনুষ্যত্ব, এই দুইয়ের যে দ্বন্দ্ব তাও উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার লিখেছেন, "উনিশ শতক যেমন বাঙালির জীবনে নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের কাল, বিশ শতকের মধ্যভাগে দেশভাগ-পরবর্তী পঞ্চাশ থেকে আশির দশক শুধু পূর্ব পশ্চিমে ভেঙে যাওয়া বাঙালির জীবনের ওলট পালটের কালই নয়, পূর্ব পশ্চিমে অর্থাৎ এই পূর্ব গোলার্ধ ছেড়ে পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে যাওয়ারও কাল, সুনীল নিজেও যে কালস্রোতে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।... পূর্ব বাংলা, পশ্চিমবাংলা এবং পশ্চিম মহাদেশ এই ত্রিমাত্রিক পটে

পূর্বপশ্চিম উপন্যাস লেখা। বিভক্ত দুটি দেশ এবং বিদেশের বিশালভূমিতে ‘অনেক’ চরিত্রই গুরুত্ব পেয়েছে – ‘এক নায়কতন্ত্র’ নয়।”[১]

‘পূর্ব-পশ্চিম’ ঔপন্যাসিকের চোখে দেখা ইতিহাস। নিজের জীবনের ফেলে আসা সময়কেই তিনি গ্রহণ করেছেন উপন্যাসের প্লটে, ‘সেই সময়’ বা ‘প্রথম আলো’র মত সার্বিক ইতিহাস নির্ভরতা এখানে নেই। ‘লেখকের কথা’ অংশে তিনি জানিয়েছেন, “এই উপন্যাসের পশ্চাৎপটে আছে সমসাময়িক ইতিহাস, বেশ কিছু রাজনৈতিক পালাবদল, কিছু আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে উপস্থিত করা হয়েছে সরাসরি। এইসব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও বহু গ্রন্থ থেকে। কোনও কোনও আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি, যেমন জাহানারা ইমামের পারিবারিক ঘটনাটি আমি পেয়েছি তাঁর যুদ্ধকালীন ডায়েরি থেকে, যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।... ’৬৫-র যুদ্ধের সময়ে আমি ঢাকা শহরে ছিলাম না। তৎকালীন পরিবেশের বিবরণ আমি পেয়েছি কয়েকটি গ্রন্থে।”[২] যে সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষী সুনীল নিজে, সেই সময়কে চিত্রিত করতে গিয়ে উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে আত্মজৈবনিক উপাদান। দ্বিখন্ডিত বাঙালীর ছিন্নমূলতার বেদনা, দুই বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৬২, নেহেরুর মৃত্যু ১৯৬৪, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকালপ্রয়াণ ও ইন্দিরা গান্ধীর অভ্যুত্থান ১৯৬৪, ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ১৯৬৪, মৌলবাদের প্রাধান্য থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের বাংলা ভাষার জন্য জীবন দান ১৯৫২, মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার বাঙালী যুবকের নির্ভীক সংগ্রাম, পশ্চিম বাংলার বহু তাজা প্রাণের নক্সাল আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া, আশির দশক থেকে বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে ছড়িয়ে পড়া, মূলের থেকে দূরে গিয়েও চরিত্রগুলির শিকড়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণের চিত্র ‘পূর্ব-পশ্চিম’এ

ছড়িয়ে আছে। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের ঘটনাক্রম ১৯৫৫ সাল থেকে হলেও চেতনার প্রবাহে অতীত বর্তমান ভবিষ্যত একাকার হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ, তাঁর আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন' -এর অনেকটা জুড়ে রয়েছে তাঁর পূর্ববঙ্গের শৈশব স্মৃতির রোমন্থন। শুধুমাত্র ধর্মের কারণে বাঙালীর দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যাওয়াকে কোন দিন মেনে নিতে পারেননি সুনীল, তাঁর স্বপ্নের দেশ ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশ। সাহিত্যিক হিসাবে শীর্ষে পৌঁছনোর বহুপূর্ব থেকেই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আশা তাঁর হৃদয়ে ছিল প্রবল। প্রথম সংখ্যা 'কৃত্তিবাস' সম্পাদকীয়তে তিনি বলেছিলেন "বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে পাকিস্তানের কবিদের স্থান প্রায় অনুল্লেখ্য। তাতে কোন দুঃখ থাকত না যদি তাঁদের মধ্যে কেউ আশ্চর্য সার্থক কবিতাও লিখতেন। বাংলাদেশের শারীরিক মানচিত্রের মত কাব্যের মানচিত্রও খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উভয়বঙ্গে বাংলাভাষার পূর্ণ অধিকার সম্পর্কে যেন আমাদের কোনদিনও সন্দিগ্ধ না হতে হয়। পাকিস্তানের তরুণ কবিরা আমাদের সমদলীয়, সহকর্মীও। এ সংখ্যায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল না, কিন্তু আগামী সংখ্যায় আমরা নিশ্চয় সক্ষম হব।"[৩] একজন সদ্য যুবকের কলমে এই চেতনার প্রকাশ প্রমাণ করে বাংলা ও বাঙালীত্ব তাঁর সত্তার সঙ্গে ঠিক কতখানি জড়িয়ে আছে। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের কাহিনীতে পাশাপাশি বয়ে চলেছে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ।

পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করেছেন তাঁর বাবা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়কে। উপন্যাসে বহু চরিত্র গুরুত্ব পেলেও অন্যতম প্রধান চরিত্র প্রতাপ সুনীলের পিতারই স্মৃতিবাহী। প্রতাপ চরিত্রকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসে উঠে এসেছে দেশভাগ। পূর্ববঙ্গের মালখানগর। প্রতাপ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলো যুক্ত হয়েছে কাহিনীসূত্রে। উপন্যাসে কোনো বিশেষ চরিত্র প্রধান চরিত্রের মর্যাদা পায়নি, কিন্তু উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবসময়েই কেন্দ্রে

থেকেছেন প্রতাপ মজুমদার, পূর্ববঙ্গের মালখানগরের স্মৃতি তাড়িত এই চরিত্রটি গোটা উপন্যাস জুড়েই বহন করেছেন ছিন্নমূল হওয়ার বেদনা, কাহিনীবৃত্তে মিলে মিশে গেছে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ওঠা-নামা নিয়েই। নিজের আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন' -এ সুনীল লিখেছেন, "আমার বাবা দেশভাগ কিছুতেই মানতে পারেননি। তাঁর মতে, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব, ইংরেজরা তাড়াহুড়ো করে কাটা ছেঁড়া করে দিয়ে গেছে, দেশের মানুষ আবার মিলেমিশে যাবে, মুছে ফেলবে এই কৃত্রিম সীমারেখা, বারবার জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন এই কথা, এবং আমৃত্যু তাঁর এই বিশ্বাস ছিল।"[৪] উপন্যাসে প্রতাপ মজুমদারের বাবা ভবদেব মজুমদারেরর মধ্যেও এই বিশ্বাসের অনুবর্তন দেখা গেছে, পূর্ববঙ্গকে তিনি ছাড়তে পারেননি, ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "হিন্দুস্তান পাকিস্তান তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হত। এতকালের চেনা মানুষ কখনো হঠাৎ শত্রু হয়ে যেতে পারে? পিতৃপুরুষের ভূমি ছেড়ে কেউ চলে যায়?... শ্রী অরবিন্দ নাকি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, দশ বছরের মধ্যে ভারত পাকিস্তান এক হয়ে শুরু হবে নতুন ইতিহাস।"[৫] মালখানগর ছেড়ে যখন সমস্ত আত্মীয় বন্ধু চলে আসছিলেন কলকাতায় তখন ভবদেব মজুমদার জলের দামে কিনে রেখেছিলেন তাদের বাড়িঘর সম্পত্তি, আশ্বাস দিয়েছিলেন, ফিরে এলে এই দামেই তাদের সবকিছু ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যদিও তার এই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে প্রতাপ বুঝতে পেরেছিলেন এবার চিরকালের মতন মালখানগরের পাট তুলতে হবে... ভবদেব মজুমদার তাঁর যে সব নতুন বাড়ি জমি কিনে রেখেছিলেন সে সব তো ছাড়তে হলই, তাঁদের নিজস্ব বসতবাড়ি ও পুকুর বাগানের জন্যও খদ্দের পাওয়া গেল না। যা কিছুদিন পর এমনিই পাওয়া যাবে সাধ করে তা আর কে পয়সা দিয়ে কিনতে চাইবে।"[৬] মালখানগরের পাট ওঠার পর প্রতাপের মা সুহাসিনী দেবী তাদের দেওঘরের বাড়িতে মেয়ে শান্তি ও জামাই বিশ্বনাথ গুহকে নিয়ে প্রকৃতির কোলে শুরু করেছেন

নতুন জীবন, কলকাতার শহুরে পরিবেশে তিনি মানিয়ে নিতে পারেননি। দেশভাগ এই প্রৌঢ়া বিধবা রমণীকে করেছে শিকড়চ্যুত।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে প্রতাপ তার স্ত্রী মমতা, দুই ছেলে পিকলু, বাবলু(অতীন), প্রতাপের দিদি সুপ্রীতি, তার স্বামী অসিতবরণ, তাদের কন্যা তুতুল, প্রতাপের বৈমাত্র ভাই কানু, মমতার দাদা ত্রিদিব, তার স্ত্রী সুলেখা, সমাজসেবী আধুনিকা চন্দ্রা, অধ্যাপক অসমঞ্জ রায়, উদ্বাস্তু নেতা হারীত মণ্ডল, তার স্ত্রী গোলাপী, তাদের পুত্র সুচরিত, প্রতাপের বন্ধু বিমানবিহারী তার কন্যা অলি ইত্যাদি বহু চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন স্বাধীনতা পরবর্তী কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বনাথ গুহ, সত্যেন ভাদুড়ী, বুলা ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে দেওঘরের প্রক্ষাপটে দেখিয়ে সময়ের সন্ধান করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে, দেশকে আর কেউ জননী বলে মনে করেনি। দেশ হয়ে উঠেছে নিছক গ্রাসাচ্ছদনের পটভূমি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ছাটাই, ভোগ্যপণ্যের অভাব এবং অনটনের জন্যে ছাত্র ও যুবসমাজ জাতীয়তাবাদ ছেড়ে মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকেছে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ও যুবশাখা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সরকার বিরোধী মিছিল সমাবেশের ওপর লাঠি, গুলি ও টিয়ার গ্যাস চলেছে ব্রটিশ কায়দায়। গণতন্ত্র প্রতি পদে হয়েছে ধূলুন্ঠিত। মহাত্মা গান্ধীকে জাতির পিতা আখ্যা দিয়ে মাটির মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

উপন্যাসে প্রাণচঞ্চল বিশ্বনাথ রোজগারে অপারগ হলেও উদার এবং আনন্দপ্রিয়, টাকাপয়সার টানাটানি থাকলেও সকালবেলাতেই তা নিয়ে আলোচনা তিনি পছন্দ করেন না। নিজের সাধনা গান বিক্রি করে অর্থ উপার্জন তিনি করতে চান না। যদিও অর্থের অভাব এই রকম

আপনভোলা মানুষকেও পরিণত করেছে দালাল শ্রেণীর মানুষে। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক দুর্দশা কীভাবে বদলে দিয়েছিল মানুষকে, উপন্যাসে এই বিশ্বনাথ চরিত্রটির অধঃপতিত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সমাজ মানসের অধঃপতনের স্বরূপকে। বিশ্বনাথ বলেছেন, "আমরা ছিলাম ল্যান্ডেড জেন্ট্রি, হঠাৎ ডিসক্লাসড হয়ে গেছি, তার মূল্য দিতে হবে না? নিজস্ব বাড়ি ছিল, জমিজায়গা ছিল, তার থেকে আয় ছিল, সেই ভরসাতেই গঠন করেছিলাম যৌবনকাল। সব মানুষ কি আর জীবিকার ধান্দায় ঘুরবে, কিছু কিছু মানুষ তো উৎকট খেয়াল নিয়েই থাকবে। এখন সেসব নেই, হঠাৎ সব খুইয়ে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়লে পারব কেন? আমাদের মতন কিছু মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে! এটাকে নিয়তি বলতে পারো।"[৭] প্রতাপের দিদি সুপ্রীতির স্বামী অসিতবরণের চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়েও ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন স্বপ্নের স্বাধীনতার স্বরূপ। উপন্যাসে অসিতবরণ "সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, সেখানে ঘুষের রাজত্ব। অসিতদা একটা ঘুষের র‍্যাকেট ধরে ফেলে ছিলেন, ফুড মিনিস্টার প্রফুল্ল সেনের কাছে নোট পাঠাতে যাচ্ছিলেন। সেইসব ঘুষখোর কর্মচারীরা, তাদের মধ্যে দুজন জেলখাটা স্বদেশি, একটু আগে জানতে পেরে অসিতদার প্রাণের ভয় দেখাত, বাধ্য হয়ে, চাকরি ছাড়তে হয়। তারপর থেকেই ওঁর মাথায় গোলমাল দেখা যায়।"[৮] চাকরি যাওয়ার পর পৈতৃক কাশীপুরের বাগানবাড়ি উদ্বাস্তুরা দখল করলে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে হাতাহাতিতে মৃত্যু হয় অসিতবরণের। তার মৃত্যুর দায়ভার পড়ে উদ্বাস্তু নেতা হারীত মণ্ডলের ওপর। গ্রেপ্তার হতে হয় তাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে আর থাকতে পারেননি সুপ্রীতি। আশ্রয় নিয়েছেন প্রতাপের সংসারে।

প্রতাপের বৈমাত্র ভাই কানুও নানা অসৎ পথ গ্রহণ করে গড়ে তুলেছিল নিজের ভবিষ্যতের পথ। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সময়ের স্বরূপ, "কানুর উপার্জনের পথটি পুরোপুরি অবৈধ নয়। বরং বলা যেতে পারে এক ধরণের ব্যবসার উদ্যোগ। সে কন্ট্রোলের শাড়ি কিনে এনে ফুটপাতের দোকানে বেচে দেয়।... প্রতি শাড়িতে দু'টাকা তিন টাকা মুনাফা। শাড়ি যখন সহজে পাওয়া যেতে লাগল, তখন কানু চলে এলো কয়লায়। কয়লারও রেশন। এখন দেশে প্রায়ই কোনও না কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। সরকার তখন সেগুলো কন্ট্রোল দরে দেবার চেষ্টা করে। সেটা একটা নিয়ম রক্ষা মাত্র, অতি অল্প লোকেই তা পায়। যারা পায় তাদের মধ্যেও আবার কানুর মতন মানুষই বেশী।"[৯] প্রতাপের সততার প্রতি করুণা করে কানু ভেবেছে, "সেজদা সবসময় সততার গর্ব করে, অশেষ দুঃখ আছে সেজদার কপালে। এই যুগটাই যে অন্যরকম।"[১০] প্রতাপের সততায় কিছুদিন একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে এসব থেকে দূরেও ছিল কানু, কিন্তু অচিরেই সেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে কানুকে আবার বেছে নিতে হয় অসৎ পথ। যে জীবনে ছমাস জেল খাটতে হলেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ বা সামাজিক প্রতিপত্তির অভাব থাকে না। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সময়ের স্বরূপ, ডারইউনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন এর তত্ব, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নীতি ও আদর্শের পথ থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়েছিল মানুষকে।

স্বাধীনতার পর দ্বিধাবিভক্ত দুই দেশের কর্ণধার হয়েছিলেন দুজন বিলাত ফেরত শিক্ষিত ব্যারিস্টার। জহরলাল নেহেরু এবং মহম্মদ আলি জিন্না। যদিও জিন্না বেশিদিন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি, তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, রাজার চার পাশে যেমন

মোসাহেবরা ঘিরে থাকে সেই রকমই কংগ্রেসি শাসকদের সঙ্গে জুটতে লাগল ধনী, সুযোগসন্ধানী ও অর্থলোভীর দল। পণ্ডিত নেহেরুর এটা পছন্দ নয় কিন্তু তিনি এদের ঝেড়ে ফেলতেও পারছেন না। যৌবনে তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন, একসময় ঘোষণা করেছিলেন যে সময় এলেই তিনি কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবেন। ঔপন্যাসিক লিখেছেন "সময় যখন এল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন ল্যাম্পপোস্টগুলো বোধহয় মজবুত নয়। ওদিকে আগে মনোযোগ দেওয়া দরকার।"[১১] স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষ বার বার জর্জরিত হয়েছে কালোবাজারিদের সৃষ্ট নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উধাও হওয়ার ঘটনায়। উপন্যাসে উঠে এসেছে এসব প্রসঙ্গও প্রাসঙ্গিকভাবে। কানু ব্যবসা করেছে কন্ট্রোলে শাড়ি কিংবা তেলের। বাজারে চালের দাম আকাশ ছুঁলে অমিল হয়েছে আতপ চাল, কিংবা চিনি পাওয়া না গেলে সাধারণ মানুষ ভোগ করেছে যন্ত্রণা।

দীর্ঘকাল ব্যাপী বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে বিচলিত করেছিল। নেহেরু বিশ্ববাসীর কাছে সম্মানের আসন পেলেও এই উদ্বাস্তু সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেননি, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সদর্থক কোনো পদক্ষেপ তিনি নিতে পারেননি। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরী হওয়া রাষ্ট্রের সত্যতা তিনি মেনে নেননি। পাঞ্জাবের দিকটায় প্রথম প্রথম দাঙ্গা খুনোখুনি যা হবার হয়ে গেছে মাউন্ট ব্যাটনের আমলেই আগমন নির্গমন যা হওয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু বাংলার দিকে আগমন নির্গমন বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন' -এ ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে ঠিক কি ধরনের দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছিল তা আমার স্মরণে নেই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল না। তবে আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা সবাই চলে এসেছিলেন। নিতান্ত

বাধ্য না হলে কি কেউ পিতৃ-পিতামহের ভিটে-মাটি ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়? মাটির টান অতি সাংঘাতিক।... পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতের দিক থেকে কোনো সোনালি হাতছানি দেখতে পেয়ে এসেছিলেন তা নয়। ছিল না সাদর অভ্যর্থনার সামান্যতম ইঙ্গিত। বরং শরণার্থী হয়ে এসে তারা পেয়েছে উপেক্ষা, অবহেলা, বিদ্রূপ, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ। তবু তারা এসেছে, বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে, পায়ে হেঁটে কিংবা নৌকায়।"[১২]

দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আবার শুরু হয়েছিল ভয়াবহ দাঙ্গা। এসময়ে আবার শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীর ঢল। এত অনুপ্রবেশকারী মানুষকে সামলানোর ক্ষমতা তৎকালীন ভারতবর্ষের সরকারের ছিল না। ত্রাণ শিবির তৈরী হল যৎসামান্য। লক্ষ লক্ষ পরিবার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় উন্মুক্ত আকাশের নীচে, গাছতলায়, রেল স্টেশনে। দেশ ভাগের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই কলকাতায় শরণার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় বাষট্টি লক্ষ। পশ্চিম বাংলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে নানা জায়গায় দাঙ্গা হয়েছিল, অনেক মুসলমানও এই রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তবে তাদের সংখ্যা ছিল তুলনায় অনেক কম। ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী গোটা পাকিস্তানে ভারত থেকে সত্তর লক্ষ মোহাজের বা শরণার্থী গিয়েছিল। তার মধ্যে তেষট্টি লক্ষই গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল মাত্র সাত লক্ষ – তাঁর মধ্যে একটা বড় অংশ অবাঙালী মুসলমান। জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে এক বৈঠকে দুদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছিল। দুই নেতা ঘোষণা করেছিলেন যে, দুটি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার পাবে, তাদের জীবন, সংস্কৃতি ও সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়, মত প্রকাশের ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হবে। শুধু তাই নয়, দেশত্যাগী উদ্বাস্তুরাও ইচ্ছে করলে আবার ফিরে গিয়ে পৈতৃক

ভিটে মাটি বাড়ি ও সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে, এমন ব্যবস্থাও করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও পাকিস্তান এই চুক্তির তোয়াক্কা করেনি, বরং সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়েছিল। প্রশাসনও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার দিকে উদাসীন ছিল। কোনও হিন্দু উদ্বাস্তুই পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে ফেলে আসা সম্পত্তির অধিকার চাইতে সাহস পায়নি। পাকিস্তানের কট্টর সমর্থকেরা সাধারণ মানুষদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, হিন্দুদের কিছুটা ভয় দেখালেই তারা বাড়ি জমি ফেলে পালাবে আর সেগুলোকে দখল করে নেওয়া যাবে। যদিও ভারত থেকে মুসলিমদের দেশত্যাগের স্রোত এই চুক্তির ফলে অনেকটা কমে গিয়েছিল। কোথাও কোথাও এদেশেও মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হলেও এদেশে একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ছিল, ফলত একান্ন সালের জনগণনায় দেখা যায়, পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশ মুসলমান, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ঢল অব্যাহত থাকায় দিল্লির লোকসভায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হিন্দু মুসলিম জনগন বিনিময়ের প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু এই ঘটনা অবশ্যই ছিল নেহেরুর আদর্শের বিরোধী এবং মানবতারও বিরোধী।

রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, আধপেটা খেয়ে, পুষ্টির অভাবে বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু কীট পতঙ্গের মত জীবন যাপন করেছে, নারী শিশু কেনাবেচা চলেছে অবাধে, চলেছে অবাধ নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, মনুষ্যত্বের এক চরম অবমাননা সাক্ষী থেকেছে ইতিহাস। নিঃস্ব রিক্ত উদ্বাস্তুরা কেউ কেউ দখল করতে শুরু করেছিল পরিত্যক্ত জমি, বাড়ি, ধনীদের বাগান বাড়ি। উপন্যাসে উদ্বাস্তু নেতা হারীত মণ্ডল প্রতাপের দিদি সুপ্রীতিদের সম্পত্তি কাশীপুরের বাগানবাড়ি দখল করলে তাদের সঙ্গে হাতাহাতিতে সুপ্রীতির স্বামী অসিতবরণের মৃত্যু হয়েছে। জীবন যুদ্ধে

লড়াই করতে করতে জেলে গেছে হারীত মণ্ডল। নিজের বিদ্রোহী মেজাজের জন্যে হয়েছে পুলিশের চোখে অপরাধী। উপন্যাসে হারীত মণ্ডলকে কেন্দ্র করেই দেখা গেছে সরকারি ক্যাম্পে উদ্বাস্তু মানুষদের প্রবল জীবন সংগ্রাম, সরকারের চরম অবহেলা, পুলিশের দমননীতি। হারীত মণ্ডল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, সেখান থেকে পুলিশের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে চরবেতিয়া ক্যাম্প, সেখানেও অব্যবস্থার চূড়ান্ত, সেখানেও হারীত বিদ্রোহ জানিয়ে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, এবারেও পুলিশের হাতে মার খেয়ে হারীত মণ্ডলকে বাধ্য হয়ে লোকজন নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে স্থানান্তরিত উদ্বাস্তু ক্যাম্প কুরুদ শিবিরে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "কয়েকদিন আগে দণ্ডকারণ্যের কুরুদ শিবিরে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে উদ্বাস্তুরা আবার উদ্বাস্তু। এখানকার হাজার সাতেক মানুষের সংসার খোলা আকাশের নিচে। এখনও কোনো রিলিফ এসে পৌঁছোয়নি, দিল্লীতে খবর পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ।"[১৩] প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছোলে আনন্দে নেচে উঠেছে ক্যাম্পের মানুষেরা। বিশ্ববাসীর কাছে জনপ্রিয় নেহেরু এই উদ্বাস্তু মানুষগুলির কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। হারীত মণ্ডল ভেবেছে জহরলাল নেহেরু তাঁদের মনে স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছিল একদিন তারা দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবে। সেই স্বপ্ন তার ক্ষীণ রেখা হারিয়েছে নেহেরুর মৃত্যুতে।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে নারীর অবস্থান উঠে এসেছে মমতা, সুপ্রীতি, শান্তি, তুতুল, সুলেখা, চন্দ্রা, অলি প্রভৃতি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। মমতা, সুপ্রীতি, শান্তি গৃহকেন্দ্রিক জীবনের বাইরে খুঁজতে চায়নি নিজেদের পরিচয়, স্বামী সন্তানের মধ্যেই হয়েছে তাদের বিশ্বদর্শন, পুরুষ সদস্য ব্যতীত ঘরের বাইরে পা রাখেনি তারা, কিন্তু তাদেরই পরবর্তী প্রজন্মের বা বয়সে সামান্য ছোটো চরিত্রগুলি সন্ধান করেছে নিজেদের স্বরূপ, গড়ে

তুলতে চেয়েছে নিজেদের পরিচয়। তুতুল পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছে মন দিয়ে। তার মা সুপ্রীতির ইচ্ছা মেয়েকে শিক্ষিত করে তোলার, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের লোভী দৃষ্টির সামনে তাকে পড়তে হয়েছে বার বার। কৈশোরে বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে না পেরে রবীন্দ্র সাহিত্যে ডুবিয়ে দিয়ছিল নিজের সদ্য যৌবন প্রাপ্ত হৃদয়, রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতায় সে প্রেমে পড়েছে নিজের পিসতুতো দাদা পিকলুর, প্রতাপের প্রিয় সন্তান উজ্জ্বল যুবক পিকলুর মৃত্যুতে তুতুল নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে পড়াশোনার জগতে। ডাক্তার হবার স্বপ্ন নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার পর পিকলুর স্মৃতিকে আকড়ে ধরেই সাজিয়ে নিতে চেয়েছে নিজেকে, পিকলুর কথা মনে করে বাঙালী নারী মুক্তির পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরের ছবি সাজিয়েছে ঘরে, মনুসংহিতা পড়ে মা সুপ্রীতির বৈধব্য জনিত আচার নিয়মকে নস্যাৎ করতে চেয়েছে। উপন্যাসে কালোবাজারির কারণে আতপ চাল অমিল হলে মাকে বুঝিয়ে সেদ্ধচাল খায়িয়েছে, বাঙালী বিধবার জীবনে কন্যাসন্তানও হয়ে উঠেছে আলোর দিশারী। বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে তুতুল নিজের জীবনে পেয়েছে নতুন আলো, পূর্ব বাংলার আলমের সঙ্গ পেয়ে তার জীবন হয়েছে পরিপূর্ণ।

উপন্যাসে মমতার দাদা ত্রিদিবের স্ত্রী সুন্দরী সুলেখার দেহ সৌন্দর্যের কারণে বহু পুরুষ সমাবেশ ঘটেছে তার চারপাশে। উপন্যাসে প্রতাপও বার বার চেয়েছে সুলেখার সান্নিধ্য কিছু সময়ের জন্যে উপভোগ করতে, সুলেখার বেথুন কলেজে ইংরেজির লেকচারার পদে চাকরি পাওয়ার খবরে খুশী হয়েছে প্রতাপ। প্রতাপের ভাবনায় উঠে এসেছে সমকালীন সমাজে নারীর অবস্থান, "এ দেশের মেয়েরা আজকাল লেখাপড়া শিখছে হঠাৎ বিধবা হলে বিপদে না পড়ার জন্যে। স্বাভাবিক, সুখী বিবাহিত জীবন হলে লেখাপড়ার আর কোনও মূল্য নেই।... সুলেখা চাকরি করতে যাচ্ছে প্রয়োজনে নয় শখে, তবু এর মধ্যে একটা রীতি ভাঙার ব্যপার আছে।"[১৪] সুলেখা শিক্ষিতা, তবুও তার দেহ সৌন্দর্যই

হয়েছে পুরুষের আকর্ষণের কারণ। ভদ্রতার আবরণ রাখতে ত্রিদিব তার বন্ধু স্থানীয়দের বলতে পারেনি কিছুই। সুলেখা অবচেতনে চেয়েছে ত্রিদিব তার পৌরুষে রক্ষা করুক সুলেখাকে, কিন্তু ত্রিদিবের ঠাণ্ডা আচরণ তাকে ভেঙে দিয়েছে, ত্রিদিবের বন্ধু রাতুলের ছদ্ম পৌরুষে সে আকৃষ্ট হয়েছে, যদিও সুলেখা বুঝেছে রাতুল ভুল পথ, ত্রিদিবের হাত ধরে দিল্লী গিয়ে সুলেখা রক্ষা করতে চেয়েছে নিজেদের, পালাতে চেয়েছে নিজের থেকে, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে নগ্ন হয়ে বেরিয়ে আসা পুরুষের লোভ ও নিজের মনে জেগে ওঠা দ্বিধা আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে সুলেখাকে, ত্রিদিব তাকে রক্ষা করতে না পারার গ্লানি নিয়ে দেশত্যাগী হয়ে নিজের জীবনকে নিয়ে গেছে ধ্বংসের পথে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নারী জীবনে উঠে এসেছে আধুনিক জটিলতা।

উপন্যাসে চন্দ্রা-অসমঞ্জ রায় বৃত্তেও নারীর সামাজিক অবস্থানকে বিচার করেছেন ঔপন্যাসিক। চন্দ্রা তার স্বামীর সঙ্গে এলাহাবাদে থাকে না, তার ধনী পিতার প্রশ্রয়ে সে মেতেছে সমাজসেবায়। সাজগোজ করে, সিগারেট খায় চন্দ্রা। পুরুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে বাঁচতে দিতে পারেনি নিজের মতন করে। হারীত মণ্ডলের ছেলে কিশোর সুচরিতকে দ্বায়িত্ব নিয়ে লেখাপড়া শিখিয়্ব সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল চন্দ্রা। চন্দ্রাকে দেখে কিশোর সুচরিতও অবাক হয়েছে, “সুচরিত এ পর্যন্ত দেখে এসেছে যে পুরুষরা বড়, মেয়েরা ছোটো। পুরুষরা দরকারি কথা বলে, মেয়েরা শোনে। মেয়েরা মাঝে মাঝেই ঝগড়া করে বটে, কিন্তু পুরুষদের মতন হুকুমের সুরে কথা বলতে জানে না। কিন্তু চন্দ্রা এখানে মধ্যমণি, সে কথা বলছে, অন্যরা শুনছে। অসমঞ্জ রায়ের মতন ইংরেজি জানা মানুষকেও সে মাঝে মাঝে আঙুল তুলে বোঝাচ্ছে কোনও কোনও কথা। ইংরেজি বলছে ফরফর করে। একবার সে প্যাকেট থেকে সিগরেট বার করতেই অসমঞ্জ রায়ের মতন রাশভারী মানুষ নিজে দেশলাই জ্বেলে

সেটা ধরিয়ে দিল।”[১৫] এক কিশোরের মনোজগতে এ এক সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। উপন্যাসে অসমঞ্জ বাবুর স্ত্রী প্রীতিলতা অসুস্থ, তিনি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েছেন চন্দ্রার দিকে, যদিও চন্দ্রার পক্ষ থেকে তিনি পাননি কোনো সচেতন প্রশ্রয়। অসমঞ্জ চন্দ্রার প্রতি প্রবল আকর্ষণেই নেমেছেন সমাজ সেবার ভূমিতে। চন্দ্রা আশ্রয় দিয়েছে হারীত মণ্ডলের ছেলে সুচরিতকে। সুচরিতেও মনের গভীর গহনে প্রবেশ করেছে চন্দ্রা। চন্দ্রাকেও বহু পুরুষের লোভী চোখ থেকে বাঁচতে গ্রহণ করতে হয়েছে সন্ন্যাসিনীর জীবন। নিজের ছন্দে বাঁচার সুযোগ পায়নি সে। এমনকি সুচরিতকে মানুষ করার স্বপ্নও তার পূরণ হয়নি।

উপন্যাসে ইতিহাসের বাস্তব সত্যকে ঔপন্যাসিক বানিয়েছেন সাহিত্যের সত্য। ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রগুলোকে অবিকৃত রেখেই তিনি তুলে ধরেছেন সময়কে। ইতিহাসের পাতার দেবত্বে উন্নীত ব্যক্তিত্বদের দেখিয়েছেন ভালো মন্দে মিশ্রিত মানুষ হিসেবে। ইতিহাস ও কাহিনী চলেছে সমান্তরালভাবে। ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ পাকিস্তানের নির্বাচনে এ কে ফজলুল হকের বিরাট জয়ের সংবাদে খণ্ডিত ভারতবর্ষেও একটা আশার আলো জেগে উঠেছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করে ফজলুল হক অমুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, “প্রাচীন এই বিশ্বাসযোগ্য মানুষটি আর যাই হোক সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি দেবেন না।... দেশভাগের নামে বাঙালি জাতির নামে বিভেদরেখা টানায় তাঁর আপত্তি ছিল। ফজলুল হক ঘোষণা করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন ভিসা ব্যবস্থা তুলে দেবেন, দুদিকের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে অবাধ সাক্ষাৎ আর মোলাকাতের আর কোনোও অন্তরায় থাকবে না।”[১৬] এক মাসের মধ্যেই ৩রা এপ্রিল অবিভক্ত পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ জানালেন ফজলুল হক দেশের শত্রু, তিনি স্বায়ত্ত শাসনের কথা উচ্চারণ করেছেন। ফজলুল হক গৃহবন্দি হলেন, শেখ মুজিবর রহমান নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। সেনাপতি ইস্কান্দার নির্জার হাতে তুলে দেওয়া হল

সর্বময় কর্তৃত্ব। পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার শুরু হল উদ্বাস্তু স্রোত। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, ফুটপাত হয়ে উঠল মানুষের আস্তানা। কলকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু সমস্যায় হতে থাকল জর্জরিত। ভারত সরকার উদ্বাস্তু পুর্নবাসনের জন্যে স্থির করলেন আন্দামান ও মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য।

যে সময়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ওপর উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের বাঙালী সত্তা হরণ করে তাদের শুধুই মুসলমান বানিয়ে তোলার, সে সময়েই পশ্চিম বাংলার সঙ্গে বিহারকে যুক্ত করে দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ছিলেন এর সমর্থক, পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এই প্রস্তাব লুফে নিয়েছিলেন। পশ্চিম বাংলার মানুষ এই প্রস্তাব শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, শুধু বুদ্ধিজীবীরা নয়, শুধু শিক্ষক ছাত্র সমাজ নয় পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষও এই একত্রীকরণের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।

একদিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান উদ্বাস্তু সমস্যা, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে মৌলবাদী শক্তি ও তার বিরোধিতায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা প্রগতিশীল মানবিকতা। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, শুধু স্বাধীনতা তথা দেশভাগের সময়কালে নয় পরবর্তীকালে প্রায় বহু বছর ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু ধর্মের মানুষেরা ভারতবর্ষে এসেছে প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সর্বস্বান্ত হয়ে। ১৯৪৬-৪৭ সালে নোয়াখালি ত্রিপুরার দাঙ্গায়, ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত হওয়ায়, হায়দ্রাবাদের মতো পূর্ববঙ্গেও ভারত আক্রমণ করতে পারে এই অনুমানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ফলে তাদের দেশত্যাগ ঘটে। ১৯৫০-৫১ সালে দাঙ্গার ফলে বন্যার জলস্রোতের মতো বাঙালী হিন্দুর নির্গমন ঘটে। ১৯৫২ থেকে ৬০ কালপর্বে বাঙালী হিন্দুর দেশত্যাগ ঘটে পাসপোর্ট প্রবর্তনের ফলে, দাঙ্গার

ফলে, সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত আইনের ফলে। খালেদা জিয়ার নির্বাচনে জয়ের ফলে হিন্দুদের বাংলাদেশ ত্যাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন, "দীর্ঘদিন ধরে এই হারিয়ে যাওয়া প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ/ পূর্ব পাকিস্তান/ বাংলাদেশের আদমশুমারিতে। ১৯৫১ সালে হিন্দু ছিল ঐ দেশের মোট জনসংখ্যার ২২%, ১৯৬১ সালে ছিল ১৮.৫%, ১৯৭৪ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ১৩.৫% । ১৯৮১ সালে আরো নেমে হয় ১২.১%।"[১৭] অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণনার দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাসের কোনো প্রমাণ মেলেনি, বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার বৃদ্ধি চোখে পড়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গুজরাটের নরহত্যা, পূর্ববর্তী অনেক দাঙ্গা সত্ত্বেও বিপরীত নির্গমন হয়নি। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ চলে আসায় যে ভয়াবহ সংকট তৈরী হয়েছিল সে সংকট পূর্ববঙ্গকে ভোগ করতে হয়নি।

উপন্যাসে প্রতাপের বন্ধু মামুনকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা। কলেজ জীবনে কলকাতায় প্রতাপের সঙ্গে মামুনের ছিল গভীর সখ্যতা। কবিতা রচনার প্রতি মামুনের ছিল প্রবল ঝোঁক। কলেজ জীবনের শেষে মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েছিল প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে। হয়ে উঠেছিল আওয়ামি মুসলিম লিগের একজন মাঝারি নেতা। এই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানই মামুনের কলেজ জীবনের রোম্যান্টিকতা ভেঙে দিয়েছিল। তিনি দেখলেন, "সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নাস্তিকতার স্থান নেই।... ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তার মধ্যে একজন নাস্তিকতা সমর্থকের স্থান থাকতে পারে না। গ্রামে ঘোরার সময়ে তিনি কোরাণ হাদিস পড়তেন মন দিয়ে। বক্তৃতার সময়ে কায়দা মাফিক উদ্ধৃতিও দিতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে আর ধর্মবিশ্বাস প্রোথিত হয়নি।"[১৮] এখানেই ঔপন্যাসিকের সময় সন্ধান। 'সেই সময়' উপন্যাসের কালপর্বে দাঁড়িয়ে

ইরফান ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ে নাস্তিকতায় দীক্ষিত হলেও গ্রামে ফিরে আবার ডুবে গিয়েছিল ধর্মবিশ্বাসের জঠরে, কিন্ত সময়ের বিবর্তন পরিবর্তিত করেছে মামুনকে সে ডুবে যেতে পারেনি বিশ্বাসের পথে। স্বাধীনতার আগেই ১৯৪৬ সালে মামুন কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিল। তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ফলাফল হিসেবে কলকাতার পথে পথে রক্তগঙ্গা আর মৃত মানুষের স্তুপ তাকে দেখতে হয়নি। ঔপন্যাসিক লিখেছেন “পঞ্চাশের দাঙ্গার সময়ে তিনি ছিলেন বরিশালের গ্রামাঞ্চলে। দাঙ্গার ভয়ঙ্কর রূপ সেবারে তিনি খানিকটা দেখেছিলেন।... এক স্টিমার ভর্তি হিন্দু নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ায়। ...তারা প্রায় প্রত্যেকেই মা কিংবা বাবা, ভাই কিংবা বোনকে কিংবা সবাইকেই হারিয়েছে দাঙ্গায়, তারা চিরকালের মতন ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের ভিটেমাটি, তাদের পিতৃপুরুষের দেশ। কার দোষে? তাদের নিজেদের কোনও দোষ ছিল?... অন্যদিকে কলকাতার দাঙ্গায় অনেক মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে।... যার যার দুঃখটা সে সবচেয়ে বেশী বোঝে এই সহসা বিপদের জন্যে তারা তো হিন্দুদেরই দায়ী করবেই। কেউ তাদের আসল কারণটা বোঝতে সাহস করে না।”[১৯] দেশভাগের পূর্বে ফজলুল হক মামুনকে বলেছিলেন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে দেশে অনেক স্কুল খোলা হয়েছে। হিন্দুরা চলে যাবার পর মুসলমান ছাত্রই বেশী। সাধারণ মুসলমান পরিবারেও শিক্ষার চল হয়েছে। শিক্ষার অনিবার্য পরিণতিতে গ্রামে গ্রামেও তৈরি হয়েছে বেকারের দল। মামুন বুঝেছে, “সাহেবরা চলে গেছে। হিন্দুরাও অনেকে চলে গেছে, কিন্তু সেই চাকরি পেল কারা? সবই তো নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা।”[২০] পাকিস্তানের জন্যে বাঙালী মুসলমানদের দাবীই ছিল সবচেয়ে জোরালো, কিন্তু পাকিস্তানের স্বপ্ন বাস্তব হতেই সব ক্ষমতা চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম মুহূর্তে দেশ থেকে এই দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জিন্নার মৃত্যুর পর উগ্র

সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতবিদ্বেষ। দেশনেতারা প্রচার করতে শুরু করলেন বাংলা হিন্দুদের ভাষা, সেই ভাষা বর্জন করে গ্রহণ করতে হবে উর্দু। ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র ও জনসাধারণের ওপর গুলি চলল, সেদিন প্রমাণিত হল শোষকের কোনো জাতি বা ধর্ম হয় না। পৃথিবীর সব দেশে রয়েছে দুটি শ্রেণী – শোষক আর শোষিত। উপন্যাসে যখন বলা হয়েছে, "তিন বছর আগের ভাষা আন্দোলন ও বিক্ষোভের সঙ্গে মামুন যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, ঢাকায় সেই ভয়ঙ্কর উত্তাল একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি চালনার সময় তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।"[২১] তখন স্পষ্টই ধরে নেওয়া যায় উপন্যাসের ঘটনাক্রম ১৯৫৫ থেকে শুরু।

দ্বিধাবিভক্ত বাংলার বেকারত্ব, রাজনৈতিক ডামাডোল, ছিন্নমূল মানুষগুলির যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন, কালোবাজারি, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ উপন্যাসের পাতায় পাতায় সময়কে জীবন্ত করেছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পরেও দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবন, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে সদ্য সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছিল জনমানসে, তৎকালীন নেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে জনমত গরিষ্ঠ হয়েছিল পূর্বপাকিস্তানে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরের পর পূর্বপাকিস্তানে এসেছিল একটা অন্ধকার সময়। জেনারেল আইয়ুবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে গণতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে সামরিক আইন জারি করেছিল, তার কুড়ি দিন পরে ইস্কান্দার মীর্জাও বিতাড়িত হল দেশ থেকে, আইয়ুব খান হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হল, নেতারা হলেন কারারুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তানের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি জন্মাতে শুরু করল প্রবল বিরোধিতা। মওলনা ভাসানীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করল পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী জনগন। উপন্যাসে মওলানা ভাসানী তাঁর সভায় যখন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন তখন

মামুন শিউরে উঠেছেন এসব কথা শুনে, "এ তো বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির! এত কষ্টের, এত সাধের, এত রক্ত বর্ষণ করে পাওয়া যে পাকিস্তান মওলানা তা ভেঙে দিতে চান? মাত্র দশ বছর হয়েছে এই নতুন রাষ্ট্রের, অনেক ভুলভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তাকে ভেঙে ফেলার কোনো প্রশ্নই আসে না।"[২২]

এখান থেকে চিনে নেওয়া যায় সময়কে। স্বাধীনতার কয়েক বছর পেরিয়ে এদেশে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। দেশবাসীর কাছে দেশ হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের পটভূমি। স্বাধীনতার পরে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই ও নতুন চাকরির অভাব এবং ভোগ্যপণ্যের অভাবে ছাত্র ও যুবসমাজ জাতীয়তাবাদ ছেড়ে মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ও যুব শাখা শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। বিরোধী পক্ষের মিছিল সমাবেশের ওপর স্বাধীন দেশেও লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চলেছে ব্রিটিশ কায়দায়। গান্ধিজীকে 'জাতির জনক' উপাধি দিয়ে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রস্তরমূর্তি, তাঁর আদর্শ স্বাধীন ভারতের সরকার মনে রাখেনি। এই সময়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলছে স্বাধীনতার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজন। দশ বছরের স্বাধীনতা স্বপ্নের দিন আনতে না পারলেও গণতন্ত্র বজায় থাকার গৌরবে মাতোয়ারা হয়েছে গোটা ভারতবর্ষ। যদিও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের চরম বিপর্যস্ত জীবন, বহু ব্যাঙ্কের পতন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মনুষ্যত্বের চরম বিপর্যয় মাথা চাড়া দিয়েছে তবুও উপন্যাসে প্রতাপও বেরিয়ে পড়েছেন ছোটো মেয়ে মুন্নির হাত ধরে এই স্বাধীনতার জোয়ারে গা ভাসাতে। প্রতাপ ভেবেছেন, "স্বাধীনতার পর অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় তা সবাই জানে।... কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করছে কারা? শুধু গরিবরা। যারা ধনী তারা আরও ধনী হচ্ছে।... এই দশ বছর ধরে পণ্ডিত নেহেরু ভারতে টিকিয়ে রেখেছেন গণতন্ত্র। এই তাঁর গর্ব। শুধুই ভোটের গণতন্ত্র।"[২৩]

সেই সময়ে পূর্ববঙ্গে ১৯৫৮ -র সেই কালরাত্রির পর, সব রাজনৈতিক দলগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিল, পার্টি অফিসগুলি তালাবন্ধ

করে, নেতাদের সব জেলে পুরে, রাজনৈতিক দলগুলো যাতে আর কোনোদিন মাথা তুলতে না পারে তার ব্যবস্থা করেছিল সরকার। সামরিক শাসনের অত্যাচারে কেউ আন্দোলন করতে সাহস পায়নি। দোকানদারদের ওপর জোর জুলুম করে কমানো হল জিনিসপত্রের দাম, বন্ধ করে দেওয়া হল বিশ্ববিদ্যালয়। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল নেই, পুলিশ জনতার খণ্ডযুদ্ধ নেই, সাধারণ জনতার অনেকেই ভাবল, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক অশান্তি, যখন তখন মন্ত্রিসভার পতন, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, এসবের হাত থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেছে তাহলে মিলিটারিরাই তো ঠিকমত দেশ চালাতে পারে বলে মনে হতে লাগল, তিক্ত বুদ্ধিজীবীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন এই দেশ গণতন্ত্র পাবার যোগ্যই নয়। কয়েক বছরের মধ্যে মনোভাব বদলে গেল রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খাঁ -এর। তিনি নিজের পছন্দ মতন সংবিধান প্রণয়ন করেছেন, সেখানে তাঁর সুবিধে মত নির্বাচনের ব্যবস্থাও আছে, বেসিক ডেমোক্রেসির নামে একটা দলহীন নির্বাচন করলেন সেটা হাস্যকর দাঁড়াল। আইয়ুব চাইলেন একটা সরকারী দল গড়ে তুলতে। সহকর্মীদের পরামর্শে তিনি পুরোনো মুসলিম লিগের একটা অংশ নিয়ে গড়ে তুললেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ। পূর্ব পাকিস্তানে এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বার বার উত্তাল হয়ে সরকার কাঁপিয়েছে, গভর্ণর মোনেম খাঁ প্রচুর টাকা খরচ করে দালাল লাগিয়ে ছাত্রদের মধ্যেও একটা নতুন সরকারী পার্টি গড়ে তুললেন, নাম ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রেডারেশন, এই পার্টির ছেলেরা ফেল করলেও পাশ করে যাবে, এরা কোনো সহকর্মীর পেটে ছুরি বসালেও এদের কোনোও শাস্তি হবে না, অধ্যাপকেরা এদের কথা শুনতে বাধ্য থাকবেন, ইউনিভার্সিটি কবে খোলা থাকবে কবে বন্ধ থাকবে তাও এরাই ঠিক করবে, উত্তম সরকার ভক্তি দেখাতে পারলে ছাত্ররা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জলপানি পাবে। জেল থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন সোহরাওয়ার্দি এক নতুন চাল চাললেন আইয়ুবের ওপর, তিনি বললেন কোনো রাজনৈতিক দলেরই আলাদা অস্তিস্ত্ব রাখার দরকার নেই।

কোনোও একটি দল এককভাবে আইয়ুব খানের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিততে পারবে না বলেই সোহরাওয়ার্দি সব দলের পৃথক অস্তিত্ব বিলোপ করে যুক্তরাষ্ট্রে গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, একটি মাত্র দলের সর্বাধিনায়ক হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বৃদ্ধ সোহরাওয়ার্দির স্বপ্ন পূরণের আগেই মৃত্যু তাঁকে উত্তীর্ণ করল অন্য জগতে। যুক্তফ্রন্ট ধ্বংস হল, শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামি লিগের একছত্র নেতা হয়ে দলটিকে আবার সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। মৌলনা ভাসানীও তাঁর ন্যাপ দলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

উপন্যাসে পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে গেছেন দুই বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক মানচিত্র। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে সরকারের উদাসীনতায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, ১৯৬২ সালে যখন এদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে চীনকে আদর্শ দেশ বলে ভেবে নেওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, সেই সময়েই ম্যাকমিলান লাইনকে কেন্দ্র করে চীন আক্রমণ করল ভারতকে, সময়টা ১৯৬২। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছেও এটা একটা বিশাল ধাক্কা। উপন্যাসে এসেছে ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু। সময়টা ২৭ মে, ১৯৬৪। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নতুন পথে এগোল। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ নাড়িয়ে দিল দুই দেশের আপামর জনগণকে। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্ল্যাকআউটের সময়কে ফিরিয়ে এনেছিল। এই সময় থেকে পাকিস্তানের একতা ধ্বংসের দিকে যেতে শুরু করল, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, বিমাতৃসুলভ মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছিল। দুই বাংলার যুব মানসে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। ১৯৪০ সালে যেখানে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেই লাহোরেই ছাব্বিশ বছর পর ১৯৬৬ তে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফা প্রস্তাবের মধ্য দিয়েই পৃথক বাংলাদেশের

দাবীর পথ প্রশস্ত হল। পূর্বপাকিস্তানে শুরু হল প্রচণ্ড ধরপাকড়, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা সম্পন্ন মানুষেরা গ্রেপ্তার হলেন, উপন্যাসে মামুন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁকে বিনা নোটিশে হারাতে হয়েছে সাংবাদিকতার পদ।

'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গই শুধু নয় পৃথিবীর দুই প্রান্তে পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলিও উঠে এসেছে, উঠে এসেছে মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশ ও মহাকাশ। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "পূর্ব থাকলে পশ্চিম থাকবেই। সব দেশের মধ্যেই পূর্ব-পশ্চিম আছে। আমাদের পৃথিবীটাও পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত, উত্তর দক্ষিণে নয়, এমনকি ভালো করে ভেবে দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও একটা করে পূর্ব-পশ্চিম আছে। পূবের চেয়ে পশ্চিম অনেক বেশী বর্ণাঢ্য, কারণ ধ্বংসের আগে কিংবা অস্তাচলে যাবার আগে আভাটা বেশি হয়। ...পূবের আকাশ ও পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য কোরো।"[২৪] উপন্যাসে তিনি তুলে এনেছেন মহাকাশ গবেষণা, আমেরিকার মহাকাশযান জেমিনি ৭ নম্বরে চেপে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া বিজ্ঞানীদেরও বানিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের চরিত্র।

উপন্যাসে অতীনকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে কলকাতার কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়া শিক্ষিত যুব সমাজ, দেশের এহেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা দীক্ষিত হয়েছে কমিউনিস্ট মতাদর্শে। মানিকদার স্টাডি সার্কেলে অতীন, কৌশিক, পমপমের মতন ঝকঝকে যুবক যুবতী পরিচিত হয়েছে কমিউনিস্ট মতাদর্শের সঙ্গে, বুঝেছে গোটা পৃথিবীতে আছে দুটি শ্রেণী – শোষক আর শোষিত। একই সময়ে দাঁড়িয়ে দুই বাংলার শিক্ষিত যুব সমাজ বুঝেছে শোষক আর শোষিতের কোনো জাত বা ধর্ম হয় না। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, গোটা দেশে যখন পশ্চিম বাংলার পরিচয় শুধুমাত্র কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে, ঠিক সেই সময়ে উত্তরবাংলার একটি অজ্ঞাত পরিচয় থানা নক্সাল বাড়ির নাম চমকে দিয়েছিল গোটা দেশকে। নক্সালবাড়ির একটি গ্রামে একদিন একদল আদিবাসী কৃষক তীর- ধনুক- বর্শা- লাঠি- সোঁটা নিয়ে দৌড়ে এসে

বসে পড়লে একখণ্ড জমির ওপর, সেই জমির চারপাশে লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়, জমি দখলের চেষ্টা ও জোর করে ফসল কেটে নেওয়া প্রতি বছরই ঘটে, আবার পুলিশের সাহায্য নিয়ে জোতদাররা জমি থেকে জবর দখলকারীদের প্রতিবার উচ্ছেদও করে দেয়। উত্তরবঙ্গের কিষাণ সভা সাতষট্টি সালে এরকম জমি দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরমধ্যে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শাসনভার পেয়েছিল যুক্ত ফ্রন্ট এবং শাসনভার পেয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সুতরাং পুলিশ বাহিনী গেল না কৃষকদের বিরুদ্ধে। প্রথমবারের সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে কিষাণ সভার নেতৃত্বে পরবর্তী দশ সপ্তাহের মধ্যে আরও ষাটটি জমি দখলের ঘটনা ঘটে গেল, বাধা এল সামান্য। কিষাণ সভার কিছু নেতার ধারণা হল চাষি ও মজুরদের নিত্য ব্যবহার্য অস্ত্র দিয়েই শুরু হবে বিপ্লব। কয়েক মাস পরে নক্সালবাড়ির অন্য একটি অঞ্চলে জয়ের স্বাদ পাওয়া উগ্র কৃষকদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন কয়েকজন পুলিশ, একজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হল। সেইদিনই আরও একদল পুলিশ ঘেরাও হল, সামান্য প্ররোচনাতেই পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করল সাতজন নারী, দুজন শিশু সহ দশজনকে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়েই কৃষক ও মজুরদের স্বার্থ দেখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই দলেরই নেতা পুলিশ মন্ত্রী সুতরাং এই ঘটনায় সারা দেশ স্তম্ভিত। উত্তরবঙ্গের কমিউনিস্ট যেসব নেতারা বিপ্লবের নামে এসব সংঘর্ষে উসকানি দিচ্ছিল তাদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে বিতাড়িত করা হয়েছিল দল থেকে, গ্রেফতার হয়েছিল অনেকে, কিছুদিনের জন্যে বিদ্রোহ স্তব্ধ হলেও মধ্যে দাবানলের মত ভয়াবহ রূপ নিতে সময় লাগেনি এই নক্সালপন্থী বিপ্লব প্রচেষ্টার। এই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল হাজার হাজার মেধাবী তরুণী তরুণ, কিন্তু এই বিপ্লবের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুবসমাজকে নেতৃত্বের জন্যে তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল চিন দেশের দিকে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতাদের কাছ থেকে দেশে দেশে বিপ্লবের আহ্বান শোনা যায়নি।

ভিয়েতনাম যুদ্ধেও তাঁরা গা বাঁচিয়েছিল। চিনের সঙ্গে রাশিয়ার বিচ্ছেদের প্রশ্নেই মূলত ভাগ হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। গরিষ্ঠ সংখ্যক দলটির নাম হয়েছিল সি. পি. (এম); এরা ছিল চীনপন্থী, কিন্তু এরাই যখন সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে পশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করল, তখন বহু তরুণ সদস্যদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল বিক্ষোভ। তাদের মনে তখন জ্বলজ্বল করছিল লেলিনের উক্তি, পার্লামেন্ট আসলে শুয়োরের খোঁয়াড়। জহরলাল নেহেরু তাঁর ‘The discovery of India’ (1946) গ্রন্থে লিখেছেন, “Recent events all over the world have demonstrated that the notion that nationalism is fading away before the impact of the internationalism and proletarian movement has little truth. It is still one of the most powerful urges that move a people and round it cluster sentiments and traditions and a sense of common living and common purpose. While the intellectual strata of the middle classes were gradually moving away from nationalism, or so they thought, labor and proletarian movements, deliberately based on internationalism, were drifting towards nationalism.[২৫]

আত্মজীবনী ‘অর্ধেক জীবন’ -এ সুনীল লিখেছেন, “কলকাতার দেওয়ালে যখন প্রথম দেখি বিপ্লবের অগ্নি অক্ষরে নানা রকম আহ্বানের সঙ্গে ঘোষণা ‘চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’ তখনই আমাদের অনেকের খটকা লেগেছিল। নক্সালবাড়ির বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের তাৎপর্য আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। কিংবা সেই সম্পর্কের প্রকৃত ইতিহাস এখনও উদঘাটিত হয়নি। লেলিন - স্তালিনের পর মার্ক্সবাদী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ তাত্বিক মাও সে তুঙ সত্যিই কি এমন অপরিকল্পিত এমন প্রস্তুতিহীন ভাবে তাড়াহুড়ো করে ভারতের মতো একটি বহুজাতি, বহুভাষা, বহুধর্মের দেশে শুরু করার প্ররোচনা দিয়েছিলেন? অথবা তাঁর অজ্ঞাতসারে চীন সরকারের এ ব্যাপারে অন্য

কোনো উদ্দেশ্য ছিল। পিকিং বেতার থেকে একটি মেয়ে অতীব ধারলো কণ্ঠস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরাজীতে যে সব খবর প্রকাশ করত, তা আমরাও দুপ্রকার শুনেছি। সব ডাহা মিথ্যে কথা।... বাংলার তরুণরা চীনের যে নেতাকে বিপ্লব তরণীর কর্ণধার বলে গণ্য করতে শুরু করেছিলেন, তার নাম ছিল লিন পি আও। পরবর্তীকালে সে লিন পি আও ক্ষমতালোভী ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণিত হন। একটা বিমান নিয়ে তিনি চিন থেকে পালাতে গিয়ে নিহত হন রহস্যজনকভাবে।"[২৬] যদিও শুধু তরুণরাই নয় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের কিছু কিছু প্রবীণ নেতাও আশু বিপ্লবের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। বিপ্লবী দলের প্রধান নেতা হয়েছিলেন চারু মজুমদার। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব এবং তার জন্যে গড়িমসি করার প্রশ্ন ওঠে না। যে দেশে সুসংগঠিত সেনাবাহিনী আছে সে দেশে বিপ্লব শুরু করতে গেলে জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দিতে হবে, কিন্তু চারু মজুমদারের মতে অস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকাটাও এক প্রকারের শোধনবাদ। দা, কুড়ুল, কাস্তে, লাঠি এগুলোও অস্ত্র, গ্রামের মানুষ এসব অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে। এ দিয়ে লড়াই শুরু করে গড়ে তুলতে হবে ছোটো এলাকা ভিত্তিক মুক্তিসংগ্রাম। সুযোগ পেলেই কেড়ে নিতে হবে অত্যাচারীদের অস্ত্র।

উপন্যাসে অতীন ও তার বন্ধুরা পরিচিত হয়েছে শিলিগুড়িতে বসে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা চারু মজুমদারের সঙ্গে। উপন্যাসের চরিত্র চারু মজুমদারকে বলতে শোনা গেছে "অস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকাও আসলে শোধনবাদ। কেন, দা, কুড়ুল, শাবল, কাস্তে, লাঠি এগুলোও কি অস্ত্র নয়? গ্রামের মানুষ এই সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে জানে। এইসব দিয়েই লড়াই শুরু করা যায়। গ্রামের মানুষকে বোঝাতে হবে যে, জোতদার-পুলিশ-বুর্জোয়া পার্টির অত্যাচারে মুখ বুজে থাকলে চলবে না। প্রতিঘাত করতে হবে। ছোটো ছোটো এলাকা ভিত্তিক মুক্তি সংগ্রাম গড়ে

তুলতে হবে। ... তারপর ওদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। মাও সে তুঙ বলেননি, ‘শত্রুর অস্ত্রাগার আমাদেরই অস্ত্রাগার’।”[২৭] উপন্যাসে অতীন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েছে, মানিকদাকে বাঁচাতে গিয়ে তার হাতে মৃত্যু হয়েছে একজন দুষ্কৃতির। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের শেষ এখানেই।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড ঔপন্যাসিক উৎসর্গ করেছেন, ‘বেগম জাহানারা ইমাম ও তাঁর মত জননীদের উদ্দেশ্যে।’ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায়, এসেছেন মুজিবর রহমান, ‘স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ এবং ‘স্বাধীন বাংলা শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ’ পালন করেছে প্রতিরোধ দিবস, দেশের জনসাধারণ উত্তাল, শেখ মুজিবের দোতালা বাড়ির ছাদে, শস্যশ্যামলা বাংলার প্রতীক লাল বৃত্তের মধ্যে সোনালি রঙে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা নতুন পতাকা, শ্রমিকনেতা আবদুল মান্নান একই রকম পতাকা তুলেছে বাড়ির সামনে, শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িই ওই সময়ে ছাত্র শ্রমিক বুদ্ধিজীবিদের এক বৃহৎ অংশের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। মুজিবর রহমান ভুগছেন দারুণ অস্বস্তিতে। তিনি ভেবেছেন, ‘‘স্বাধীন বাংলা স্বাধীন বাংলা রব উঠেছে চতুর্দিকে, সামরিক শাসকদের হাত থেকে দেশের অর্ধেক অংশ ছিনিয়ে নেওয়া কি মুখের কথা? তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু বাংলার মাটির দুর্গ পশ্চিম পাকিস্তানিদের কামানের মুখে কতক্ষণ টিকবে? শুধু মনের জোর দিয়ে কি রাইফেল বোমার বিরুদ্ধে লড়া যায়? তিনি পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা আটানব্বই ভাগ ভোট পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যদি, সত্যিই লড়াই লাগে... তা হলে কি এ দেশের সব মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়াবে? যদি লড়াই লাগে... সে লড়াই কতদিন ধরে চলবে ঠিক নেই, কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হবে, সে দায়িত্ব তিনি একা নেবেন?... সকাল থেকে পঞ্চাশটি মিছিল এসেছে শেখসাহেবের কাছে, তার মধ্যে শুধু মহিলাদেরই মিছিল ছটা। সকলেরই এককথা কিছুতেই সামরিক শাসক গোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার

করা হবে না। শেখ মুজিব অভিভূত হয়ে পড়েছেন। দৃঢ় ভাষায় তাদের ভরসা দিতে গিয়েও তাঁর কন্ঠস্বর কেঁপে যাচ্ছে। যদি সত্যিই রাষ্ট্র বিপ্লব বেঁধে যায় কোন কোন দেশ সাহায্য করবে, কারা অস্ত্র দেবে? যদি কেউ না দেয়? যদি ইন্ডিয়া দোনামনা করে? তা হলে কামানের মুখে ছাতু হয়ে যাবে এইসব সরল, তেজি, আদর্শবাদী ছেলেমেয়েগুলো!"[২৮]

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সোমবার বেলা ১টায় রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের কন্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, প্রচারিত হয়েছিল তাঁর ঘৃণ্য বিবৃতি যেখানে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের দুঃখজনক মতবিরোধের কারণে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা না করা পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত রাখা হলো। এই দাবীটি ছিল ভুট্টোর, ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে অত্যন্ত অনুগতভাবে ভুট্টোর সে দাবী মেনে নিয়েছিলেন, কেননা এই অচলাবস্থা ছিল ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মিলিত চক্রান্তের ফল। ইয়াহিয়ার এই বিবৃতি পূর্ব পাকিস্তানের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল। শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছিলেন "এটা নীরবে সহ্য করা যায় না, ষড়যন্ত্রকারীদের সুবুদ্ধি ফিরে না এলে ইতিহাস তার নিজের পথে চলবে।"[২৯] শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেছিল, এবং ৭ই মার্চ গণসমাবেশে শেখ মুজিবর রহমান ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ঢাকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল নতুন অঙ্গীকার। ৬ দফা নয়, ১ দফা চাই অর্থাৎ স্বাধীনতা। ৩রা মার্চ ১৯৭১ সকালের দিকে একটি মিছিল জাতীয়তাবাদী শ্লোগান দিতে দিতে চট্টগ্রাম শহরের দিকে এগিয়ে চলেছিল, মিছিলটি অয়্যারলেস কলোনির কাছে পৌঁছতেই অজ্ঞাত পরিচয় কিছু ব্যক্তি মিছিলকারীদের ওপর রাইফেলের গুলী বর্ষণ করল। বেশ কয়েকটি তাজা প্রাণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, পার্শ্ববর্তী বাঙালী বস্তিগুলিতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইরকম বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা পূর্ব বঙ্গীয়

মানুষদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে মরিয়া করে তুলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে জমে থাকা ক্রোধের আঁচ ইয়াহিয়া হয়ত পেয়েছিলেন, তবে তাদের ক্ষোভ যে কত ভয়াবহ আকার নিতে পারে তা তিনি বোঝেননি। বাঙালীদের শান্ত করার প্রচেষ্টায় ১০ই মার্চ ঢাকায় সকল রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকলেন, কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন, ততদিনে পূর্বপাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

শেখ মুজিব বলেছিলেন, "যে মুহূর্তে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আমার লোককে হত্যা করা হচ্ছে, রাজপথে শহীদের রক্ত শুকায়নি সেই অবস্থায় আলোচনার আমন্ত্রণ রূঢ় পরিহাস ছাড়া কিছুই না। যখন সামরিক সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে, অস্ত্রের ভাষায় কথা বলা হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে কোনো আলোচনা বৈঠকের আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তোপের মুখে আহত বৈঠকেরই নামান্তর।"[৩০] একই দিনে শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে গণবিরোধী সরকারকে সহযোগিতা না করার এবং রাজস্ব কিংবা খাজনা না দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি দাবী জানিয়েছিলেন, সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং ৭ই মার্চের আগে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অন্যদিকে এসবে কর্ণপাত না করে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার রাতের অন্ধকারে সৈন্য নিয়ে আসছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। নানা স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার। পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বাঙালীদের গণ বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। বাঙালীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা তীব্র করতে ৬ ই মার্চ ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের পদ থেকে ভাই এড মরাল আহসানকে সরিয়ে লে জেনারেল টিক্কা খানকে নিযুক্ত করা হল। টিক্কা খান লেঃ জেনারেল

সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের থেকে সামরিক আইন শাসকের ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিলেন। জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে ‘বালুচ হত্যাকারী’ হিসেবে কুখ্যাত। পশ্চিম পাকিস্তান বালুচিস্থান প্রদেশে তিনি নির্মম ভাবে এক অভ্যুত্থান পর্যদস্ত করেছিলেন। বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে টিক্কা খান অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় শত শত নিরস্ত্র বালুকে হত্যা করেছিলেন। নারী পুরুষ শিশু নিধনের কারণে তাকে ‘বুচার অব বালুচিস্তান উপাধি অর্জন করেছিলেন। এরূপ একজন কুখ্যাত লোককে গভর্ণর এবং সামরিক আইন প্রশাশকের সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করায় বোঝা গেল সামনে দুঃসময়।

৭ই মার্চ ঢাকায় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রায় দশ লাখ লোকের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি, কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়, নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে জয়ী করেছিলেন আওয়ামী লিগকে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করবো, এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের আর্তনাদের ইতিহাস। রক্তদানের করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম করে রাখলেন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেওয়া হল এবং এই অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হল। ১৯৫৯ সালে গণ আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের

পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হলো – আমরা তাঁকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ডাকার অনুরোধ করলাম, কিন্তু মেজরিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন সংখ্যালঘু দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আলোচনায় আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬ দফা পরিবর্তনের কোনো অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের সম্পদ। কিন্তু ভুট্টো হুমকি দিলেন। তিনি বললেন, এখানে এসে ডবল জিম্মী হতে পারবেন না। পরিষদ কসাই খানাতে পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের প্রতি হুমকি দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্তপাত করা হবে। তাদের মাথা ভেঙে দেওয়া হবে। হত্যা করা হবে। ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে, আমাকে, বলা হল আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই কিছুই করা যায়নি। এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এলো। কিন্তু কি পেলাম আমরা? বাংলার নিরস্ত্র জনগণের ওপর অস্ত্র ব্যাবহার করা হলো। আমাদের হাতে অস্ত্র নাই, কিন্তু আমার পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র তা ব্যাবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্য। আমার দুঃখী জনতার ওপর চলছে গুলি। আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে চেয়েছি, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে – আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি দশই মার্চ তারিখে গোলটেবিলে যোগদান করতে চেয়েছি। তাঁর সাথে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট। ঢাকায় আসুন, দেখুন আমার গরীব জনসাধারণকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমার মায়ের কোল কীভাবে খালি করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি কোনো গোলটেবিল বৈঠক হবে না, কীসের গোলটেবিল বৈঠক?

কার গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে আমি বসব গোলটেবিল বৈঠকে? ৩রা তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহ্বান জানালাম। বললাম অফিস আদালত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেনে নিলেন। ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন কিন্তু আমার দাবী সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখবো পরিষদে বসবো কি বসবো না। এ দাবী মানার আগে পরিষদে বসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি। রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। শহীদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখ পরিষদে যোগ দিতে যাবো না। ... আমি মানুষের অধিকার চাই। প্রধান মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতে পারেননি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে এনে ছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়েই শোধ করতে প্রস্তুত। আমি বলে দিতে চাই আজ থেকে কোর্ট কাছারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, আপিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোনো কর্মচারী অফিসে যাবে না এ আমার নির্দেশ। গরীবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, ট্রেন চলবে তবে সেনাবাহিনী আনা নেওয়া করা যাবে না। ... সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্টসহ সরকারী, আধাসরকারী এবং স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। বাঙালী বুঝে শুনে চলবেন, দরকার হলে সমস্ত টাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। বেতন যদি না দেওয়া হয়, যদি একটি গুলী চলে তা হলে তা হলে বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো – পানিতে মারব। আমি যদি হুকুম দেবার

জন্যে নাও থাকি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবে না। সাতকোটি মানুষকে আর দাবাতে পারবা না। বাঙালীরা যখন মরতে শিখেছে তখন কেউ তাদের দাবাতে পারবে না। শহীদ ও আহতদের পরিবারের জন্যে আওয়ামী লিগ সাহায্য কমিটি গড়েছে। আমরা সাহায্যের চেষ্টা করবো। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন। সাতদিনের হরতালে যেসব শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেছেন শিল্প মালিকেরা তাদের পুরা বেতন দিয়ে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, ...কাউকে যেন অফিসে না দেখা যায়। এদেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কীভাবে করতে হয় তা আমরা জানি। বাঙালী অবাঙালী, হিন্দু মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোনো বাঙালী রেডিও টেলিভিশনে যাবেন না।... আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে মহল্লায় ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রামী কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা অস্ত্র আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি আরও দেবো, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো।... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রস্তুত থাকবেন ঠাণ্ডা হলে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন, আন্দোলন ঝিমিয়ে পরলে তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, কারণ শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না।

মুজিবর রহমানের এই অগ্নিশ্রাবী ভাষণের পর থেকে ৮ই মার্চ থেকে সংগ্রাম সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল। ইতিমধ্যে বিদেশী নাগরিকেরাও ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। ৮ই মার্চ লন্ডনে ১০ হাজারের বেশী প্রবাসী বাঙালী এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে পূর্ব পাকিস্তানের

স্বাধীনতার দাবী জানালেন। ৯ই মার্চ থেকে জেনারেল টিক্কা খান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে নিযুক্ত হলে আন্দোলন ক্রমে জোরদার হতে শুরু করল। মানুষ যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভের জন্যে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারও চালিয়ে যাচ্ছিল চরম দমন নীতি। ১৬ই মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল – "পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তারা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, জোহা হল, মনুজান হল, যশোর এবং রঙপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকার ফার্মগেট ও কচুক্ষেত এলাকায় পাশবিক অত্যাচার চালায়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অবশ্যই সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে নিতে হবে।"[৩১] পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের নৃশংসতা শিখর ছুঁয়েছিল ২৫ শে মার্চ রাতে। রফিক উল ইসলামের মতে, "পৃথিবীর জঘন্যতম গণহত্যার ইতিহাস।"[৩২] এই দিন ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সন্ধ্যায় অবাঙালী সেনাদের ডিউটিতে নিয়োজিত করেছিলেন। যে কোনো সময় কারফিউ হতে পারে আশঙ্কায় লোকজন দ্রুত ঘরে ফিরতে শুরু করলো। তবে গণহত্যার কথা কল্পনাও করা যায়নি। ২৫ শে মার্চ রাত ১১টা নাগাদ ঢাকায় সাধারণ মানুষের ওপর নৃংশস হত্যালীলা চালাতে পথে নেমে আসে সৈন্যবাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে নারী পুরুষ ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষকদের হত্যা করা হয়। শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ অসামরিক জনগণকে বন্দুকের গুলীর সামনে নিহত করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এদিন। বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী এক বস্তির মানুষদেরও নির্বিচারে হত্যা করা হয়। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বস্তিতে। ২৬ শে মার্চ মানবশূন্য রাজপথে কেবল সৈন্যদের চলাফেরা করতে দেখা যায় এবং রাস্তায় কোনো পথচারীকে দেখলেই তারা গুলী চালাতে থাকে। বিদেশী সংবাদিকদের দেশত্যাগ করানোর জন্য চাপ তৈরী করা শুরু হতে থাকে। নিরীহ

জনগণের বাড়িঘর দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া শুরু হয়, বাঙালীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ভয়াবহ রাতের পর থেকেই শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ।

উপন্যাসে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি নেমে এসেছে মানুষ খুনের ভূমিতে, বন্দুকের, কামানের গুলিতে তারা ধ্বংস করেছে ছাত্রদের। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ তাজা প্রাণ মুহূর্তে বিনষ্ট হয়েছে খান সেনাদের গুলির আঘাতে। ইতিহাসের পাতায় দিনটি ছিল ২৫ শে মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৭১। ২৫ শে মার্চ রাতে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চূড়ান্ত মিটিং হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মিটিং হবার আগেই তিনি বিমানে করাচি পালালেন ও আদেশ দিয়ে গেলেন নিরস্ত্র বাঙালী নিধনের। রাতারাতি বদলে গেল বাংলাদেশের মানুষের জীবন, এক চরম ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা এসে গ্রাস করল তাদের। ২৫ শে মার্চের প্রথম আক্রমণের ঝোঁকে বাঙালীরা প্রচন্ড মার খেয়েছিল, কিন্তু তারপর ই পি আর এবং ছাত্র মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিরোধে বেশ কিছু জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা মার খেয়েছে, ক্রোধে উন্মত্ত জনতা তাদের ছিন্ন ভিন্ন করেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সরকারের মদত পুষ্ট, তাদের সামনে দাঁড়াতে পারা সত্যিই প্রায় অসম্ভব, তাই বার বার প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী, যে সব গ্রামে মুক্তি যোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল সেই সব গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, বাঙালী যুবক দেখামাত্র গুলী চালিয়েছে, যুবতী মেয়েদের নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে, মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ করতে গিয়ে মরেছে দলে দলে। উপন্যাসে বাংলাদেশের এই ভয়াবহ অবস্থায় নিজেদের বাঁচাতে মামুন চলে এসেছেন কলকাতায়। ভারতে অবস্থানকালে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের কর্মসূচীতে। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর

মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, অনুপস্থিত শেখ মুজিবর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে। কলকাতায় পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন আনুগত্য দেখিয়েছিল নতুন সরকারের প্রতি, অফিসের নাম বদলে হয়েছিল বাংলাদেশ মিশন। বাংলাদেশের সবুজ সোনালি পতাকা উড়েছিল মাথা উঁচু করে।

উপন্যাসে জাহানারা ইমামও এসেছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে জীবন্ত করে। তাঁর 'একাত্তরের দিনগুলি'র পাতা থেকে ঔপন্যাসিক জীবন্ত করেছেন তাঁকে। একটি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত পরিবারের উজ্জ্বল সন্তান রুমী কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধের ভয়াবহ ভূমিতে। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্ভীক সৈনিক হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কলমের বদলে হাতে তুলে নিয়েছে বন্দুক, চে গেভারার আদর্শ বুকে নিয়ে নেমে পড়েছে গেরিলাযুদ্ধের ভূমিতে। রুমীর মতই বহু তরুণ বহু যুবকের নির্ভীক স্বাজাত্যবোধ মুক্ত করেছে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ পীড়ন থেকে। ধর্ম নয় বড় হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার লড়াই, আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদ, যে ধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তান ভিন্ন হয়েছিল সেই ধর্ম তাদের রাখতে পারল না একত্রিত করে। প্রমাণিত হল শোষক আর শোষিতের কোনো ধর্ম হয় না, কোনো জাত হয় না। মুক্তিযুদ্ধ সময়ের ভয়াবহতা, বাঙালী মুক্তি যোদ্ধাদের বীরত্ব, প্রাণ পণ করে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার বাস্তব সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করেছেন ঔপন্যাসিক।

পূর্ববঙ্গের এই ভয়াবহতার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জীবনেও নক্সাল আদর্শ নিয়ে এসেছিল এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের ভৌগোলিক মানচিত্রকে ঔপন্যাসিক বিস্তার করেছেন এই খণ্ডে এসে। অতীন, তুতুল সহ আরও কিছু চরিত্রকে পৌঁছে দিয়েছেন পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, ইউরোপ ও

আমেরিকায়। অতীন তার মার্ক্সবাদে দীক্ষিত মন নিয়ে প্রতি মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়েছে ধনতান্ত্রিক দেশে তবুও ফিরে আসার পথ আর পায়নি, বিলাসবহুল স্থিত জীবনকে উপেক্ষা করে নেমে পরতে পারেনি অনিশ্চিতের আবহে। তুতুলের পরিচয় হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা যুবক আলমের সঙ্গে। দেশ যখন হিন্দু মুসলমান এই দ্বিজাতির ভিত্তিতে কাঁটাতারের বেড়ায় দ্বিখণ্ডিত পূর্ব ও পশ্চিমে, সেই সময়ে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে মিলিত হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার দুই তরুণ তরুণী, ধর্ম কিংবা কাঁটাতার তাদের দ্বিধাবিভক্ত করতে পারেনি, তাদের মিলনের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক দুই বাংলার মিলনের যে স্বপ্ন তাঁর মনে চিরবহমান, সেই স্বপ্নকেই বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলি নিজেদের আত্ম অনুসন্ধানের পথে নিরন্তর এগিয়েছে নিজের সত্তাকে রক্তাক্ত করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রবাসী বাঙালীরা বাইরে থেকে দিয়েছে সাহায্য, বিশ্বের দরবারে তারা খুলে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর স্বরূপ, বিশ্বের কাছ থেকে তারা আদায় করেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। শুধু অর্থসাহায্য বা মানসিক সাহায্যই নয়, বেনামে দেশে প্রবেশ করে তাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ মুক্তি সংগ্রামেও যুক্ত হয়েছিলেন। উপন্যাসে আলমকে দেখা গেছে এই ভূমিকায়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে লড়ে গেছে দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের চরম আত্মবলিদানের পথেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম নিশ্চিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলা যে সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের নতুন পরিচয় গড়ে তুলতে জীবন পণ করেছে, সেই একই সময়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার অনেকগুলি বছর পেরিয়ে এসেও ভারতবর্ষ লড়াই করেছে বহুতর সমস্যার সঙ্গে। যদিও দেশে সমূহ সমস্যার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সাহায্য করেছিল বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে নক্সালপন্থীদের উগ্রপন্থা প্রতিপদে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল প্রতি পদে, পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল বহু তাজা প্রাণ। পুলিশের নির্মম দমন নীতি মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল নক্সাল আদর্শের।

উপন্যাসে আদর্শের পথে হাঁটতে গিয়ে যেমন শেষ রক্ষা হয়নি অতীনের, পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে তাকে পালাতে হয়েছে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, তেমনি আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে তরুণ তাজা কৌশিক-পমপমও হারিয়ে ফেলেছে জীবনের সমস্ত রসদ। নক্সাল আদর্শ যুবসমাজকে করেছে সর্বস্বান্ত।

সর্বোপরি বলা যায় 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসটি তার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় জীবনের বহুতলীয় ভিত্তিকে উদ্ভাসিত করেছে। হিন্দু-মুসলিম এই দুই সমাজ তাদের বিচ্ছিন্ন জীবনে সুস্থিত হতে চাইলেও পারেনি। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই বঙ্গ তাদের গতিশীলতার পথে প্রতি মুহূর্তে ভুল করেছে আবার শুধরে নিতে চেষ্টা করেছে নিজেদের। আবার পৃথিবীর দুই প্রান্ত তথা পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা মানুষ গুলো নিজেদের মনে যে পূর্ব ও পশ্চিম তার সুলুক সন্ধান করেছে জীবন ব্যাপী, একদিকে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, ধ্বংস, মৃত্যু অন্যদিকে বাঙালী যুবকদের প্রবল আত্মসমর্পণ, নিজেদের অস্তিত্ব ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে প্রবল লড়াই তার মধ্যেও আছে পূর্ব-পশ্চিম, তথা একদিকে সদর্থকতা অন্যদিকে নেতিবাচকতার রক্তস্রোত। কমিউনিস্ট আদর্শের মধ্যেও আছে এই পূর্ব-পশ্চিম -এর দ্বন্দ্ব। আদর্শের দিক থেকে কানু সান্যাল, চারু মজুমদারের মতাদর্শ একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালেও তাঁদের ভ্রান্তিগুলো অচিরেই সামনে এসেছে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সময় সন্ধানের পথে সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, জনগণ, থেকে ব্যক্তি মানুষ সমস্তটুকুরই পূর্ব-পশ্চিম সন্ধান করেছেন। প্রবহমানতার পথ তো আসলে এই পূর্ব-পশ্চিমের দ্বন্দ্ব আর বিবর্তনের পথ তো এগোয় যোগ্যতম হয়ে ওঠার লড়াইকে সঙ্গে নিয়েই, আর এই পথেই ঘটে উদ্বর্তন।

তথ্যসূত্রঃ

১। পৃ ৩১, অফুরান প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক কথাশিল্পী, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বইয়ের দেশ, জানুয়ারি – মার্চ ২০১৩, ৯ বর্ষ ১ সংখ্যা, সম্পাদক হর্ষ দত্ত, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ০১

২। লেখকের কথা পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩। পৃ ১, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর, নির্বাচিত সংকলন(১ম খণ্ড), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৪। পৃ ৮৪, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৫। পৃ ১০, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৬। পৃ ১০, ১১ পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৭। পৃ ১৪৮, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৮। পৃ ৪৮, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৯। পৃ ৬, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১০। পৃ ৬, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১১। পৃ ১৯, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১২। পৃ ৮৫, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১৩। পৃ ৩১০, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৪। পৃ ৯২, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৫। পৃ ১১৯, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৬। পৃ ২০, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৭। পৃ ১১, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, অশ্রুকুমার সিকদার, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ০৬

১৮। পৃ , পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৯। পৃ ৬৯, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

২০। পৃ ৬৮,পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

২১। পৃ ৬২, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২২। পৃ ১৫৯, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৩। পৃ ২০১, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

২৪। পৃ ৪০৭, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

২৫। page 44, the Discovery of India, Jawarharal Neheru, Published in Penguine Books 2004

২৬। পৃ ৩০২, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১৭। পৃ ৪৭০, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৮। পৃ ৫৫৮, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৯। পৃ ৫৫৮, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩০। পৃ , পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩১। পৃ , পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩২। পৃ ৬১, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, অ্যা টেল অব মিলিয়নস, রফিক উল ইসলাম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, ছায়াপথ প্রকাশনী, ঢাকা ২

উপসংহার

'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম' এই তিন উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শিকড়ের টানে তাকিয়েছেন বাঙালীর অনতি ইতিহাসের দিকে। উনিশ শতকের নবজাগরণ থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালীর জীবন চেতনার যে বিবর্তন ঘটেছে, সেই বিবর্তনের রূপরেখা এই তিনটি উপন্যাস। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে খুঁজেছেন, নিজের সত্তার স্বরূপকে। ধর্মের কারণে দ্বিখন্ডিত বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন গবেষকের দৃষ্টিতে আবার ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে ঘটিয়েছেন তথ্যের সমন্বয়। বাংলা উপন্যাসের ভূমিতে এই তিন উপন্যাস দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের মতো। বাংলা ও বাঙালীত্বকে নিয়ে সুনীলের এই প্রয়াস অভিনব ও বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। ঔপন্যাসিকের ইতিহাস সন্ধান তথা সময় সন্ধান তথা আত্ম অনুসন্ধান তথা শিকড় সন্ধান পাঠকেও পরিচিত করিয়েছে নিজের শিকড়ের সঙ্গে। কোন্ পথে বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালো মন্দ গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে নিজের সত্তার স্বরূপকে খুঁজে পেয়েছিল; কোন্ পথে বাঙালী হয়েছিল

আত্মদর্শনের পথে আত্মপ্রতিষ্ঠিত; সেই পথের সন্ধান তিনি করেছেন ইতিহাস ও কল্পনাকে পাশাপাশি রেখে। তিনি দেখিয়েছেন দুই শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস। যেই সময়ে দাঁড়িয়ে বাঙালী বুঝতে শিখেছিল রাজনৈতিক পরাধীনতা প্রকৃতপক্ষে কোনো জাতির আত্মীক পরাধীনতা। বহু তরুণ প্রাণের আত্মবলিদানের কাহিনীতে গাঁথা দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন, সেই স্বপ্নভঙ্গের স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। স্বাধীনতার পূর্বে দেশ হয়েউঠেছিল মাতৃভূমি তথা মা, কিন্তু ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন কীভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবাসীর কাছে দেশ হয়ে উঠছিল নিতান্তই গ্রাসাচ্ছাদনের পটভূমি। ঔপন্যাসিক সন্ধান করেছেন বাঙালীর তথা ভারতবাসীর সত্তার গভীরে লুকিয়ে থাকা হিন্দু মুসলিম বিভেদের বীজ। যে বীজই ভবিষ্যতে মহীরুহ হয়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশভাগের পতকে করেছিল প্রশস্ত। দেখিয়েছেন দ্বিখণ্ডিত দেশের মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। দেখিয়েছেন রাজনৈতিক কাঁটাতারের বেড়া কীভাবে ছিন্নভিন্ন করেছিল আপামর সাধারণ মানুষের জীবন। দেখিয়েছেন বহু স্বপ্ন নিয়ে ধর্মের কারণে ভিন্ন হওয়া পাকিস্তান ঠিক কোন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ধরে রাখতে পারেনি নিজেদের ঐক্য তার স্বরূপকেও। দেশের এহেন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের কারণে বাঙালী কীভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে; প্রযুক্তিগত উন্নতি কীভাবে পৃথিবীকে ধীরে ধীরে বানিয়ে তুলছিল 'বিশ্ব গ্রাম', বাংলা ও বাঙালীত্বের এই সার্বিক রূপায়ণ তথা বাঙালী জাতির বিবর্তনের রূপরেখাকে ঔপন্যাসিক সন্ধান করেছেন গবেষকের দৃষ্টিতে। 'সেই সময়' 'প্রথম আলো' 'পূর্ব পশ্চিম' সার্বিকভাবেই হয়ে উঠেছে বাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের বৃহত্তর পটভূমি।

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থঃ

১। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল – সেই সময়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ চৈত্র ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল – পূর্ব - পশ্চিম, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল – প্রথম আলো, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

সহায়ক গ্রন্থঃ

৪। আহমেদ মহিউদ্দীন – যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪২৪, প্রথমা প্রকাশ

৫। ইসলাম রফিক উল - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস, কলকাতা ০২

৬। ইসলাম রফিক উল – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও গ্রন্থপরিচয়, প্রথম প্রকাশ ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩, প্রতিভাস, কলকাতা ০২

৭। ইমাম জাহানারা, একাত্তরের দিনগুলি, চতুর্বিংশ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪০৯, সন্ধানী প্রকাশনী

৮। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল – অর্ধেক জীবন, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৯। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল – কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর, নির্বাচিত সংকলন (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১০। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল – কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর, নির্বাচিত সংকলন (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১১। গুপ্ত বিপিনবিহারী – পুরাতন প্রসঙ্গ, সম্পাদক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক অশোক দাস, দীপান্বিতা সেন, প্রথম পুস্তক বিপণি সংস্করণ, অগস্ট ১৯৮৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯

১২। ঘোষ ড. অজিতকুমার – বাংলা নাটকের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১০, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

১৩। ঘোষ বিনয় – বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, অয়েলিংটন লংম্যান, ভাদ্র ১৩৩৬

১৪। ঘোষ বিনয় (সম্পাদিত ও সংকলিত) -সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫), প্রথম খণ্ড, ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার

রচনা সংকলণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স পাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, কলিকাতা ১২

১৫। ঘোষ বিনয় – কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৪, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৬। ঘোষ বিনয় – কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা ০৯

১৭। ঘোষ বিনয় – বাংলার ননজাগৃতি, প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক্সোয়ান মুদ্রণ ২০০৯, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কোলকাতা ৭২

১৮। চক্রবর্তী অজিতকুমার – মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষির সার্ধশতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে সংস্করণ, ৬ মাঘ ১৩৭৭, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ০৯, কলিকাতা ২৯

১৯। ডারউইন চার্লস, অরিজিন অফ স্পিসিস, ভাষান্তর শান্তিরঞ্জন ঘোষ, প্রথম ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ জুলাই ২০১৫, দীপায়ণ, কলকাতা ০৯

২০। ডারউইন চার্লস, অরিজিন অফ স্পিসিস, ভাষান্তর শান্তিরঞ্জন ঘোষ, দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০১৪, দীপায়ণ, কলকাতা ০৯

২১। দেব চিত্রা – ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, তৃতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩,

২২। দত্ত মাইকেল মধুসূদন – মধুসূদন রচনাবলী, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৪, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ৯

২৩। দত্ত ড. ভূপেন্দ্রনাথ – স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা ০৯

২৪। নিবেদিতা ভগিনী – স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ৭ম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ০৩

২৫। পাল প্রশান্তকুমার – রবিজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৬। পাল প্রশান্তকুমার – রবিজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৭। পাল প্রশান্তকুমার – রবিজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

২৮। পাল প্রশান্তকুমার – রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৯। বসু স্বপন – সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, প্রথম খণ্ড, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০

৩০। বসু শঙ্করীপ্রসাদ – দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০১৭, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ০৯

৩১। বসু শঙ্করীপ্রসাদ – তৃতীয় খণ্ড, দশম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৫, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ০৯

৩২। বসু শঙ্করীপ্রসাদ – চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২২, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ০৯

৩৩। বসু যোগীন্দ্রনাথ – মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, তৃতীয় দে’জ সংস্করণ ২০০৪, সুধাংশুশেখর দে, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৩৪। বসু শঙ্করীপ্রসাদ – প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৮, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ০৯

৩৫। বসু রাজনারায়ণ – সে কাল আর এ কাল, সম্পাদক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা ০৬

৩৬। বিশী প্রমথনাথ – রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, অখণ্ড সপ্তম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭, অরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ৭৩

৩৭। বন্দোপাধ্যায় সরোজ – বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ (সংকলিত ও সম্পাদিত) – সংবাদপত্রে সেকালের কথা, চতুর্থ মুদ্রণ চৈত্র ১৩৭৭, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬

৩৯। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ - সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড) কালীপ্রসন্ন সিংহ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৫০, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

৪০। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ - সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় মুদ্রণ কার্তিক ১৩৫০, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

৪১। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ - সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড) রামনারায়ণ তর্করত্ন, পঞ্চম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬৬, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

৪২। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ - সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬

৪৩। বাগল শ্রীযোগেশচন্দ্র - সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) রাধাকান্ত দেব, তৃতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস শ্রীসজনীকান্ত - সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫২, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬

৪৫। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ - সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) মধুসূদন দত্ত, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫২, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা৬

৪৬। বাগল শ্রীযোগেশচন্দ্র – সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৩য় খণ্ড) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

৪৭। বন্দ্যোপাধ্যায় চন্ডীচরণ – বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ ১৯০৯, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

৪৮। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী হিরন্ময় – ঠাকুরবাড়ীর কথা, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০২, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ০৯

৪৯। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), পুর্ণমুদ্রণ ২০০৯- ২০১০, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩

৫০। বসু স্বপন, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী – উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ ২৯ নভেম্বর ২০০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯

৫১। বিদ্যারত্ন শম্ভুচন্দ্র – বিদ্যাসাগর – জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস, সম্পাদনা ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০২, চিরায়ত প্রকাশণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩

৫২। বিশী প্রমথনাথ, বঙ্গভঙ্গ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৩৬২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ৭

৫৩। ভট্টাচার্য তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ব, তৃতীয় পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৫৪। মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার – কালের প্রতিমা, পঞ্চম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,৭৩

৫৫। মিত্র রাধারমণ – কলিকাতা দর্পণ, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ০৯

৫৬। রায় বিনয়ভূষণ – অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা,প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ০৬

৫৭। শংকর – অচেনা অজানা বিবেকানন্দ, চতুর্বিংশ সংকলন, মার্চ ২০১৪, সাহিত্যম্, কলকাতা ৭৩

৫৮। শংকর – আমি বিবেকানন্দ বলছি, দ্বাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪, সাহিত্যম্, কলকাতা ৭৩

৫৯। শাস্ত্রী শিবনাথ – রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সম্পাদনা বারিদ বরণ ঘোষ, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা ০৯

৬০। শাস্ত্রী শিবনাথ – আত্মচরিত, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১৯, কলকাতা ৭৩

৬১। সিংহ কালীপ্রসন্ন – সটিক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সম্পাদনা অরুণ নাগ, আনন্দ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৬২। সুর ড. অতুল – বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৪০৮, সাহিত্যলোক, কলকাতা ০৯

৬৩। সুর ড. অতুল – সে আর এক কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ ১ বৈশাখ ১৪০৪, সাহিত্যলোক, কলকাতা ৬

৬৪। সুর ড. অতুল – বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি, Reprinted 1991, জ্যোৎস্নালোক, কলিকাতা ৩

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

1. Majumdar R. C – The History of Bengal, Vol 1, Hindu Period, Reprinted 1971, Printed & Published by Newal Kishore Singh of M/s N.V. Publications, Lohanipur, Patna-3 at Skylark Printers, Delhi-6
2. Neheru Jawaharlal – An Auto-Biography, with an Introduction by Sunil Khilnani, first edition published by Penguin Books India 2004, Penguin Books, Penguin Random House India Pvt. Ltd, Gurgaon, Haryana
3. Neheru Jawaharlal - the Discovery of India, first edition published by Penguin Books India 2004, Penguin Books, Penguin Random House India Pvt. Ltd, Gurgaon, Haryana

4. Sarkar Jadu Nath – The History of Bengal, Vol 2, Muslim Period, First Edition, August 1948, Published by THE UNIVERSITY OF DACCA, RAMNA, DACCA, 1948

সহায়ক পত্রপত্রিকাঃ

১। আরম্ভ – নভেম্বর ২০১২, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৮, সম্পাদক লালন বাহার। মূল্য পনেরো টাকা

২। দেশ - ২ নভেম্বর, ২০১২, ৮০ বর্ষ, সংখ্যা ১, সম্পাদক হর্ষ দত্ত, মূল্যঃ কুড়ি টাকা

৩। পরমা – ১৫ নভেম্বর ২০১২, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, সম্পাদক অপর্ণা সেন, মূল্য কুড়ি টাকা

৪। বইয়ের দেশ – জানুয়ারি – মার্চ ২০১৩, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, সম্পাদক হর্ষ দত্ত, মূল্য ৩০ টাকা

৫। বঙ্গদর্শন(১২৮০ – ১২৯৭) – মাসিক পত্র ও সমালোচনা, শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাঁঠালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য তিনটাকা, ডাকমাশুল সমেত ৪ টাকা

৬। ভারতী(১২৮৪-১৩০৯) – মাসিক সমালোচনী পত্রিকা, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৩ টাকা, মাশুল সমেত ৪ টাকা

৭। সাধনা(১২৯৯-১৩০২) – মাসিক পত্রিকা, শ্রী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড

নির্ঘণ্ট

অরবিন্দ ৩

অতীন ৫

অলি ৪

আনন্দমঠ ৩

আওয়ামী লিগ ৫

ইন্দিরা দেবী ৫

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২০

উদ্বাস্তু ২৩

কলকাতা ১৮৫

কালীপ্রসন্ন সিংহ ২০

কাদম্বরী দেবী ৫

কেশবচন্দ্র সেন ১২

খ্রীষ্টধর্ম ১০

গঙ্গানারায়ণ ২৫

গৌরদাস বসাক ২

চারু মজুমদার ২

চন্দ্রনাথ ৮

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১০

জওহরলাল নেহেরু ৪

জাহানারা ইমাম ২

ডিরোজিও ৯

ঢাকা ১৯

তত্ত্ববোধিনী ৪

তুতুল ২

ত্রিপুরা ২২

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১১

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬

দেশভাগ ১১

নরেন ১৮

নক্সাল ১০

নবীনকুমার ৩৬

নীল দর্পণ ২

পূর্ব্ববঙ্গ ৮

প্রতাপ ১২

প্যারীচাঁদ মিত্র ২

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩

বঙ্গদর্শণ ৩

বন্দেমাতরম্ ৩

বঙ্গভঙ্গ ১০

বিম্ববতী ১০

বিবেকানন্দ ১৭

বিদ্যোৎসাহিনী সভা ৫

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ২

বিধুশেখর ১১

বিশ্বনাথ ৫

বিধবাবিবাহ ৮

বীরচন্দ্র মাণিক্য ১০

বেথুন ১২

ব্রাহ্মধর্ম ৭

ব্রাহ্মসমাজ ৮

ভরত ৬৯

ভূমিসুতা ৪

মধুসূদন দত্ত

মহেন্দ্রলাল সরকার ৭

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৭

মামুন ৯

মুজিবর রহমান ১০

মুক্তিযুদ্ধ ৪

যদুপতি গাঙ্গুলি ৩

রবি ৬০

রবীন্দ্রনাথ ৩৭

রামকমল ১২

রামতনু লাহিড়ী ৫

রাজনারায়ণ বসু ৭

রামকৃষ্ণ ৬

রামমোহন রায় ১১

রাণী রাসমণি ৩

রাধানাথ সিকদার ৮

রুমী ২

রিচার্ডসন ৬

শশিভূষণ ৫৪

শিকাগো ৭

সরলা দেবী ৬

সিপাহী বিদ্রোহ ১

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২

হরিশ মুখোপাধ্যায় ৩

হিন্দু পেট্রিয়ট ১

হেয়ার সাহেব ১১

হিন্দুকলেজ ৬

হীরা বুলবুল ৭

শ্রুতি

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ : জুন : ২০১৯

ষান্মাসিক

ISSN : 2394-7225

সম্পাদক

তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক

নির্মল দাস

গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

S H R U T I

SAHITYA-SANSKRITI BISHAYAK GABESHANAMULAK PATRIKA

A PEER REVIEW REFEREED JOURNAL

Published by Shruti Gabeshana Parishad

ISSN : 2394-7225

ষষ্ঠ বর্ষ : **জুন** সংখ্যা : ২০১৯

প্রকাশক

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

গ্রাম : নাকড়াকুড়ি, পো : তেলিঘাটা, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মোবাইল : ৯৪৭৪৬৭৩৮৮৬, e-mail : editorshruti@gmail.com

সম্পাদনা পরিষদ (Referees)

প্রফেসর মঞ্জুলা বেরা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিতা বসু, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর বিকাশ রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর আদিত্যকুমার লালা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর অমিত ভট্টাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিনী ব্যানার্জী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীঋষিকুমার শর্মা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ড. গৌর চন্দ্র ঘোষ, ইসলামপুর কলেজ

সম্পাদক

তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক

নির্মল দাস ও গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস

তাপস অধিকারী

প্রাপ্তিস্থান

সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক (ফোন বা মেল-এ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়)

সূচি

রাঢ়ের শীতলাদেবী ও মানিকরাম গাঙ্গুলির শীতলামঙ্গল	: আদিত্যকুমার লালা	৭
এক অন্য সতীর গল্প : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘কথাবলা পুতুল’	: শর্মিষ্ঠা পাল	১৫
লোকগান কবির পালার সেকাল-একাল	: অর্জুন মন্ডল	২১
দৌলতকাজীর ‘লোরচন্দ্রাণী’ বা ‘সতীময়না’ কাব্যেপদাবলী সাহিত্যের প্রভাব	: চঞ্চল দেবনাথ	২৭
‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ : লোকায়ত প্রসঙ্গ	: গোষ্ট বর্মণ	৩৭
সুবোধ ঘোষের ‘গোত্রান্তর’ : মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিবিম্ব	: মদন গোপাল অধিকারী	৪৬
বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের প্রভাব ও প্রসঙ্গ	: নির্মল দাস	৫১
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’: পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত ছিন্নমূল বাঙালীর শিকড় সন্ধানের ইতিহাস	: শ্রেয়সী গোস্বামী	৬৩
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের “রংবদলায়” উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কে রংবদলের ক্যানভাস	: স্মিতা সরকার	৭২
ইষ্টিকুটুম : প্রকৃতির লেন্সে সময়ের বিপ্রতীপ জিজ্ঞাসা	: হৈমন্তী বর্মণ	৯২
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রীদেবতা : প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা	: তাপস অধিকারী	৯৭

A Peer Review Refereed Journal, ISSN : 2394-7225

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’: পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত ছিন্নমূল বাঙালীর শিকড় সন্ধানের ইতিহাস

শ্রেয়সী গোস্বামী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রথম যে ভাষা মনে আসে সে ভাষা কবিতার, যে ছবি চোখে ভেসে ওঠে সে ছবি নীরার। কবিত্বই তাঁর হৃদয়ের প্রবল ও প্রধান সুর। প্রথম কৈশোর থেকেই সুনীলের কবিতা লেখায় হাতেখড়ি হয়েছিল বাবার ভয়ে করা টেনিসনের কবিতার অনূবাদের সূত্রে। ১৯৫১ তে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রথম তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়, একটি কিশোরীকে খুশি করতে সুনীল ‘একটি চিঠি’ দেশ পত্রিকার দপ্তরে পাঠিয়ে ছিলেন, কবি হবার বাসনা তখনও তাঁর হৃদয় জুড়ে বসেনি। ১৯৫৩ সালে তাঁর পরিচয় ঘটল সিগনেট প্রেসের দিলীপ কুমার গুপ্ত এবং কথাসাহিত্যিক কমল কুমার মজুমদারের সঙ্গে। নতুন কিছু করার আগ্রহে তাঁরা শুরু করলেন ‘হরবোলা’ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এখান থেকেই সুনীলের শুরু হয় কবিতার প্রতি ভালোবাসা ও সাহিত্য চর্চার প্রতি নিবিড় আগ্রহ। সুনীলের চতুর্থ কবিতা বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এবং এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবন নতুন মোড় নেয়। আবু সয়ীদ আইয়ুব ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’ সংকলনে এই কবিতাটিকে ঠাঁই দেন, বইটির বিজ্ঞাপনে তাঁরা ব্যবহার করতেন ‘রবীন্দ্রনাথ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত’ বাংলা কবিতার ধারা এতে ধরা আছে। এই বিজ্ঞাপনের কারণে খুব অল্প বয়েসেই সুনীল কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে যান। এই বছর থেকেই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে শুরু করে ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা। শুধুমাত্র তরুণদের লেখা প্রকাশ ও সমস্ত রকম প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা হয়ে দাঁড়ায় এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য। এরই মধ্যে কলকাতায় আসেন প্রখ্যাত আমেরিকান কবি আলেন গ্রীনস বার্গ। এই বিখ্যাত কবির সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে ‘কৃত্তিবাস গোষ্ঠী’ পেয়ে যায় গোটা বিশ্বের কবিমানসের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা বিরাট সুযোগ। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার আইওয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পল এঙ্গেলের আমন্ত্রণে মাসিক বৃত্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক লেখক কর্মশালায় যোগ দান করেন সুনীল। কিন্তু মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রবল টানে, তিনি আমেরিকার সমৃদ্ধ জীবন, সুন্দর ভবিষ্যত, সুন্দরী বান্ধবী ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন ১৯৬৪ র অক্টোবরে। এরপর রোজগারের জন্য বহু পত্র-পত্রিকায় ফিচার লেখার কাজ তাঁকে নিতে হয়, গদ্যের প্রতি চরম অনাসক্তি সত্ত্বে জীবিকার প্রয়োজনে নিতে হয় গদ্যে হাতেখড়ি, এরই মধ্য দিয়ে হয় তাঁর জীবনের পিতৃপক্ষের সূচনা। ১৯৬৬ তে শারদ সংখ্যা ‘দেশ’ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’। এখান থেকেই শুরু হয় সব্যসাচী লেখকের সাহিত্য-রথের জয়যাত্রা। গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য থেকে আত্মজীবনী পর্যন্ত সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই শুরু হয় তাঁর অনায়াস গতায়াত। নীরাকে নিয়ে আজীবন তিনি যে ভাঙাগড়া চালিয়ে গেলেন, নীরার যে রূপ তিনি নির্মাণ করলেন বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় সেই কবিতাগুলো দাঁড়িয়ে রইল অতুলনীয় স্থাপত্য হিসেবে। কথাসাহিত্যেও তিনি অকপট ভাষায় বলে গেলেন সহজ সুরে নিজের মনের কথা।

বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেরিয়ে এলেন তিরিশ চল্লিশের দশকের ঔপন্যাসিক পরিসর থেকে। নিজের অভিজ্ঞতাকে কোনরকম নিষেধের তোয়াক্কা না করে তিনি আখ্যানে ও সংলাপে

তিনি বলে গেলেন, স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেন প্রকৃত সত্যকে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'সরল সত্য', 'একা এবং কয়েক জন' প্রভৃতি উপন্যাসের পথে চলতে থাকল তাঁর জীবন নিরীক্ষা। এপ্রিল ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম পিরিয়ড পিস 'সেই সময়' প্রথম খন্ড। দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হল ১৯৮২ তে। সময়ের গন্ডি পেরিয়ে তিনি প্রথম পাড়ি দিলেন ইতিহাসের পাতায়। এরপর এল অপর পিরিয়ড পিস 'পূর্ব-পশ্চিম', প্রথম খন্ড প্রকাশিত হল ১ লা বৈশাখ ১৩৯৫, দ্বিতীয় খন্ড জানুয়ারি ১৯৮৯। 'সেই সময়' – 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাস দুটির সাংস্কৃতিক প্রবাহের সুরকে তিনি একটি খাতে প্রবাহিত করে দিলেন পরবর্তী উপন্যাস 'প্রথম আলো' (প্রথম খন্ড জানুয়ারি ১৯৯৬, দ্বিতীয় খন্ড জুলাই ১৯৯৭) তে। 'সেই সময়'-'প্রথম আলো'-'পূর্ব-পশ্চিম' বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের একটা বৃহত্তর ভূমিতে পরিণত হল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সেই সময়' উপন্যাস থেকে উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী হৃদয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই প্রবল হয়েছিল পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার স্বপ্ন। কিন্তু ১৯৪৭ এর দেশভাগ বিদীর্ণ স্বাধীনতা বাঙালীকে দ্বিখন্ডিত করল, বাঙালী হৃদয়ের দীর্ঘ লালিত স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। স্বাধীনতা পরবর্তীতেও দেশনেতাদের আচরণ দেশবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাকে নিয়ে গেল বিনষ্টির পথে। স্বাধীনতাত্তোর পর্বের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসকেই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে। এই বাংলা আর উনিশ বিশ শতকের অখন্ড বাংলা নয়, এই বাংলার মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে উঠে গেছে কাঁটা তারের বেড়া। 'পূর্ব-পশ্চিম'এর কাহিনীর সূচনা পঞ্চাশের মধ্যভাগে, কাহিনীর যবনিকা পতন আটের দশকের মোহনায় এসে। এই চারটি দশক জুড়ে দুই বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের ওঠা পড়াকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক, বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রবাহের ইতিহাসে খুঁজেছেন নিজের শিকড়কে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ, তাঁর আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন'এর অনেকটা জুড়ে রয়েছে তাঁর পূর্ববঙ্গের শৈশব স্মৃতির রোমন্থন। শুধুমাত্র ধর্মের কারণে বাঙালীর দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যাওয়াকে কোন দিন মেনে নিতে পারেননি সুনীল, তাঁর স্বপ্নের দেশ ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশ। সাহিত্যিক হিসাবে শীর্ষে পৌঁছনোর বহুপূর্ব থেকেই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক সমণ্বয়ের আশা তাঁর হৃদয়ে ছিল প্রবল। প্রথম সংখ্যা 'কৃত্তিবাস' সম্পাদকীয় তে তিনি বলেছিলেন – "বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে পাকিস্তানের কবিদের স্থান প্রায় অনুল্লেখ্য। তাতে কোন দুঃখ থাকত না যদি তাঁদের মধ্যে কেউ আশ্চর্য সার্থক কবিতাও লিখতেন। বাংলাদেশের শারীরিক মানচিত্রের মত কাব্যের মানচিত্র ও খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উভয়বঙ্গে বাংলাভাষার পূর্ণ অধিকার সম্পর্কে যেন আমাদের কোনদিনও সন্ধিগ্ধ না হতে হয়। পাকিস্তানের তরুণ কবিরা আমাদের সমদলীয়, সহকর্মীও। এ সংখ্যায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল না, কিন্তু আগামী সংখ্যায় আমরা নিশ্চয় সক্ষম হব।"[১] একজন সদ্য যুবকের কলমে এই চেতনার প্রকাশ প্রমাণ করে বাংলা ও বাঙালীত্ব তাঁর সত্তার সঙ্গে ঠিক কতখানি জড়িয়ে আছে। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের কাহিনীতে পাশাপাশি বয়ে চলেছে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ। উপন্যাসে কোন বিশেষ চরিত্র প্রধান চরিত্রের মর্যাদা পায়নি, কিন্তু উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবসময়েই কেন্দ্রে থেকেছেন প্রতাপ মজুমদার, পূর্ববঙ্গের মালখানগরের স্মৃতি তাড়িত এই চরিত্রটি গোটা উপন্যাস জুড়েই তিনি বহন করেছেন ছিন্নমূলতার বেদনা, কাহিনীবৃত্তে মিলে মিশে গেছে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ওঠা নামা নিয়েই। নিজের আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন'এ সুনীল লিখেছেন, "আমার বাবা দেশভাগ কিছুতেই মানতে

পারেননি। তাঁর মতে, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব, ইংরেজরা তাড়াহুড়ো করে কাটা ছেঁড়া করে দিয়ে গেছে, দেশের মানুষ আবার মিলেমিশে যাবে, মুছে ফেলবে এই কৃত্রিম সীমারেখা, বারবার জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন এই কথা, এবং আমৃত্যু তাঁর এই বিশ্বাস ছিল।”[২] উপন্যাসে প্রতাপ চরিত্রটির মধ্যেও এই বিশ্বাসের অনুবর্তন দেখা গেছে বার বার, পূর্ববঙ্গকে তিনি ছাড়তে পারেননি।

‘পূর্ব-পশ্চিম’ ঔপন্যাসিকের চোখে দেখা ইতিহাস। নিজের জীবনের ফেলে আসা সময়কেই তিনি গ্রহণ করেছেন উপন্যাসের প্লটে, ‘সেই সময়’ বা ‘প্রথম আলো’র মত ইতিহাস নির্ভরতা এখানে নেই। যে সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষী সুনীল নিজে সেই সময়কে চিত্রিত করতে গিয়ে উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে আত্মজৈবনিক উপাদান। দ্বিখন্ডিত বাঙালীর ছিন্নমূলতার বেদনা, দুই বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার, মৌলবাদের প্রাধান্য থেকে বেড়িয়ে এসে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের বাংলা ভাষার জন্য জীবন দান, মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার বাঙালী যুবকের নির্ভীক সংগ্রাম, পশ্চিম বাংলার বহু তাজা প্রাণের নক্সাল আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া, আশির দশক থেকে বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে ছড়িয়ে পড়া, মূলের থেকে দূরে গিয়েও চরিত্রগুলির শিকড়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণের চিত্র ‘পূর্ব-পশ্চিম’এ ছড়িয়ে আছে। ‘পূর্ব-পশ্চিম’ নামটি উপন্যাসে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রবাহ; পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের বৃহত্তর পটভূমি উপন্যাসে এসেছে। আবার মানুষের জীবনে ও মনে যে পূর্ব ও পশ্চিম, তার প্রবৃত্তি ও সামাজিক সত্তার যে দ্বন্দ্ব, মন ও মননের দেবতা ও অপদেবতার একত্র সহাবস্থানই মানুষের মনুষ্যত্ব, এই দুইয়ের যে দ্বন্দ্ব তাও উঠে এসেছে এই উপন্যাসে।

‘পূর্ব পশ্চিম’ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করেছেন তাঁর বাবা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়কে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র প্রতাপ সুনীলের পিতারই স্মৃতিবাহী। প্রতাপ চরিত্রকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসে উঠে এসেছে দেশভাগ। পূর্ববঙ্গের মালখানগর। দেশভাগের পর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রতাপ শেষবার গিয়েছিলেন মালখানগরে। সেখানকার সব পাট চুকিয়ে বিষয় সম্পত্তি সব ফেলে রেখে তাকে চলে আসতে হয়েছিল। পিতা ভবদেব সরকার যেসব বাড়ি জমি কিনে রেখেছিলেন সেগুলোর খদ্দের তো পাওয়া যায়নি, তাদের নিজস্ব বসতবাড়িরও খদ্দের পাওয়া যায়নি। দেশভাগ একটা দগদগে যন্ত্রণা হয়েই থেকেছে তার বুকে চিরদিন। প্রতাপ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলো যুক্ত হয়েছে কাহিনীসূত্রে। প্রতাপের কলেজ জীবনের বন্ধু মামুনকে কেন্দ্র করে একদিকে উপন্যাসে এসেছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী মুসলমান সমাজ ও তাদের মতাদর্শ অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ববঙ্গ। প্রতাপের দিদি সুপ্রীতিকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা ও উদ্বাস্তু নেতা হারীত মন্ডল। ‘পূর্ব পশ্চিম’ উপন্যাসের ঘটনাক্রম ১৯৫৫ সাল থেকে হলেও চেতনার প্রবাহে অতীত বর্তমান ভবিষ্যত একাকার হয়েছে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল ব্যাপী বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা দেশের রাজনীতিকে বিচলিত করেছিল। ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ পাকিস্তানের নির্বাচনে এ কে ফজলুল হকের বিরাট জয়ের সংবাদে খণ্ডিত ভারতবর্ষেও একটা আশার আলো জেগে উঠেছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করে ফজলুল হক অমুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, দেশভাগের নামে বাঙালী জাতির নামে বিভেদরেখা টানায় তাঁর আপত্তি ছিল, তিনি ঘোষণা করেছিলেন ভিসা ব্যবস্থা তুলে দেবেন, দুদিকের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে অবাধ সাক্ষাৎ আর মোলাকাতের আর কোনোও অন্তরায়

থাকবে না। এক মাসের মধ্যেই ৩রা এপ্রিল অবিভক্ত পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ জানালেন ফজলুল হক দেশের শত্রু, তিনি স্বায়ত্ত শাসনের কথা উচ্চারণ করেছেন। ফজলুল হক গৃহবন্দি হলেন, শেখ মুজিবর রহমান নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। সেনাপতি ইস্কান্দার নির্জার হাতে তুলে দেওয়া হল সর্বময় কর্তৃত্ব। পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার শুরু হল উদ্বাস্তু স্রোত। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, ফুটপাত হয়ে উঠল মানুষের আস্তানা। দখল হতে থাকল ধনীদের পড়ে থাকা বাগানবাড়ি। কলকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু সমস্যায় হতে থাকল জর্জরিত। ভারত সরকার উদ্বাস্তু পুর্নবাসনের জন্যে স্থির করলেন আন্দামান ও মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান উদ্বাস্তু সমস্যা, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে মৌলবাদী শক্তি ও তার বিরোধিতায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা প্রগতিশীল মানবিকতা।

উপন্যাসে প্রতাপের বন্ধু মামুনকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা। উপন্যাসে যখন বলা হয়েছে, “তিন বছর আগের ভাষা আন্দোলন ও বিক্ষোভের সঙ্গে মামুন যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, ঢাকায় সেই ভয়ঙ্কর উত্তাল একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি চালনার সময় তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।”[৩] তখন স্পষ্টই ধরে নেওয়া যায় উপন্যাসের ঘটনাক্রম ১৯৫৫ থেকে শুরু। দ্বিধাবিভক্ত বাংলার বেকারত্ব, রাজনৈতিক ডামাডোল, ছিন্নমূল মানুষগুলির যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন, কালোবাজারি, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ উপন্যাসের পাতায় পাতায় সময়কে জীবন্ত করেছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পরেও দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবন, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে সদ্য সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৌলবাদ থেকে মুক্ত হয়ে বেড়িয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছিল জনমানসে, তৎকালীন নেতা মোলনা ভাসানীর নেতৃত্বে জনমত গরিষ্ঠ হয়েছিল পূর্বপাকিস্তানে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরের পর পূর্বপাকিস্তানে এসেছিল একটা অন্ধকার সময়। জেনারেল আইয়ুবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে গনতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে সামরিক আইন জারি করেছিল, তার কুড়ি দিন পরে ইস্কান্দার মীর্জাও বিতাড়িত হল দেশ থেকে, আইয়ুব খান হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হল, নেতারা হলেন কারারুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তানের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি জন্মাতে শুরু করল প্রবল বিরোধিতা। মৌলনা ভাসানীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করল পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী জনগন। উপন্যাসে মৌলানা ভাসানী তাঁর সভায় যখন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন তখন মামুন শিউরে উঠেছেন এসব কথা শুনে, “এ তো বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির! এত কষ্টের, এত সাধের, এত রক্ত বর্ষণ করে পাওয়া যে পাকিস্তান মওলানা তা ভেঙে দিতে চান? মাত্র দশ বছর হয়েছে এই নতুন রাষ্ট্রের, অনেক ভুলভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তাকে ভেঙে ফেলার কোনো প্রশ্নই আসে না।”[৪] এখান থেকে চিনে নেওয়া যায় সময়কে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলছে স্বাধীনতার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজন। দশ বছরের স্বাধীনতা স্বপ্নের দিন আনতে না পারলেও গণতন্ত্র বজায় থাকার গৌরবে মাতোয়ারা হয়েছে গোটা ভারতবর্ষ। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের চরম বিপর্যস্ত জীবন, বহু বেসরকারী ব্যাঙ্কের পতন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মনুষ্যত্বের চরম বিপর্যয় মাথা চাড়া দিয়েছে। ১৯৫৮ র সেই কালরাত্রির পর, সব রাজনৈতিক দলগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিল, পার্টি অফিসগুলি তালাবন্ধ করে, নেতাদের সব জেলে পুরে, রাজনৈতিক দলগুলো যাতে আর কোনোদিন মাথা তুলতে না পারে তার ব্যবস্থা করেছিল সরকার। সামরিক শাসনের অত্যাচারে কেউ আন্দোলন করতে সাহস পায়নি। দোকানদারদের ওপর জোর জুলুম করে কমানো হল জিনিসপত্রের দাম, বন্ধ করে দেওয়া হল বিশ্ববিদ্যালয়। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল নেই,

পুলিশ জনতার খণ্ডযুদ্ধ নেই, সাধারণ জনতার অনেকেই ভাবল, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক অশান্তি, যখন তখন মন্ত্রিসভার পতন, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, এসবের হাত থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেছে তাহলে মিলিটারিরাই তো ঠিকমত দেশ চালাতে পারে বলে মনে হতে লাগল, তিক্ত বুদ্ধিজীবীরা ভাবতে শুরু করেছিল এই দেশ গণতন্ত্র পাবার যোগ্যই নয়। কয়েক বছরের মধ্যে মনোভাব বদলে গেল রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খাঁর। তিনি নিজের পছন্দ মতন সংবিধান প্রণয়ণ করেছেন, সেখানে তাঁর সুবিধে মত নির্বাচনের ব্যবস্থাও আছে, বেসিক ডেমোক্রেসির নামে একটা দলহীন নির্বাচন করলেন সেটা হাস্যকর দাঁড়াল। আইয়ুব চাইলেন একটা সরকারী দল গড়ে তুলতে। সহকর্মীদের পরামর্শে তিনি পুরোনো মুসলিম লিগের একটা অংশ নিয়ে গড়ে তুললেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ। পূর্ব পাকিস্তানে এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বার বার উত্তাল হয়ে সরকার কাঁপিয়েছে, গভর্নর মোনেম খাঁ প্রচুর টাকা খরচ করে দালাল লাগিয়ে ছাত্রদের মধ্যেও একটা নতুন সরকারী পার্টি গড়ে তুললেন, নাম ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রেডারেশন, এই পার্টির ছেলেরা ফেল করলেও পাশ করে যাবে, এরা কোনো সহকর্মীর পেটে ছুরি বসালেও এদের কোনোও শাস্তি হবে না, অধ্যাপকেরা এদের কথা শুনতে বাধ্য থাকবেন, ইউনিভার্সিটি কবে খোলা থাকবে কবে বন্ধ থাকবে তাও এরাই ঠিক করবে, উত্তম সরকার ভক্তি দেখাতে পারলে ছাত্ররা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জলপানি পাবে। জেল থেকে বেড়িয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন সোহরাওয়ার্দি এক নতুন চাল চাললেন আইয়ুবের ওপর, তিনি বললেন কোনো রাজনৈতিক দলেরই আলাদা অস্তিস্ত্ব রাখার দরকার নেই। কোনোও একটি দল এককভাবে আইয়ুব খানের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিততে পারবে না বলেই সোহরাওয়ার্দি সব দলের পৃথক অস্তিত্ব বিলোপ করে যুক্তরাষ্ট্র গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, একটি মাত্র দলের সর্বাধিনায়ক হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বৃদ্ধ সোহরাওয়ার্দির স্বপ্ন পূরণের আগেই মৃত্যু তাঁকে উত্তীর্ণ করল অন্য জগতে। যুক্তফ্রন্ট ধ্বংস হল, শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামি লিগের একছত্র নেতা হয়ে দলটিকে আবার সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। মৌলনা ভাসানীও তাঁর ন্যাপকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

উপন্যাসে পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে গেছেন দুই বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক মানচিত্র। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের ভয়াবহ জীবন সংগ্রাম। সরকারের উদাসীনতায় ছিন্নবিছিন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, ১৯৬২তে যখন এদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে চীনকে আদর্শ দেশ বলে ভেবে নেওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, সেই সময়েই ম্যাকমিলান লাইনকে কেন্দ্র করে চীন আক্রমণ করল ভারতকে, সময়টা ১৯৬২। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর কাছেও এটা একটা বিশাল ধাক্কা। উপন্যাসে এসেছে ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু। সময়টা ২৭ মে, ১৯৬৪। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নতুন পথে এগোল। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ নাড়িয়ে দিল দুই দেশের আপামর জনগণকে। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্ল্যাকআউটের সময়কে ফিরিয়ে এনেছিল। এই সময় থেকে পাকিস্তানের একতা ধ্বংসের দিকে যেতে শুরু করল, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, বিমাতৃসুলভ মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছিল। দুই বাংলার যুব মানসে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। ১৯৪০ সালে যেখানে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেই লাহোরেই ছাব্বিশ বছর পর ১৯৬৬ তে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফা প্রস্তাবের মধ্য দিয়েই পৃথক বাংলাদেশের দাবী উঠল। পূর্বপাকিস্তানে

শুরু হল প্রচন্ড ধরপাকড়, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা সম্পন্ন মানুষেরা গ্রেপ্তার হলেন, উপন্যাসে মামুন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁকে বিনা নোটিশে হারাতে হয়েছে সাংবাদিকতার পদ।

'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গই শুধু নয় পৃথিবীর দুই প্রান্তে পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলিও উঠে এসেছে, উঠে এসেছে মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশ ও মহাকাশ। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "পূর্ব থাকলে পশ্চিম থাকবেই। সব দেশের মধ্যেই পূর্ব-পশ্চিম আছে। আমাদের পৃথিবীটাও পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত, উত্তর দক্ষিণে নয়, এমনকি ভালো করে ভেবে দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও একটা করে পূর্ব-পশ্চিম আছে। পূবের চেয়ে পশ্চিম অনেক বেশী বর্ণাঢ্য, কারণ ধ্বংসের আগে কিংবা অস্তাচলে যাবার আগে আভাটা বেশি হয়। ...পূবের আকাশ ও পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য কোরো।"[৫] উপন্যাসে তিনি তুলে এনেছেন মহাকাশ গবেষণা, আমেরিকার মহাকাশযান জেমিনি ৭ নম্বরে চেপে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া বিজ্ঞানীদেরও বানিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের চরিত্র।

উপন্যাসে অতীনকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে কলকাতার কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়া শিক্ষিত যুব সমাজ দীক্ষিত হয়েছে কমিউনিস্ট মতাদর্শে। তারা পরিচিত হয়েছে শিলিগুড়িতে বসে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা চারু মজুমদারের সঙ্গে। উপন্যাসের চরিত্র চারু মজুমদারকে বলতে শোনা গেছে "অস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকাও আসলে শোধনবাদ। কেন, দা, কুড়ুল, শাবল, কাস্তে, লাঠি এগুলোও কি অস্ত্র নয়? গ্রামের মানুষ এই সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে জানে। এইসব দিয়েই লড়াই শুরু করা যায়। গ্রামের মানুষকে বোঝাতে হবে যে, জোতদার-পুলিশ-বুর্জোয়া পার্টির অত্যাচারে মুখ বুজে থাকলে চলবে না। প্রতিঘাত করতে হবে। ছোটো ছোটো এলাকা ভিত্তিক মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। ... তারপর ওদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। মাও সে তুঙ বলেননি, 'শত্রুর অস্ত্রাগার আমাদেরই অস্ত্রাগার'।"[৬] উপন্যাসে অতীন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েছে, মানিকদাকে বাঁচাতে গিয়ে তার হাতে মৃত্যু হয়েছে একজন দুষ্কৃতির। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের শেষ এখানেই।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড ঔপন্যাসিক উৎসর্গ করেছেন, 'বেগম জাহানারা ইমাম ও তাঁর মত জননীদের উদ্দেশ্যে।' দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায়, এসেছেন মুজিবর রহমান, 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এবং 'স্বাধীন বাংলা শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ' পালন করেছে প্রতিরোধ দিবস, দেশের জনসাধারণ উত্তাল, শেখ মুজিবের দোতালা বাড়ির ছাদে, শস্যশ্যামলা বাংলার প্রতীক লাল বৃত্তের মধ্যে সোনালি রঙে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা নতুন পতাকা, শ্রমিকনেতা আবদুল মান্নান একই রকম পতাকা তুলেছে বাড়ির সামনে, শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িই ওই সময়ে ছাত্র শ্রমিক বুদ্ধিজীবিদের এক বৃহৎ অংশের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। মুজিবর রহমান ভুগছেন দারুন অস্বস্তিতে। তিনি ভেবেছেন, "স্বাধীন বাংলা স্বাধীন বাংলা রব উঠেছে চতুর্দিকে, সামরিক শাসকদের হাত থেকে দেশের অর্ধেক অংশ ছিনিয়ে নেওয়া কি মুখের কথা? তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু বাংলার মাটির দুর্গ পশ্চিম পাকিস্তানিদের কামানের মুখে কতক্ষণ টিকবে? শুধু মনের জোর দিয়ে কি রাইফেল বোমার বিরুদ্ধে লড়া যায়? তিনি পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা আটানব্বই ভাগ ভোট পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যদি, সত্যিই লড়াই লাগে... তা হলে কি এ দেশের সব মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়াবে? যদি লড়াই লাগে... সে লড়াই কতদিন ধরে চলবে ঠিক নেই, কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হবে, সে দায়িত্ব তিনি একা নেবেন? ... সকাল থেকে পঞ্চাশটি মিছিল এসেছে শেখসাহেবের কাছে, তার মধ্যে শুধু মহিলাদেরই মিছিল ছটা। সকলেরই

এককথা কিছুতেই সামরিক শাসক গোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার করা হবে না। শেখ মুজিব অভিভূত হয়ে পড়েছেন। দৃঢ় ভাষায় তাদের ভরসা দিতে গিয়েও তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে যাচ্ছে। যদি সত্যিই রাষ্ট্র বিপ্লব বেঁধে যায় কোন কোন দেশ সাহায্য করবে, কারা অস্ত্র দেবে? যদি কেউ না দেয়? যদি ইন্ডিয়া দোনামনা করে? তা হলে কামানের মুখে ছাতু হয়ে যাবে এইসব সরল, তেজি, আদর্শবাদী ছেলেমেয়েগুলো!”[৭] মুজিবর রহমানের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি নেমে এসেছে মানুষ খুনের ভূমিতে, বন্দুকের, কামানের গুলিতে তারা ধ্বংস করেছে ছাত্রদের। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ তাজা প্রাণ মুহূর্তে বিনষ্ট হয়েছে খান সেনাদের গুলির আঘাতে। ইতিহাসের পাতায় দিনটি ছিল ২৫ শে মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৭১। ২৫ শে মার্চ রাতে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চূড়ান্ত মিটিং হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মিটিং হবার আগেই তিনি বিমানে করাচি পালালেন ও আদেশ দিয়ে গেলেন নিরস্ত্র বাঙালী নিধনের। রাতারাতি বদলে গেল বাংলাদেশের মানুষের জীবন, এক চরম ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা এসে গ্রাস করল তাদের। ২৫ শে মার্চের প্রথম আক্রমণের ঝোঁকে বাঙালীরা প্রচন্ড মার খেয়েছিল, কিন্তু তারপর ই পি আর এবং ছাত্র মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিরোধে বেশ কিছু জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা মার খেয়েছে, ক্রোধে উন্মত্ত জনতা তাদের ছিন্ন ভিন্ন করেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সরকারের মদত পুষ্ট, তাদের সামনে দাঁড়াতে পারা সত্যিই প্রায় অসম্ভব, তাই বার বার প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী, যে সব গ্রামে মুক্তি যোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল সেই সব গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, বাঙালী যুবক দেখামাত্র গুলি চালিয়েছে, যুবতী মেয়েদের নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে, মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ করতে গিয়ে মরেছে দলে দলে। উপন্যাসে বাংলাদেশের এই ভয়াবহ অবস্থায় নিজেদের বাঁচাতে মামুন চলে এসেছেন কলকাতায়। ভারতে অবস্থানকালে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের কর্মসূচীতে। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, অনুপস্থিত শেখ মুজিবর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে। কলকাতায় পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন আনুগত্য দেখিয়েছিল নতুন সরকারের প্রতি, অফিসের নাম বদলে হয়েছিল বাংলাদেশ মিশন। বাংলাদেশের সবুজ সোনালি পতাকা উড়েছিল মাথা উঁচু করে।

উপন্যাসে জাহানারা ইমাম এসেছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে জীবন্ত করে। তাঁর ‘একাত্তরের দিনগুলি’র পাতা থেকে ঔপন্যাসিক জীবন্ত করেছেন তাঁকে। একটি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত পরিবারের উজ্জ্বল সন্তান রুমী কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধের ভয়াবহ ভূমিতে। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্ভীক সৈনিক হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কলমের বদলে হাতে তুলে নিয়েছে বন্দুক, রুমীর মতই বহু তরুণ বহু যুবকের নির্ভীক স্বাজাত্যবোধ মুক্ত করেছে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ পীড়ন থেকে। ধর্ম নয় বড় হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার লড়াই, আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদ, যে ধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তান ভিন্ন হয়েছিল সেই ধর্ম তাদের রাখতে পারল না একত্রিত করে। প্রমাণিত হল শোষক আর শোষিতের কোনো ধর্ম হয় না, কোনো জাত হয় না। মুক্তিযুদ্ধ সময়ের ভয়াবহতা, বাঙালী মুক্তি যোদ্ধাদের বীরত্ব, প্রাণ পণ করে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার বাস্তব সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করেছেন ঔপন্যাসিক।

পূর্ববঙ্গের এই ভয়াবহতার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জীবনেও নক্সাল আদর্শ নিয়ে এসেছিল এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের ভৌগোলিক মানচিত্রকে ঔপন্যাসিক বিস্তার করেছেন এই খণ্ডে এসে। অতীন সহ আরও কিছু চরিত্রকে পৌঁছে দিয়েছেন পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, ইউরোপ ও আমেরিকায়। চরিত্রগুলি নিজেদের আত্ম অনুসন্ধানের পথে নিরন্তর এগিয়েছে নিজের সত্তাকে রক্তাক্ত করে। পূর্ব বাংলা যেই সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের নতুন পরিচয় গড়ে তুলতে জীবন পণ করেছে, সেই একই সময়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার অনেকগুলি বছর পেড়িয়ে এসেও ভারতবর্ষ লড়াই করেছে, ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সাহায্য করেছে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের। নক্সালপন্থীদের উগ্রপন্থা প্রতিপদে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে বহু তাজা প্রাণ। আদর্শের পথে হাঁটতে গিয়ে শেষ রক্ষা হয়নি অতীনের, পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে তাকে পালাতে হয়েছে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, তরুণ তাজা কৌশিক, পমপমও হারিয়ে ফেলেছে জীবনের সমস্ত রসদ। নক্সাল আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে যুবসমাজকে হতে হয়েছে সর্বসান্ত।

সর্বোপরি 'পূর্ব-পশ্চিম' তার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় জীবনের বহুতলীয় ভিত্তিকে উদ্ভাসিত করেছে। হিন্দু-মুসলিম এই দুই সমাজ তাদের বিচ্ছিন্ন জীবনে সুস্থিত হতে চাইলেই পারেনি, পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই বঙ্গ তাদের গতিশীলতার পথে প্রতি মুহূর্তে ভুল করেছে আবার শুধরে নিয়েছে নিজেদের, পৃথিবীর দুই প্রান্ত তথা পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা মানুষ গুলো নিজেদের মনে যে পূর্ব – পশ্চিম তার সুলুক সন্ধান করেছে জীবন ব্যাপী, একদিকে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, ধ্বংস, মৃত্যু অন্যদিকে বাঙালী যুবকদের প্রবল আত্মসমর্পন, নিজেদের অস্তিত্ব ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে প্রবল লড়াই তার মধ্যেও আছে পূর্ব –পশ্চিম, তথা একদিকে সদর্থকতা অন্যদিকে নেতিবাচকতার রক্তস্রোত, কমিউনিস্ট আদর্শের মধ্যেও আছে এই পূর্ব-পশ্চিম, আদর্শের দিক থেকে কানু সান্ন্যাল, চারু মজুমদারের মতাদর্শ একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালেও তাঁর ভ্রান্তিগুলো অচিরেই সামনে এসেছে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সময় সন্ধানের পথে সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, জনগন, থেকে ব্যক্তি মানুষ সমস্তটুকুরই পূর্ব-পশ্চিম সন্ধান করেছেন। প্রবহমানতার পথ তো আসলে এই পূর্ব-পশ্চিমের দ্বন্দ্ব আর বিবর্তনের পথ তো এগোয় যোগ্যতম হয়ে ওঠার লড়াইকে সঙ্গে নিয়েই, আর এই পথেই ঘটে উদ্বর্তন।

তথ্যসূত্রঃ

১। কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর নির্বাচিত সংকলন (১ম খণ্ড) দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ ১

২। অর্ধেক জীবনঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ ৮৪

৩। পূর্ব – পশ্চিমঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফ্রব্রুয়ারি ২০১৩, পৃঃ ৬২

৪। তদেব, পৃঃ ১৫৯

৫। তদেব, পৃঃ ৪০৭

৬। তদেব, পৃঃ ৪৭০

৭। তদেব, পৃঃ ৫৫৮

আকর গ্রন্থঃ

১। পূর্ব – পশ্চিমঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

গ্রন্থঋণঃ

১। অর্ধেক জীবনঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

২। কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর নির্বাচিত সঙ্কলন (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১

৩। কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর নির্বাচিত সংকলন (২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫

৪। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহঃ সংকলন ও সম্পাদনা রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৫। একাত্তরের দিনগুলিঃ জাহানারা ইমাম, চতুর্বিংশ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, সন্ধানী প্রকাশনী ৬৮/২ পুরানা পল্টন ঢাকা ১০০০

৬। The Discovery of India- Jawaharlal Neheru, Published in penguin books 2004

প্রাবন্ধিক পরিচিতি : গবেষিকা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।